NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL
EPS

PAPER VI
MODULES 21 - 24

ELECTIVE POL. SCIENCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2014

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : EPS : 06 : 21

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1, 2, 3, 4	ড. সুভাষ চট্টোপাধ্যায়	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

পাঠক্রম : পর্যায় : EPS : 06 : 22

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপিকা রমা ব্যানার্জী	অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
একক 2	অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য	ঐ
একক 3, 4	অধ্যাপক অরুণ কুমার চক্রবর্তী	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায় : EPS : 06 : 23

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1, 2	অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র রায়	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী
একক 3, 4	অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক সত্যব্রত রায়চৌধুরী

পাঠক্রম : পর্যায় : EPS : 06 : 24

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1, 2	অধ্যাপক শমীক মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য
একক 3, 4	অধ্যাপক অনিন্দ্য জ্যোতি মজুমদার	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPS - 06

(স্নাতক পাঠ্যক্রম)

পর্যায়
21

একক 1	❑	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু	7
একক 2	❑	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি	14
একক 3	❑	জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের পন্থা	23
একক 4	❑	সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও নয়া উপনিবেশবাদ	36

পর্যায়
22

একক 1	❑	ঠাণ্ডা লড়াই এবং তার বিবর্তন	49
একক 2	❑	যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপের ক্রমবিকাশ	64
একক 3	❑	উত্তর দক্ষিণ বিরোধের বিস্তার	87
একক 4	❑	১৯৭৩ সাল থেকে পশ্চিম এশিয়ার অগ্রগতি (প্রথম ভাগ)	102
একক 5	❑	১৯৭৩ সালের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার অগ্রগতি (দ্বিতীয় ভাগ)	109

পর্যায়
23

একক 1 ❑ বিদেশনীতির গঠন পদ্ধতি 122

একক 2 ❑ ভারতের বিদেশনীতি 145

একক 3 ❑ বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশনীতি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন / বর্তমান রাশিয়া) 182

একক 4 ❑ ভারতের প্রতিবেশীদের বিদেশনীতি (চীন ও পাকিস্তান) 201

পর্যায়
24

একক 1 ❑ রাষ্ট্রসঙ্ঘ : উদ্ভব, উদ্দেশ্য ও নীতি 213

একক 2 ❑ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল অঙ্গ / বিভাগ 225

একক 3 ❑ শান্তিরক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক ভূমিকা 255

একক 4 ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও নিরস্ত্রীকরণ 265

একক ১ □ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি

১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু

১.৪.১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি বিজ্ঞান?

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান দুনিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একই সঙ্গে বিরোধ ও শান্তি, সংঘর্ষ ও সহযোগ, নির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলা কিংবা তাকে উপেক্ষা করা—এই ধরনের বৈপরীত্য চোখে পড়ে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে তাত্ত্বিক জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনই দরকার বাস্তব ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকা। বর্তমান পর্যায়ের চারটি একক পড়লে শিক্ষার্থীরা এবিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে পারবেন।

১.১ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়টি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক পাঠগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। যে চারটি এককে পর্যায়টি বিভক্ত তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ।

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের উপযোগী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে পরিচয়দান।

৩। যে শক্তি অবলম্বন করে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সেই শক্তির স্বরূপ কী এবং কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে জাতীয় শক্তি গড়ে ওঠে তার আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় শক্তির প্রয়োগ যাতে সুষ্ঠু, ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ হয় সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলিও জেনে রাখা।

৪। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রে সম্পর্ক স্থাপনে সহযোগমূলক আদানপ্রদানের বদলে যখন

আধিপত্যমূলক-সম্পর্ক তৈরি হয়, সমমর্যাদার বদলে যখন শোষণ চলতে থাকে, তখন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অবস্থান বুঝে নেওয়ার জন্য তিন ধরনের আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ।

১.২ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা "আন্তর্জাতিক রাজনীতি" ও "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের" মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করি। অনেকেই দুটি বিষয়কে সমার্থক বলে মনে করেন। এখনও এ বিষয়ে লেখক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শ্লেচার মন্তব্য করেছেন যে "Many writers who equate International Relations with International Politics do not define their term carefully. They usually regard politics as a form of intergroup struggle, or even as a "struggle for power." Yet, having indicated that this is their subject they soon find themselves involved in matters which simply are not politcal in nature."[1] অর্থাৎ শ্লেচার বলেছেন যে যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এক করে দেখেন তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে দুটি বিষয়ের সংজ্ঞা দেন না। তাঁরা রাজনীতিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ রূপে বা "ক্ষমতার লড়াই" রূপে গণ্য করেন। তবুও এই কথা বলে তাঁরা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলি প্রকৃতিতে রাজনৈতিক নয়। শ্লেচারের মত থেকে আমরা জানতে পারি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্লেচারের মতানুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণ্ডি আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাইতে বড়। সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে আসছে, কিন্তু সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কই রাজনৈতিক নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবলমাত্র বিশ্বসমাজের রাজনৈতিক দিকটা নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শান্তিমূলক, আইনগত—এক কথায় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে। এন. ডি. পামার (N. D. Palmer) এবং এইচ. সি. পারকিনস (H. D. Perkins) ও মনে করেন যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এদের মতে, "আন্তর্জাতিক রাজনীতি" কথাটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হল "আন্তর্জাতিক সমাজের রাজনীতি" বা এর রাজনৈতিক দিক। এদের মতে ঃ "The authors of this volume recognize that 'international relations' is a broader term than 'international politics', and that its study is being enriched by the wider and more versatile approaches and methods currently being pursued. ....."[2] পামার ও পারকিনস আরও মন্তব্য করেছেন যে ঃ "International politics should deal with the politics of the international community in a rather narrow sense, centering on diplomacy and the relations among states and other political units,

whereas international relations is a term properly embracing the totality of the relations among peoples and groups in the world society."[3] জন হ্যানিসিয়েন (John Hanessian) ও ঠিক এক কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল "official political relations between governments acting on behalf of their states. ...."[4] অর্থাৎ তিনিও এই মত ব্যক্ত করেছেন যে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপজীব্য বিষয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমস্ত রাষ্ট্র এবং সরকারগুলির মধ্যে সমস্ত রকমের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। হফম্যান (Hoffmann) ঠিক একই অর্থে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেই সমস্ত উপাদান এবং কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে যেগুলি রাষ্ট্রগুলির বহির্দেশীয় নীতি এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এর মধ্যে সমস্ত রকমের সম্পর্কই আসছে। "রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, সরকারি এবং বেসরকারি" যাবতীয় সম্পর্ক, এক কথায় আমরা বলতে পারি একটি রাষ্ট্রের বাইরের অন্য সব রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক শাস্ত্র।

মরগেনথাও (Morgenthau) কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কথাটার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যবহার করা বেশি পছন্দ করেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বড় কথা হল ক্ষমতার লড়াই — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কে কতখানি ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে এবং তা বজায় রাখতে পারবে বা কিভাবে অন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারবে। মরগেনথাও বলেছেন "the core of international relations is international politics....."[5] সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কথাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থাৎ ক্ষমতা, সংঘর্ষ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, রাজনৈতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ এবং শান্তি স্থাপন। অনেকে আবার "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের" জায়গায় "বিশ্বরাজনীতি" কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। ফ্রাঙ্কেল (Frankel) এই মত পোষণ করেন যে "world politics..... describes its contents more truthfully than the traditional name 'International Relations'...."[6]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসছি যে "বিশ্বরাজনীতি" বা "আন্তর্জাতিক রাজনীতি" আমরা যাই বলি না কেন তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। এখানে আমরা পামার এবং পারকিনসের সঙ্গে একমত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সরকারি, বেসরকারি সমস্ত রকমের সম্পর্কই বুঝি। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন, যুদ্ধ, শান্তি, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের আইনগত, ভৌগোলিক সম্পর্ক, সীমানার বাইরে জনগণের যাতায়াত, চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান, এক রাষ্ট্রের জনগণের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের জনগণের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী—এই সমস্ত কিছুই আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার মধ্যে চলে আসছে।

১.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি

এবার আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটা স্বতন্ত্র বিষয় রূপে খুব অল্পকাল হল দেখা দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখারূপে গণ্য করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, আইন, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব— সমস্ত বিষয়ই কোনও না কোন ভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। এছাড়া বর্তমান শতাব্দীতে ব্যাপক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সম্পর্ক খুবই কাছাকাছি হয়েছে, যাতায়াত ব্যবস্থা হয়েছে খুবই সহজ এবং সুগম, এ দেশের জনগণের আচরণ অন্য দেশের জনগণের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সমস্ত সম্পর্কই আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা গতিশীল বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে শুধুমাত্র কূটনীতির ইতিহাসই বোঝাত। কূটনীতিবিদরা পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণত এদের দ্বারাই ঠিক করা হত। এই সময় যেহেতু "বর্তমান ঘটনাবলীর" উপর কোন জোর দেওয়া হয়নি, এজন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আর কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীর মধ্যে সীমিত না থেকে "বহমান আন্তর্জাতিক" ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে (Inter-war period) পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী বিশ্লেষণের চাইতে আন্তর্জাতিক আইন এবং সংগঠনের উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা মনে করেন যে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ লুকিয়ে আছে আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করার মধ্যে। তাই এই সময় আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন নিয়ে বিশ্বে ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দুর্বলতা, মেরু-প্রবণতা, নির্জোট আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বহু-কেন্দ্রিকতা, আণবিক অস্ত্রের প্রসার, ঠাণ্ডা যুদ্ধ এবং দ্যতাঁত (Detente) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। সুতরাং দিন দিন এর পরিধি বেড়েই চলেছে।

১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু

এবার আমরা সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করি। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত বৈদেশিক সম্পর্কের দপ্তর একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে। গ্রসন কার্ক (Grayson Kirk) সেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়রূপে মোট পাঁচটি বিষয় যুক্ত করেন। সেগুলি হল ঃ

(১) রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা;

(২) রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ;

(৩) বৃহৎশক্তিগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি;

(৪) আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস;

(৫) একটি স্থায়ী এবং সুসংহত বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করা।

সাত বছর পর ভিনসেন্ট বেকার সাতটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলি হল ঃ (১) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং এর প্রধান শক্তিসমূহ; (২) আন্তর্জাতিক জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন; (৩) জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ; (৪) জাতীয় স্বার্থরক্ষা করার জন্য কৌশলসমূহ; (৫) জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রণ; (৬) এক বা বহু রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি; (৭) সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ইতিহাস এবং অন্যান্য উপাদানসমূহের পটভূমিকা রূপে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ। বেকার আরও কতগুলি বিষয়ের উপর জোর দেন যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে দেখা দরকার রাষ্ট্রগুলি কিভাবে তাদের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা রক্ষা করে এবং এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য তারা কিভাবে আচরণ করছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতি কিভাবে সমস্ত রকমের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলছে, বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং ভোগ—এ সমস্ত কিছুই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় চলে আসে। উপরন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে আচরণবাদের উৎপত্তি হয়েছে সেই আচরণবাদ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। বেকার বলেছেন, এক কথায় বৃহত্তর অর্থে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বলতে পারি ঃ "all social relations that transcend national boundaries." অর্থাৎ জাতীয় সীমানার বাইরে সমস্ত রকমের সম্পর্ক।

জোসেফ্ ফ্র্যাঙ্কেল (Joseph Frankel) আরও অনেক বিষয়কে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেমন রাষ্ট্রের সংকট, রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী কারক, পররাষ্ট্র নীতি, জাতীয় স্বার্থ, সংঘাত, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা, জাতীয় শক্তি, আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রভৃতি। এক কথায় আমরা বলতে পারি, এর বিষয়বস্তু ব্যাপক এবং জটিল। কোন স্থানেই বা বিন্দুতে এর ছেদ টানা যায় না—সমাজ এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর বিষয়বস্তুর পরিধিও বাড়বে।

১.৪.১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি বিজ্ঞান?

এবার আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমরা দেখি ঠিক বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি। বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি সুসংবদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান বলতে আমরা কতগুলি পদ্ধতি বুঝি যার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই পদ্ধতিগুলি হ'ল observation বা পর্যবেক্ষণ, classification বা শ্রেণীবিন্যাস, পরিমাণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, exactness বা সর্বক্ষেত্রে সঠিক হওয়া এবং universality বা সার্বজনীনতা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যেমন আমরা প্রকৃত অর্থে ভৌতবিজ্ঞান, গণিত বা রসায়ন শাস্ত্রের মত বিজ্ঞান

বলতে পারি না—অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও আমরা গণিত, ভৌতবিজ্ঞান বা রসায়ন শাস্ত্রের মত বিজ্ঞান বলতে পারি না। হাজার হলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু জটিল এবং এখানে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত আমরা কতগুলি অচেতন পদার্থ নিয়ে আলোচনা করি না। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হ'ল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যেগুলি মানুষের ব্যবহার বা আচরণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সমস্ত কিছুই কোন না কোন ভাবে মানবের আচরণ, সিদ্ধান্ত বা কার্যের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। মানুষের আচরণ সম্পর্কে কোন forecast বা পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব নয়—বিষয়টি ঘন ঘন পরিবর্তনশীল উপরন্তু আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা বা এনিয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সমগ্র পৃথিবীই আমাদের গবেষণাগার। আবার পরিমাপের সুযোগও এখানে সীমিত, কারণ মানুষের ব্যবহার বা আচরণ, আবেগ, অনুভূতি আমরা পরিমাপ করতে পারি না। আবার প্রকৃত বিজ্ঞানের বড় কথা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। যেমন ২ এবং ২ যোগ করলে ৪ (চারই) হবে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিশালে জল হবে এটা সব ক্ষেত্রেই সত্য। এর একটা সুস্পষ্টতা বা সঠিকতা এবং সার্বজনীনতা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কোন তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারি না যার দ্বারা কোন কিছুর সার্বিক সমাধান সম্ভব বা এমন কোন law বা সূত্র গড়ে তুলতে পারি না যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও আমরা বলব যে সীমিত গণ্ডির মধ্যে আমরা পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, পরিমাপ এবং পরীক্ষা করে একটা তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারি। যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ দেখে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে। আবার শক্তিসাম্য নষ্ট হলে কি হবে তাও আমরা বলতে পারি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে। মরগেনথাউ এবং কুইনসি রাইটও একে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেননি। তা সত্ত্বেও কুইনসি রাইট বলেছেন যে সমস্ত বিষয়েরই এখন বিজ্ঞান হওয়ার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি একটা উদ্দেশ্যসাধক বিষয় এবং এজন্যই একে বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে—অবশ্য কিছুটা সীমিত অর্থে।

১.৫ অনুশীলনী

1. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
2. আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।
3. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি বিজ্ঞান?
4. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্গত দুটি বিষয়ের নাম করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Schleicher, *International Politics*, Prentice Hall of India (pvt.) Ltd., N. D., 1963.

2. Burton, J. W., *International Relations, A General Theory*, Cambridge, England, 1965.

3. Frankel, Joseph, *International Relations in a Changing World*. O. U. P., Bombay, 1983

4. Palmer & Perkins, *International Relations.*, 3rd Revised Edition, A. I. T. B. S. Publishers, N. D. 1997.

5. Chanda, P., *International Politics*, Vikas, N. D. 1982

একক ২ ☐ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের দৃষ্টিভঙ্গী

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ বাস্তববাদী তত্ত্ব

২.৩ ক্রীড়াতত্ত্ব

২.৪ ভারসাম্যের তত্ত্ব

২.৫ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন :

- আন্তর্জাতিক পাঠের দৃষ্টিভঙ্গীগুলি কি কি
- বাস্তববাদী তত্ত্ব কাকে বলে
- ক্রীড়া তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়
- ভারসাম্যের তত্ত্ব কি এবং
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী কি।

২.১ প্রস্তাবনা

যে কোন বিজ্ঞানসম্মত পাঠ বা আলোচনায় একটি সুসংবদ্ধ চিন্তা বা মননের প্রস্তুতি প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের অন্তর্গত বিষয়বস্তু যেহেতু ব্যাপক সেজন্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর আলোচনা করা দরকার যার থেকে এর স্বতন্ত্র চরিত্র ফুটে উঠবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি তত্ত্ব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

২.২ বাস্তববাদী তত্ত্ব (Realist Theory)

এক্ষেত্রে প্রথমত হ্যান্স মরগেনথাও (Hans Morgenthau) এর Realist Theory বা বাস্তববাদী তত্ত্বের আলোচনা করতে পারি। মরগেনথাও তাঁর তত্ত্বকে কোনো অবাস্তব বা মনগড়া বিষয়ের উপর দাঁড় না করিয়ে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিচার করতে হবে অভিজ্ঞতা বা ঘটনার সাহায্যে, কোন আদর্শ বা অবাস্তব বিষয়ের দ্বারা নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিচার করতে হবে এর উদ্দেশ্যের দ্বারা। উদ্দেশ্য হ'ল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে, তাদের একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সমাজে একটা Order বা শৃঙ্খলা আনা। এই মতবাদে বলা হয়েছে যে মানুষের মধ্যে এখনও দেবত্ব আসেনি তার প্রকৃতির মধ্যে অনেক irrational বা অযৌক্তিক উপাদান আছে সুতরাং আন্তর্জাতিক কাঠামোও Imperfect বা অসম্পূর্ণ। আমাদের পৃথিবীর উন্নতি করতে হলে এই সমস্ত উপাদানগুলি নিয়েই কাজ করতে হবে; এদের বাদ দিয়ে বা এদের বিরুদ্ধে গিয়ে নয়। আমরা পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখি যে, এই পৃথিবী কলহ, সংঘর্ষ এবং বিবাদে পূর্ণ। সম্পূর্ণ নৈতিক আদর্শে পৌঁছনো কখনও সম্ভব নয়, তবে আমরা এর কাছাকাছি যেতে পারি স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সংঘর্ষের সমাধান করে। এজন্যই মরগেনথাও বলেছেন Checks and Balance বা নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য নীতির কথা। মানবসমাজ হ'ল Pluralist বা বহু বৈচিত্র্যময়। এজন্যই এই তত্ত্ব অবাস্তব কোনো নীতিকে বিশেষ মূল্য না দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার উপর বেশি নির্ভর করে এবং এর ফলেই absolute good বা পূর্ণ মঙ্গলে পৌঁছতে না পারলেও অপেক্ষাকৃত কম খারাপ বা lesser evil-এ পৌঁছনোর চেষ্টা করা যায়। মরগেনথাও ছাড়াও Thompson, Kenan, Schuman, Lasswell প্রমুখ এই মতের সমর্থক। মরগেনথাও ছয়টি নীতির সাহায্যে তার বাস্তববাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, তিনি বলেছেন যে সমাজের মত রাজনীতিও কতগুলি বাস্তব নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় যার উৎস লুকিয়ে আছে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে। সমাজের উন্নতি করতে হলে আমাদের সমাজের রক্ষাকর্তা এই সমস্ত নিয়মের অনুসন্ধান করতে হবে। মরগেনথাওয়ের মতে রাজনীতি একটা বাস্তব তত্ত্বে বিশ্বাস করে যা হবে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনিষ্ঠ। এই তত্ত্ব সেইজন্যই কোনটা সত্যি, কোনটা যুক্তি এবং তথ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং কোনটি নিছক মত যা পুরোপুরি ব্যক্তির পছন্দসাপেক্ষ এবং তথ্য ও যুক্তি থেকে পৃথক এদের মধ্যে পার্থক্য করে। মরগেনথাও, যুক্তি, তথ্য, তথ্যের পরীক্ষা, এবং বস্তুগত দিকের প্রতি বেশি নজর দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, পররাষ্ট্র নীতি বুঝতে হলে আমাদের বিভিন্ন ঘটনাবলী পরীক্ষা করতে হবে এবং এদের ফলাফলকেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইভাবেই আমরা একটা বাস্তব-ঘেঁষা তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারি।

দ্বিতীয়ত, মরগেনথাও এর মতে, এই তত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতীয় স্বার্থ যা প্রত্যেক রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে প্রকার করার চেষ্টা করে। মরগেনথাওয়ের মতে এই ধারণা ছাড়া আমরা অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ক্ষেত্রে কোন তত্ত্ব গঠন করতে পারিনা বা আমরা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অরাজনৈতিক

বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। মরগেনথাও এর মতে বাস্তববাদী তত্ত্ব উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তা না করলে আমরা রাজনৈতিক ঘটনা বা বিদেশনীতিকে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারব না। রাষ্ট্রনায়কদের Motives বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সব সময় জানা সম্ভব নয়। মরগেনথাওয়ের মতে এটা সব সময়ই প্রতারণাপূর্ণ, কারণ এটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এবং সব সময়ই রাষ্ট্রনায়কদের স্বার্থ এবং আবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। আবার উদ্দেশ্যের দ্বারা সব সময় কোন রাজনৈতিক ঘটনা বা বিদেশনীতি বোঝা মুশকিল। হয়তো উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু তার অনুসরণে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে তার ফল হতে পারে ভয়াবহ। যেমন উদাহরণরূপে আমরা বলতে পারি আপাতদৃষ্টিতে চেম্বারলিনের উদ্দেশ্য হয়তো মন্দ ছিল না। কিন্তু পরিণামে দেখা গেছে এর থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জীবননাশ হয়। আবার স্যার উইন্স্টন চার্চিল (Sir Winston Churchill) এর উদ্দেশ্য ছিল চেম্বারলিনের তুলনায় অনেক সংকীর্ণ—এটা তাঁর ব্যক্তিগত এবং জাতীয় ক্ষমতার প্রকাশ ছিল। তবুও আমরা বলতে বাধ্য যে এই উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য তিনি যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ছিল চেম্বারলিনের তুলনায় অনেক সার্থক এবং সফল। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিই ইংল্যান্ডকে জয়ের পথে নিয়ে যায়। সুতরাং ভাল উদ্দেশ্য হলেই যে রাজনৈতিক সাফল্য আসবে বা উদ্দেশ্য ভাল হলেই যে তা নৈতিক হবে তার কোন মানে নেই। তাই মরগেনথাও মন্তব্য করেছেন ঃ "good motives . . . do not guarantee the moral goodness and political success of the policies they inspire." আর একটা বিষয়ের দিকে এই তত্ত্ব নজর দেবে, তা হ'ল রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক নীতি তৈরি করার সময় তাদের ব্যক্তিগত দর্শন বা সহানুভূতিকে কখনই একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলবেন না। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিগত দর্শন এবং সহানুভূতিমূলক ধ্যানধারণা কোন প্রভাব ফেলবে না। রাষ্ট্রনায়ক অবশ্যই আব্রাহম লিঙ্কনের মত "official duty" কে "personal wish" অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে পৃথক করবেন। দুটো যেন একসঙ্গে গুলিয়ে না যায়। গুলিয়ে গেলেই রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকারী বাস্তববাদী নীতি নেওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

বাস্তববাদী তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই তত্ত্বের মধ্যে একটা Normative বা আদর্শ বা নীতিগত দিক আছে। আবার এই তত্ত্ব মরগেনথাও এর মতে হবে যুক্তিসঙ্গত বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী, কারণ যুক্তিসঙ্গত বৈদেশিক নীতিতে ঝুঁকি কম থাকে কিন্তু লাভ বেশি হয়। তৃতীয়ত, মরগেনথাওয়ের মতে এই তত্ত্ব স্বার্থকে নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তিত রূপে দেখে না। স্বার্থের ধারণা পরিবর্তনশীল। রাজনৈতিক কার্যাবলী এবং বৈদেশিক নীতিকে বিচার করতে হবে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে। ক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ক্ষমতার বিষয়বস্তু এবং কিভাবে একে ব্যবহার করা হয় তাও নির্ভর করে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিগুলের উপর।

চতুর্থত, মরগেনথাওয়ের মতে বাস্তববাদী তত্ত্ব নীতিবোধের উপর গুরুত্ব দেয়, কিন্তু এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে কোনো সর্বজনীন নৈতিক মানদণ্ডের দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা করে সম্ভব

নয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী, তার পররাষ্ট্রনীতি — এই সমস্ত দেখতে গেলে আমাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনের দিকে তাকাতে হবে। এই তত্ত্ব নীতিবোধ এবং রাষ্ট্রের চাহিদার মধ্যে যে বিরোধ আছে সে সম্পর্কে সজাগ। এই তত্ত্ব মনে করে যে দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতাই হ'ল রাজনীতির আসল কথা। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ছাড়া রাজনৈতিক নীতিবোধ হয় না। রাজনৈতিক কার্যাবলীর ফল দেখেই আমাদের বিচার করতে হবে কোন কাজ ভাল না মন্দ। ব্যক্তিগত নীতিবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিবোধ এক নয়। ব্যক্তির মত রাষ্ট্র বলতে পারে না — "Let Justice be done, even if the world perishes". কারণ রাষ্ট্রের উপর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করছে। রাজনৈতিক কাজের সর্বশেষ ফলাফল যদি নৈতিক বা লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল করে তখন আমাদের বলতে হবে ঐ কাজটিও ভাল ছিল যার ফলে লোকের মঙ্গল হয়েছে। এখানে ইতালীয় কূটনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলির (Machiavelli) কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "End Justifies the means." প্রসঙ্গক্রমে আমরা লিঙ্কনের (Lincoln) এর কথাও বলতে পারি ঃ "If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. If the end brings me out wrong, ten angels swearing I was right would make no difference."[2] উপযুক্ত রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্যের কথাই বলেছেন লিঙ্কন।

পঞ্চমত, মরগেনথাও তাঁর এই তত্ত্বে বলেছেন যে আমরা সব সময় মনে রাখব যে কোন রাষ্ট্রের নৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষাকে সর্বজনীন নৈতিক বিধির সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার জাতীয় স্বার্থকে এবং আশাআকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের কার্যাবলীকে সর্বজনীন নৈতিক উদ্দেশ্যের আবরণে ঢেকে রাখতে চায়।

ষষ্ঠত, বাস্তববাদী তত্ত্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করে; যেমন অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য দাবি করে থাকে। বাস্তববাদী তত্ত্ব জাতীয় স্বার্থকে ক্ষমতা রূপে বর্ণনা করে সব কিছুকেই এই মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা করে। যেমন অর্থনীতিবিদ সম্পদ, আইনবিদ আইন এবং নীতিশাস্ত্রবিদ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার করেন। বাস্তববাদী তত্ত্ব অন্য সমস্ত মানদণ্ডকে রাষ্ট্রীয় মানদণ্ডের অধীনস্থ করে। কোন কিছু বিচার করতে গেলে এটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা বা মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে, আইন বা নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে বাস্তববাদী তত্ত্ব অন্য সব কিছুকে অগ্রাহ্য করছে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্ষেত্র আছে। এই তত্ত্ব মানুষকে "বহুমুখী" প্রাণীরূপে দেখে। তার মধ্যে political man, economic man, legal man, moral man — এর সব কিছুই লুকিয়ে আছে। একটাকে বাদ দিয়ে মানুষ অসম্পূর্ণ। সুতরাং মানুষ সব কিছুরই সমষ্টি। তাই বাস্তববাদী তত্ত্ব মনে করে একটা দিক আলোচনা করতে হলে তখন শুধুমাত্র সেইদিক নিয়েই আলোচনা করতে হবে অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে। তবে সঙ্গে সঙ্গে মরগেনথাও এ কথাও বলেছেন যে একটা আলোচনা করতে গেলে অন্যগুলোর কথা এবং প্রভাব সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে।

মরগেনথাওয়ের তত্ত্বকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রথমত, বলা হয় যে মরগেনথাওয়ের তত্ত্ব শুধুমাত্র conflict বা সংঘর্ষের উপরই বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজে সহযোগিতারও মূল্য কম নয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রকৃতিকে হবস বা ম্যাকিয়াভেলীর মত স্বার্থপর এবং ক্ষমতালিপ্সু রূপে দেখা হয়েছে। এও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের মধ্যে ভালমন্দ দুইই আছে।

তৃতীয়ত, বাস্তববাদী তত্ত্ব ক্ষমতার উপর খুব বেশি জোর দিয়েছে। ক্ষমতা রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে একটা বড় ভূমিকা পালন করে, কিন্তু ক্ষমতাই সব নয় — ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও তাদের ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থত, বাস্তববাদী তত্ত্ব জাতীয় স্বার্থকে ক্ষমতার ভিত্তিতে আলোচনা করে — এটাও সংকীর্ণ এবং অসম্পূর্ণ।

২.৩ ক্রীড়াতত্ত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার আর একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল Game Theory। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক সময় একটা game বা খেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। গেম থিওরিকে একটি গাণিতিক মডেল (Model) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এই মতবাদের অনেক প্রবক্তা আছেন, তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন অস্কার মরগেনস্টার্ন (Oscar Morgenstern)। সংশ্লিষ্ট আর যাঁদের নাম করতে হয় তারা হলেন নিউম্যান (Neumann) কার্ল ডয়েটস্ (Karl Deutsch) প্রমুখ লেখকগণ। এই তত্ত্বে বলা হয় যে সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে একটা যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত করতে হবে যাতে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী রাষ্ট্রের লাভ হবে সবচেয়ে বেশি এবং লোকসান হবে সবচেয়ে কম। যে গাণিতিক মডেল প্রয়োগ করা হয় তা হ'ল "Two persons zero-sum game." এখানে দু'জন খেলুড়ে থাকে এবং একজন যা জেতে অন্যজন তা হারে। আরও একটা মডেল আছে যে সম্পর্কে J. K. Zawodry আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে কোন কোন সংঘাত দূর করা যায় যেখানে কোন পক্ষই লোকসান করে না আবার সমস্ত পক্ষই কিছু কিছু লাভ করে। একে বলা হয় Non-zero sum game। এখানে একাধিক দল বা পক্ষ থাকে।

Game Theory প্রয়োগের দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ঃ

Chicken model এবং Prisoners' dilemma। প্রথম প্রতিরূপটিতে Chicken বা মুরগীর নাম দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে প্রাণী হিসেবে মুরগী অতি নির্বিবাদী এবং আত্মরক্ষার ওপরই জোর দেয়। আক্রমণের বদলে। যেমন ধরা যাক, খুব সংকীর্ণ এক গিরিপথে দুটি গাড়ি সামনাসামনি এসে পড়েছে অথচ পাশাপাশি যাওয়ার মত বাড়তি জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে যদি সংঘাতমূলক অহঙ্কারী মনোভাব নিয়ে দুই চালকই এগিয়ে যেতে চায় তাহলে দুর্ঘটনা অনিবার্য এবং উভয়েরই সমূহ বিনাশ সহজেই অনুমেয়।

এক্ষেত্রে উভয় গাড়ির চালকই খানিক মানিয়ে নিয়ে চললে উভয়েরই লাভ। একজনকে এক্ষেত্রে পিছিয়ে এসে অন্যকে এগোবার রাস্তা করে দিতে হয়, তাতে কিছুটা অসম্মান হলেও মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয় না। উভয়েরই এতে সামান্য লোকসান হল বটে কিন্তু তার বিনিময়ে পারস্পরিক প্রাণ বাঁচানোর সাধারণ স্বার্থ বজায় থাকল।

অন্য একটি প্রতিরূপের কেন্দ্রে আছে প্রাণদণ্ডে দণ্ডযোগ্য দুই আসামী যাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অবশ্য কারো বিরুদ্ধেই চূড়ান্ত প্রমাণ তাতে পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে কারাধ্যক্ষ দুই আসামীকেই সুযোগ দিয়ে বললেন, দু'জনের মধ্যে যে অপরাধ কবুল করবে অথবা অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ দিতে পারবে তাকে লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে আর অন্যজনের হবে প্রাণদণ্ড। অবশ্য অপরাধ কবুল করলে যে শেষপর্যন্ত কী শাস্তি কপালে জুটবে তার স্থিরতা নেই। আবার দুজনের মধ্যে কে আগে কবুল করবে সেটাও পরস্পরের অজানা। এই পরিস্থিতিতে যদি দুই আসামী স্থির করে কেউই আগে মুখ খুলবে না অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থেই এভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে কারাধ্যক্ষের কিছু করার থাকে না। প্রমাণের অভাবে উভয়কেই লঘুদণ্ড দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আবার দুই আসামীই সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে ভীষণ শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

আন্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ বিশেষ প্রযোজ্য। যেমন পরমাণু অস্ত্রধর দুই রাষ্ট্র বিরোধের চরম সীমায় পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ থেকে নিবৃত হয়, কেননা যে রাষ্ট্রই এই অস্ত্রপ্রয়োগ করুক না কেন যুদ্ধের পরিণামে ধ্বংসলীলা থেকে কেউই রেহাই পাবে না। আবার, শক্তিশালী দেশগুলি যখন দুর্বল দেশগুলির ওপর আধিপত্য জারি করতে চায় কিংবা জবরদস্তি অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে তাদের পদানত করতে চায় তখন বন্দী আসামীদ্বয়ের মত দুর্বল রাষ্ট্রগুলি পরস্পর জোটবদ্ধ হয়ে, শলাপরামর্শ করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে।

তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এই মডেলকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সব সময় প্রয়োগ করা যায় না। এ সম্পর্কে ডয়েট্‌শ মন্তব্য করেছেন যে এই তত্ত্ব ধরে নেয় যে সংঘাতের ছেদ আছে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন শেষ নেই। Game Theory সংঘাত, শত্রু এবং বিরোধী পক্ষ ধরে নিয়ে কৌশলের কথা বলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন সংঘাত আছে অনুরূপভাবে সহযোগিতাও আছে। এজন্যই Schelling bargaining বা দরকষাকষির তত্ত্বের কথা বলেছেন।

২.৪ ভারসাম্যের তত্ত্ব

অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ করা হয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রেও সেরূপ ভারসাম্যের তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন জর্জ লিস্কা (George Liska)। ভারসাম্য রক্ষার তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং এগুলি এমনভাবে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোন অবস্থার পরিবর্তন হলে বা

প্রতিক্রিয়া হলে উপাদানগুলি আপনা আপনি একটা ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে পরিবর্তন হয়ে আবার ভারসাম্য আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে। এখানে কতগুলি শর্তের কথা বলা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি আসে, আবার যার ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত শর্তের প্রয়োগ এমনভাবে করা হয় যাতে কোন দেশই শক্তিশালী হয়ে ভারসাম্য নষ্ট করতে না পারে। লিস্কা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যের কথা বলেছেন। লিস্কা মনে করেন যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য নির্ভর করে এর সদস্যদের দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের উপর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য নির্ভর করে রাষ্ট্রগুলির মনোভাব, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর। আবার বিশ্বশান্তি, প্রগতি এসমস্ত কিছুই ভারসাম্যের উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে।

২.৫ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী

মার্কসবাদ রাজনীতিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করে। মার্কসবাদ মনে করে Mode of production অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক (Productive forces এবং Productions relations) রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। কোন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি কি তা জানতে হলে আমাদের সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকাতে হবে এখানেই Base এবং Superstructure এর কথা চলে আসছে। Base বা অর্থনীতি রাজনৈতিক উপরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে। কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে সেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনের স্বরূপ। অর্থাৎ কাদের হাতে আছে উৎপাদনব্যবস্থা এবং কারা তার মালিক। খুবই স্বাভাবিক যে তারাই নিজের স্বার্থে রাজনৈতিক নীতিকে ঠিক করবে। তাদের স্বার্থেই আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। দেশের মধ্যে তারা চায় মুনাফা অর্জন করতে। পুঁজিবাদে এরাই উৎপাদনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। অতএব এরাই দেশের রাজনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতিকে নির্ধারণ করে। এখন পুঁজিবাদে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত — পুঁজিবাদ হ'ল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। একদিকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র খেটে খাওয়া মজুরের দল আর একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি যারা পুঁজির মালিক। এরা নিজেদের স্বার্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের শোষণ করে তাদের পুঁজির পাহাড় তৈরি করে। পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করার জন্য, বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বাজার তৈরি করার জন্য উপনিবেশ স্থাপন করে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে এই পথ নিতে হয় নিজেকে বাঁচার জন্য। এর ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার একটা পর্যায়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় "Imperialism is the highest stage of capitalism" — এই পর্বে উৎপাদন পুঁজি এবং লগ্নী পুঁজি এক হয়ে সৃষ্ট হয় অর্থপুঁজি (finance capital), এই পুঁজি খাটাবার জন্য এরা বাজার খোঁজে এবং এর ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবে পুঁজিবাদ নিজেই নিজের সর্বনাশ সৃষ্টি করে।

পুঁজিবাদ বিশ্বাস করে হামলাবাজি, সংঘর্ষ, শোষণ এবং বর্ণবিদ্বেষে। পুঁজিবাদী দেশগুলি চালায়

পুঁজিপতিরা। অতএব অত্যধিক মুনাফার আশায় তারা যুদ্ধ চায়। কারণ যুদ্ধ বাধলে বিভিন্ন দেশে এরা অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতে পারবে। আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রকাশ্য প্রাধান্য রয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের। অতএব তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন নীতি নিতে বাধ্য করে যা যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি করে, সবসময়ই সংঘর্ষ এবং বিবাদকে জিইয়ে রাখে এবং রাষ্ট্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করে। ফলে সব দেশই অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে। স্বভাবতই পুঁজিবাদ কখনই নিরস্ত্রীকরণে উৎসাহ দেবে না।

অন্যদিকে মার্ক্সবাদী বা সমাজবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি, সাম্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মুক্তি। এজন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদী রাষ্ট্রের নীতিই হ'ল মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, যুদ্ধের অবসান করা, বর্ণবিদ্বেষকে দূর করা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা। এই সমাজবাদ চায় সমগ্র বিশ্বেই শোষণবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান এবং নিরস্ত্রীকরণ।

সুতরাং আমরা দেখলাম যে মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে। এটাও বোঝা গেল যে যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনা সম্ভব হবে না।

২.৬ অনুশীলনী

1. মরগেনথাওয়ের বাস্তববাদী তত্ত্বটি সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।
2. বাস্তববাদী তত্ত্বের ত্রুটিগুলি আলোচনা করুন।
3. বাস্তববাদী তত্ত্বের দু'জন প্রবক্তার নাম করুন।
4. বাস্তববাদী তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি?
5. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় ক্রীড়াতত্ত্বের প্রয়োগ কি ভাবে হয় বুঝিয়ে দিন।
6. ভারসাম্যের কি কি অর্থ হতে পারে।
7. আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণের মার্ক্সবাদী তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
8. আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. J. Morgenthau, *Politics among* Nations, Kalyani Publishers, N.D., 1985
2. P. Chandra, *International Politics*, Vikas Publishing House, N.D. 1982.
3. Couloumbis & Wolfe, *International Relations*, Prentice Hall of India, N.D. 1981.

4. নির্মলকান্তি ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬।

5. Morton Kaplan, *System and Process in International Politics*, N. Y. Wiley 1957.

6. John, Herr H. *Political Realism and Political Idealism : A Study in Theories and Realities*, Chicago University Press, 1951.

7. Stanley Hoffman ed., *Contemporary Theory in International Relations*, Englewood Cliffs, 1960.

8. Liska, George, *International Equilibrium*, Cambridge Mass. Harvard University Press, 1957.

একক ৩ ❑ জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের পন্থা

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ জাতীয় শক্তির প্রকৃতি

৩.২.১ প্রভাব এবং বলপ্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য

৩.৩ জাতীয় শক্তির পরিবর্তনশলীতা

৩.৪ জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ

৩.৫ জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ

৩.৫.১ শক্তির ভারসাম্য

৩.৫.২ যৌথ নিরাপত্তা

৩.৫.৩ আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও জনমত

৩.৫.৪ আন্তর্জাতিক আইন

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করবার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জাতীয় শক্তি কাকে বলে ও তার প্রকৃতি কি
- জাতীয় শক্তির পরিবর্তনশীলতা
- জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ
- জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ

৩.১ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে শক্তিও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বস্তুতপক্ষে শক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের কোন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় শক্তি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শক্তির মাধ্যমেই সবশেষে রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবে রূপায়িত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন রাষ্ট্র কতখানি তার ভূমিকা পালন করবে, কতখানি তার জাতীয় স্বার্থ সম্পাদন করতে পারবে বা তাকে রক্ষা করতে পারবে বা কিভাবে এর পররাষ্ট্রনীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করবে এসব কিছুই নির্ভর করছে রাষ্ট্রের শক্তির উপর। শ্লেচার শক্তিকে খুব গুরুত্ব দেননি এবং বলেছেন যে "It is simply not correct, therefore, to say that politics is a struggle for power, or at least for power alone."[1] — তিনিও বলেছেন যে এই মন্তব্যকে খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি তাই মরগেনথাও এর সুরেই বলেছেন যে রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই হোক না কেন শক্তিই হ'ল এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। তিনি স্বীকার করেছেন যে "power is one means and an important one, to obtain goals."[2] এমন কি পামার এবং পারকিন্‌স্‌ও মন্তব্য করেছেন : To say that states possess power is to say what everybody knows and what many people deplore."[3] এই মন্তব্য করেও উনি বলেছেন যে শক্তি রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মরগেনথাও (Morgenthau) কিন্তু শক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মরগেনথাও এর মতে "The struggle for power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience."[4] মরগেনথাও মন্তব্য করেছেন যে কথা আমরা আগেও বলেছি যে "International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim."[5] সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে শক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে Goal বা উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তা পূরণ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন।

৩.২ জাতীয় শক্তির প্রকৃতি

এখন আমরা দেখি এই জাতীয় শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি? শক্তির বা Power কে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে একে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন গণিত শাস্ত্রে আমরা শক্তি বলতে বুঝি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা যেমন X^2 বা 8^2 বলতে আমরা বুঝি $X \times X$ বা 8×8 অর্থাৎ এখানে ফ্রাঙ্কেলের (Frankel) মতে শক্তিকে একটা technical অর্থে ধরা হয়েছে — এখানে Power বলতে বোঝায় একই সংখ্যাকে গুণ করায়। আবার পদার্থবিদ্যায় শক্তিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে power বা শক্তি বলতে বোঝায় energy র রূপান্তরকরণ। যেমন ১ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন —

এটা বলতে আমরা বুঝি একটা ইঞ্জিনের কর্ম করার ক্ষমতা। আবার মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারে শক্তি বলতে আমরা বুঝি একটা সম্পর্কগত বিষয়। এখানে শক্তি বলতে আমরা বুঝি "the capacity to produce intended effects" — অর্থাৎ শক্তি বলতে আমরা বুঝি একজন যা চান অন্যকে দিয়ে তা করিয়ে নেবার ক্ষমতা। ফ্রাঙ্কেলের মতে রাজনৈতিক শক্তি বলতে আমরা বুঝি অন্য লোকের মন এবং কার্যাবলীর উপর প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা। ফ্রাঙ্কেল এখানে অধ্যাপক মরগেনথাওয়ের কথাই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি যে মরগেনথাও এর সঙ্গে এমত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মরগেনথাউ-এর মতে রাজনীতিতে শক্তি বলতে আমরা বুঝি "the power of man over the minds and actions of other men." জর্জ সোয়াৎর্সেনবার্গার (George Schwarzenberger) শক্তির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে শক্তি হ'ল "capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance."

৩.২.১ প্রভাব এবং বলপ্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ অর্থে বলপ্রয়োগ থেকে শক্তিকে পৃথক করা দরকার। বলপ্রয়োগ না করেও বলপ্রয়োগের ভয় দেখানোর নামই হ'ল শক্তি। তাহলে আমরা দেখছি সোয়াৎর্সেনবার্গার প্রভাব (influence) এবং শক্তির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। ল্যাসওয়েল এবং ক্যাপলানও ঠিক অনরূপভাবে বলেছেন যে অন্যের আচরণকে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হ'ল শক্তি। রবার্ট ডাল (Dahl), অ্যালান বল (Alan R. Ball) অর্গ্যানস্কি (Organski), মরগেনথাউ (Morganthau), কার্ল ডয়েটশ (Karl Deutsch), কুলোম্বিস (Couloumbis) এবং উলফ্ (Wolfe) — প্রায় প্রত্যেক লেখকই শক্তিকে একটা সম্পর্কের দিক থেকে দেখেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি বলতে আমরা বুঝি অন্য রাষ্ট্রের আচরণ এবং কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য। "It is the ability of a state to control the behaviour of other states in accordance with one's own will." আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতির পাশাখেলায় যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অন্য রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি সেই রাষ্ট্রই নিঃসন্দেহে অন্যকে কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে বা অন্য রাষ্ট্রকে কোন কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি সম্পর্কে দুটো ভুল ধারণা আছে। প্রথমত, শক্তি বলতে অনেকে সাধারণত সামরিক শক্তি বোঝেন। দ্বিতীয়ত শক্তিকে পরিমাপ এবং পরিমাণ করা যায়। ফ্রাঙ্কেল এর মতে শক্তি কখনই "measurable and quantifiable" নয়। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ আছে। রবার্ট ডাল এবং কার্ল ডয়েট্শ বলেছেন যে শক্তিকে পরিমাপ করা যায়। আমাদের মতে শক্তির পরিমাণ করা খুবই কঠিন কারণ, এর সঙ্গে অনেক বিষয়ই জড়িয়ে আছে।

আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের শক্তি, প্রভাব (influence), বল প্রয়োগ (force) - এদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

ফ্রাঙ্কেল এর মতে influence বা প্রভাবের সঙ্গে বলপ্রয়োগ জড়িত নেই। এখানে ফ্রাঙ্কেল অবশ্য হ্যারল্ড স্প্রাউট (Harold Sprout) এর মতকেই গ্রহণ করেছেন। কুলোমবিস এবং উলফ্ও বলেছেন যে প্রভাব (influence) বলতে আমরা বুঝি অন্যকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের মতে বা পথে আনা। কিন্তু power বা শক্তির সঙ্গে সবসময়ই একটা element of coercion বা বলপ্রয়োগের উপাদান থাকে। সুতরাং অনেকে দুটোকে এক মনে করলেও দুটো এক নয়।

আবার শক্তি এবং বলপ্রয়োগও এক নয় যদিও অনেকে দুটোকে সমার্থক বলে মনে করেন। কুলোমবিস এবং উলফ্ মনে করেন যে বলপ্রয়োগের মধ্যে কোন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি হয় বাস্তবে থাকে না হয় Reserve বা প্রহরায় থাকে প্রয়োজনে যাকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে বলপ্রয়োগের মধ্যে সামরিক শক্তি থাকে। কিন্তু শক্তি বা Power আরও বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করা হয়। এর পরিধি আরও ব্যাপক। এটা শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের ভয় দেখানো বা বাস্তবে বলপ্রয়োগ নয়। এর মধ্যে অন্যান্য অহিংস পদ্ধতি যুক্ত আছে যেমন বুঝিয়ে, অর্থনৈতিক পুরস্কার দিয়ে, সহযোগিতার মাধ্যমে বা মতাদর্শগত ঐক্যের সাহায্যে।

শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের আরও কতগুলি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শক্তিকে উদ্দেশ্য (end) এবং মাধ্যম (means) — এই দুই দিক থেকেই আলোচনা করতে হবে। অধিকাংশ লেখকই শক্তিকে মাধ্যম বা means রূপে গণ্য করেছেন। এদের মতে, কোনো কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এখানে শক্তি একটা মাধ্যম। আবার Real Politik বা বাস্তববাদী আলোচকদের মতে শক্তি একই সঙ্গে মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য রূপে কাজ করে। এদের মতে যদি রাষ্ট্র অল্প সময়ে শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্জন করতে চায় তখন তা হয় অসম্ভব এবং অপ্রাসঙ্গিক। এদের মতে এখানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা হয় শক্তির মাধমে। সুতরাং এখানে শক্তি মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য রূপে কাজ করে।

৩.৩ জাতীয় শক্তির পরিবর্তনশীলতা

শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের আর একটা দিকে কুলোমবিস এবং উল্ফ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা মনে রাখব যে জাতীয় শক্তির ধারণা একটা গতিশীল বিষয়। কখনই এটা স্থিতিশীল নয়। জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয় সবই পরিবর্তনশীল। সুতরাং আজ যে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে--পরে হয়তো দেখা যাবে সেই রাষ্ট্রই, যে অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতো—অপর রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অবস্থা এরকম হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত

সেই জার্মানিই পরে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। জাতীয় শক্তির আলোচনার ক্ষেত্রে capabilities বা সামর্থ্যের কথা চলে আসে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের আধিপত্য বা শক্তি নির্ভর করে এই সামর্থ্যের উপর। এই সামর্থ্যগুলি নির্ভর করে জাতীয় শক্তির উপাদানের উপর বা সহজ কথায় আমরা বলতে পারি সামর্থ্যগুলিই হ'ল Elements of power of nation states বা জাতীয় রাষ্ট্রের শক্তির উপাদান। এই সমস্ত উপাদানগুলি বা সামর্থ্যগুলি আলোচনা করার আগে কতকগুলি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, সমস্ত উপাদানসমূহই অন্য রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী এবং বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র পরিমাণের দ্বারা কোনো উপাদানের কার্যকারিতা বোঝা যায় না। যেমন শুধুমাত্র জনসংখ্যার পরিমাণ দেখলেই হবে না — জনসংখ্যার বয়স, দক্ষতা, শিক্ষা, খাটার ক্ষমতা — সব কিছুই বিচার করতে হবে।

তৃতীয়ত, জাতীয় রাষ্ট্রের শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানই তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। একটির ঘাটতি হলে সমস্ত ক্ষমতার চিত্রটিই পাল্টে যায়।

চতুর্থত, এই সমস্ত উপাদানগুলি কমবেশি দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো যায়।

পঞ্চমত, যেহেতু আমরা বর্তমানকালে এক দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিগরি উন্নতির যুগে বাস করি তাই অন্যান্য উপাদানের গুরুত্ব ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে।

ষষ্ঠত, তৎপরতার সঙ্গে কাজ করার বা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও আমাদের বিচার করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রস্তুতিকে আমরা এজন্য বাদ দিতে পারি না।

৩.৪ জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জাতীয় শক্তি এবং তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হলাম এবার আমরা সংক্ষেপে জাতীয় রাষ্ট্রের শক্তির উপাদনসমূহ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

লারকে (Lerche) এবং আব্দুল সঈদ (Abdul Said) জাতীয় শক্তির উপাদানগুলিকে tangible and intangible অর্থাৎ প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) এবং অপ্রত্যক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। মরগেনথাও উপাদানগুলিকে Stable এবং পরিবর্তনশীল বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা Tangible উপাদানের মধ্যে ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্যশস্য, জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদন, শিল্প ও কারিগরিকে লিপিবদ্ধ করতে পারি। বস্তুতপক্ষে পামার ও পারকিন্‌স্ কিন্তু এগুলিকেই Tangible বা বাস্তব উপাদান বলেছেন। তাঁরা মতাদর্শ, জাতির মানসিক বল, এবং নেতৃত্বকে অবাস্তব উপাদানরূপে গণ্য করেছেন। তিনি সামরিক শক্তি এবং কূটনীতিকেও জাতীয় শক্তির উপাদানরূপে গণ্য করেছেন।

কুলোমবিস এবং উল্‌ফ আবার জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পগত ক্ষমতা, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন, সামরিক শক্তি প্রভৃতিকে বাস্তব উপাদান রূপে মনে করেছেন এবং নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব, সরকারের রূপ, বৈদেশিক সমর্থন এবং নির্ভরশীলতাকে অবাস্তব উপাদান রূপে গণ্য করেছেন। শ্লেচার আবার ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা এবং এর গুণগত মান, শিল্প উৎপাদনের ক্ষমতা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামরিক শক্তি, জনগণের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপাদানরূপে গণ্য করেছেন। মরগেনথাও আবার ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পগত ক্ষমতা, সামরিক প্রস্তুতি, কারিগরি দক্ষতা, নেতৃত্ব, সামরিক বাহিনীর আয়তন এবং গুণগত মান, জনসংখ্যা, জাতীয় চরিত্র, জাতির মানসিক বল, সমাজ এবং সরকারের প্রকৃতি, কূটনীতি, জনগণের সমর্থন প্রভৃতিকে জাতীয় শক্তির উপাদানরূপে গণ্য করেছেন। ফ্রাঙ্কেলও জনসংখ্যা, ভূগোল, অর্থনীতি, সরকার, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক উপাদান এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে এর সামরিক গুরুত্ব — এগুলির উপর জোর দিয়েছেন। উপরে যে সমস্ত উপাদানগুলিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে কোন কোন উপাদানকে পরিমাপ করা যায় যদিও সম্পূর্ণরূপে এর পরিমাপ নেওয়া সম্ভব নয়। শ্লেচারের মতে ভৌগোলিক দিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে জনসংখ্যার গুণগত মান থেকে বেশি করে পরিমাপ করা যায়। আবার পামার এবং পারকিনসের মতে ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা এবং কারিগরি বিদ্যাকে কিছুটা পরিমাপ করা যায়। তাহলে আমরা দেখছি যে বাইরের উপাদানগুলিকে মোটামুটি পরিমাপ করা যায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি যেমন, মনস্তাত্ত্বিক, নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব, বৈদেশিক সমর্থন, এবং নির্ভরশীলতা, মতাদর্শ, মানসিক বল, জাতীয় চরিত্র, সরকারের প্রকৃতি, কূটনীতি, জনগণের সমর্থন — এগুলিকে পরিমাপ করা খুবই কঠিন।

আমরা সংক্ষেপে এই উপাদানগুলিকে আলোচনা করতে পারি।

(ক) **জনসংখ্যা** ঃ জনসংখ্যার কথায় আমরা আসি। জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে একটা জাতির শক্তির উৎস। তবে সবসময় এ কথা ঠিক নয়। তাহলে চীন এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীতে শক্তিশালী দেশ হিসাবে গণ্য হ'ত। আমাদের জনসংখ্যার গুণগত মানের দিকে তাকাতে হবে। যদি জনসংখ্যা দেশের সম্পদ এবং খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় খুব বেশি হয় তবে সেই জনসংখ্যার অধিকাংশই হবে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিত। এই জনসংখ্যা জাতির শক্তির উৎস না হয়ে হবে একটা বিরাট বোঝা। ইজরাইল, আমেরিকা, এক সময়ের ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড কম জনসংখ্যা নিয়েও পৃথিবীতে বড় শক্তি রূপে গণ্য হয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যেখানে জনসংখ্যা প্রচুর তারা বিশ্বশক্তি রূপে গণ্য নয়।

(খ) **ভূগোল** ঃ ভূগোলের সঙ্গে আসছে কোন দেশের অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু ভৌগোলিক অবস্থান একটা জাতির শক্তির উৎস। নেপোলিয়ন একসময় বলেছিলেন "একটা দেশের বৈদেশিক নীতি সেই দেশের ভূগোলের দ্বারা নির্ধারিত হয়।" ইংল্যান্ডের অবস্থান তাকে একটা বড় সামুদ্রিক শক্তিতে

পরিণত করেছেন। জাপানের ক্ষেত্রেও এক কথা প্রযোজ্য। কিন্তু জার্মানির অবস্থান তাকে স্থলশক্তিতে পরিণত করেছে। বিসমার্ক তাই একদা মন্তব্য করেছিলেন যে ইংল্যান্ড হ'ল জলের মুষিক (Sea Rat) এবং জার্মানি হ'লে ডাঙার মুষিক (Land Rat) একটা দেশের জলবায়ু নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর এবং জলবায়ু নিঃসন্দেহে একটা জাতির স্বাস্থ্য, কাজ করার ক্ষমতা-এ সব কিছুকে প্রভাবিত করে।

আবার কোন দেশের আয়তন সেই দেশের ক্ষমতার উৎস। যেমন চীন, পূর্বের রাশিয়া, আমেরিকা। এদের আক্রমণ করে পরাজিত করা খুবই কঠিন। কিন্তু বর্তমানে biological warfare, chemical warfare, আণবিক যুদ্ধ বা ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে এই-তত্ত্ব আর খাটে না। ম্যাকিনজারের geopolitics অর্থাৎ ভূগোলের ধারা দ্বারা রাজনীতির নির্ধারিত হওয়ার তত্ত্ব এখনকার যুগে অচল। কোন অঞ্চলই এখন দুর্ভেদ্য নয়।

(গ) **প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আমরা খাদ্যশস্য, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, পেট্রোল, কয়লা, লোহা, বা অন্যান্য খনিজাত দ্রব্যের উল্লেখ করতে পারি। তবে আমরা মনে রাখব খনিজাত দ্রব্য থাকলেই হবে না তাকে কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্য দরকার।

(ঘ) **শিল্প, বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যা ঃ** দেশের শিল্পের বিকাশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি। এই অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে জনগণের জীবনযাত্রার মান এবং শক্তি। বর্তমান বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং শিল্পে উন্নত। রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণই হ'ল এর শিল্পের উন্নতির শ্লথগতি। আমেরিকার তুলনায় রাশিয়া শিল্পে তত উন্নতি করতে পারেনি।

(ঙ) **সরকারের প্রকৃতি ঃ** সাধারণত গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি অন্যান্য সরকারের চেয়ে বেশি হবে। এটা ঠিক যে স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে পারে — তবুও পরিশেষে গণতান্ত্রিক সরকারের পিছনে জনসমর্থন বেশিই থাকে এবং নিঃসন্দেহ গণতান্ত্রিক সরকার অন্যান্য সরকারের চেয়ে শক্তিশালী। বলা হয় যে একটা দাসের চেয়ে একজন স্বাধীন লোক ভালভাবে যুদ্ধ করবে। যে সরকার যত ভালভাবে শাসিত হবে, যে সরকারের পিছনে যত বেশি জনসমর্থন থাকবে, সেই সরকার তত বেশি মজবুত বা স্থিতিশীল (stable) হবে এবং তত বেশি শক্তিশালী হবে। অবার অনেক সময় সরকারের পরিবর্তন শক্তির পরিবর্তন ঘটায়। যেমন হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে চীন শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে দেখা দেয়।

(চ) **সামরিক ঃ** এছাড়া সামরিক বাহিনীর আয়তন, তাদের দক্ষতা, সামরিক নেতৃত্ব এবং প্রস্তুতি রাজনৈতিক নেতৃত্ব — যেমন লিঙ্কন, চার্চিল, হিটলার, স্টালিন, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখের নেতৃত্ব, দক্ষ কূটনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতিবিদগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মরগেনথাও সমস্ত

উপাদানের মধ্যে কূটনীতির গুণগত মানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কূটনীতিই জাতীয় সমস্ত উপাদানগুলিকে একত্রিত করে একসূত্রে সংঘবদ্ধ করে পরিচালনা করে। কূটনীতিকে তিনি জাতীয় শক্তির মস্তিষ্ক বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধির সাহায্যে লোককথার শশক মহাপরাক্রমশালী সিংহকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, কূটনীতির সাহায্যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বৃহৎ রাষ্ট্রকে পরাভূত করতে পারে। আমরা ইতিহাসে তালিরাঁদ (Talleyrand) বা বিসমার্কের (Bismark) এর নাম দক্ষ কূটনীতিবিদ রূপে পাই। এদের কূট চাল এবং বুদ্ধির জন্যই ফ্রান্স এবং জার্মানি শক্তিশালী দেশ রূপে গণ্য হয়।

এছাড়া জাতির মানসিক বল, জাতীয় চরিত্রও কোন রাষ্ট্রের শক্তিকে প্রভাবিত করে। জার্মানি এবং জাপান জাতির আত্মবিশ্বাস, ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র বা ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার মানসিক বল বা আত্মবিশ্বাস তাদের শক্তিকে প্রভাবিত করে। ইংরেজদের আত্মবিশ্বাসের ফলে অনেক যুদ্ধে প্রথমে পরাজিত হয়ে পরে তারাই জয়লাভ করেছে।

৩.৫ জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ

এবার আমরা জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করি। খুবই স্বাভাবিক যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন রাষ্ট্র অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা, অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য কোন রাষ্ট্র নিছক গায়ের জোরে অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহারে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট করতে না পারে এজন্য আন্তর্জাতিক সমাজ অতি প্রাচীনকাল থেকেই কতগুলি পদ্ধতি গড়ে তুলেছে। যুগের এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির সংখ্যা বেড়েছে।

৩.৫.১ শক্তির ভারসাম্য

প্রথমেই আমাদের নাম করতে হয় balance of power বা শক্তিসাম্যের।

(১) শক্তিসাম্যের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন অর্থে এই কথাটিকে ব্যবহার করা হয়। এদিকে তাকিয়েই একজন লেখক মন্তব্য করেছেন "The trouble with the balance of power is not that it has no meaning, but that it has too many meanings." অর্থাৎ এর যে কোন মানে নেই তা নয়, মুশকিল এর অনেকগুলি অর্থ আছে। সহজ কথায় আমরা বলতে পারি যে balance of power বলতে আমরা বুঝি equilibrium বা ভারসাম্য। এই ভারসাম্য হ'ল শক্তির। এই equilibrium বা ভারসাম্য কথাটি বিভিন্ন শাস্ত্রেই ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হ'ল stability বা স্থায়িত্ব রক্ষা করা। পামার এবং পারকিন্‌স বলেছেন যে ভারসাম্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন একটা

তুলাদণ্ডের দুই দিক ওজনে সমান হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যখন কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী বেশি শক্তিশালী হয়ে অন্যদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করে তখনই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে — তখনই ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। জর্জ সোয়াৎর্সেনবার্গারও একে ভারসাম্য বা "a certain amount of stability in international relations." বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক Fay বলেছেন যে, balance of power বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য যার ফলে একজন খুব শক্তিশালী হয়ে অন্যের উপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে না পারে। মরগেনথাও মন্তব্য করেছেন যে balance of power বলতে আমরা বুঝি "distribution of power among nations with approximate equality."

Balance of power বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে রক্ষা করা যায়। এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে মরগেনথাও বা পামার ও পারকিনস প্রায় এক মত পোষণ করেন। প্রথমত, ভেদ ও দণ্ডনীতি (Divide and Rule) অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করা এবং শাসন করা। এর সাহায্যে কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হতে দেয় না। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ফ্রান্স জার্মানিতে এই নীতি গ্রহণ করেছে। ফ্রান্স জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দিয়েছে কিংবা এর বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করেছেন। ইংরেজরাও তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করেছে এই নীতির সাহায্যে।

দ্বিতীয়ত, Compensation বা ক্ষতিপূরণের সাহায্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। বিভিন্ন সন্ধি বা চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নেওয়া হয়। যেমন Poland-কে ভাগ করে নেওয়া, বা 1713 খ্রিস্টাব্দের ইউট্রেখ্‌টের চুক্তি (Treaty of Utrecht) এর মাধ্যমে হ্যাবসবার্গ (Hapsburg) এবং বুরবোঁ (Bourbons) দের মধ্যে স্পেনের অঞ্চলগুলি ভাগ করে নেওয়া।

তৃতীয়ত, মরগেনথাও এবং পামার, পারকিনস মনে করেন যে, অস্ত্রশস্ত্র কমানোর মাধ্যমে balance of power রক্ষা করা যায়। তবে কাজটি খুব সহজ নয় কেননা কোন রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রকে এব্যাপারে বিশ্বাস করে না। তবে ১৯২২ সালের Washington Naval Treaty এ বিষয়ে কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। এর ফলে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালী নৌ-অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্থত, আবার জোট গঠনের মাধ্যমেও balance of power রক্ষা করা যায়। এই জোট গঠন খুবই প্রাচীন ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও আমরা দেখি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র জোট গঠনের মাধ্যমে শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দমন করে শক্তিসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। যখন কোন রাষ্ট্র অন্যের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র মিলে জোটবদ্ধ হয়ে ঐ রাষ্ট্রের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করে। ঐ রাষ্ট্রটি তখন আবার অন্য রাষ্ট্র নিয়ে জোট তৈরি করে। এইভাবে জোটের মাধ্যমে শক্তিসাম্য রক্ষা করা হয়। এই নীতি পামার এবং পারকিনসের মতে খুবই প্রচলিত এবং মরগেনথাও এর মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীতে আমরা ইয়োরোপের ইতিহাসে ত্রয়ী জোট (Triple

alliance) এবং এর বিপরীতে ত্রয়ী মিত্রতা (Triple Entente) এর গড়ে ওঠার কথা জানি। পামার এবং পারকিনস্ এই জোটকে Offensive বা আক্রমণাত্মক বা defensive বা রক্ষণাত্মক—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। আক্রমণাত্মক জোটের লক্ষ্য হ'ল শক্তির ভারসাম্যকে পরিবর্তন করে নিজেদের দিকে আনা আর রক্ষণাত্মক জোটের লক্ষ্য হ'ল ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনা।

জোট গঠনের পূর্বশর্ত হোল common interest বা সাধারণ স্বার্থ। এদের মধ্যে মতাদর্শগত ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য পার্থক্য থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে অক্ষশক্তি এবং মিত্রশক্তি গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে মতাদর্শগত কোন মিল ছিল না। একটাই উদ্দেশ্য ছিল এদের, তা হ'ল ফ্যাসিবাদকে বা জার্মানি, জাপান এবং ইতালিকে রুখে তাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করা।

পঞ্চমত, মধ্যবর্তী রাজ্য (Buffer state) সৃষ্টি। এধরনের রাজ্য গঠনের মাধ্যমেও শক্তিসাম্য রক্ষা করা যায়। দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করে এই শক্তিসাম্য রক্ষা করা হয়। এইভাবে অতীতে চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বত, ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে আফগানিস্থান, রাশিয়া এবং জার্মানির মধ্যে পোল্যান্ড এবং বেলজিয়াম ও জার্মানির মধ্যে সুইজারল্যান্ড সংঘর্ষ নিবারণে দুরত্ব রক্ষার কাজ করেছে।

ষষ্ঠত, হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধ (intervention and war) শক্তিসাম্য রক্ষা করার শেষ অস্ত্র। তবে আমরা মনে রাখব যে, হস্তক্ষেপ করা সেই সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষেই করা সম্ভব যারা শক্তিশালী। অতীতে রাশিয়া, ইংল্যান্ড বা আমেরিকা হস্তক্ষেপ (intervention) করে শক্তিসাম্যকে তাদের পক্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বা একে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োগ করেছে। আমেরিকা এখন বহু দেশেই হস্তক্ষেপ করে শক্তিসাম্যকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করছে। শ্লেচার মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষমতার সম্পর্ককে পরিবর্তন করে একটা imbalance বা ভারসাম্যহীনতা তৈরি করা হয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। কথাটা খুব অযৌক্তিক বা অবাস্তব নয়। সাম্প্রতিক কালে কুয়েতে ইরাকী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা প্রবল অযৌক্তিক বা অবাস্তব নয়। সাম্প্রতিক কালে কুয়েতে ইরাকী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা প্রবল সামরিক হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-৯১)। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা কিউবা, লেবানন, লাওসে হস্তক্ষেপ করে। রাশিয়া হাঙ্গেরির (১৯৫৬) অভ্যুত্থানে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় (১৯৬৮) হস্তক্ষেপ করে। আমরা আগেই বলেছি হস্তক্ষেপের ফলেই ঐ সমস্ত দেশে হয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে নয় স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ পবিবর্তন ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধের মাধ্যমেও শক্তিসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। যেমন হয়েছিল ভিয়েতনাম (১৯৫৪-৭৫) মার্কিন সামরিক তৎপরতার ফলে।

৩.৫.২ যৌথ নিরাপত্তা

Collective Security বা যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমেও জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর অর্থ

হ'ল, যখন কোন রাষ্ট্র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তখন সমস্ত রাষ্ট্র একসঙ্গে একে দমন করার চেষ্টা করে। League এবং U.N.O তে Collective Security ব্যবস্থা ছিল। তবে এর সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রকৃতির উপর এবং কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তার উপর।

৩.৫.৩ আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও বিশ্বজনমত

মরগেনথাওর মতে আন্তর্জাতিক নৈতিকতা এবং বিশ্বজনমতও শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী রূপে কাজ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক নিয়ম তৈরি করা মুশকিল। রাষ্ট্রগুলি সব সময়ই তাদের জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা করতে গিয়ে তারা ন্যায়নীতি, অন্যায়, মূল্যবোধ, আদর্শ এসব কিছুই বিসর্জন দেয়। আবার এই সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতাদেরও কোন সঠিক এবং স্থির নীতি নেই। আজ কোনো রাষ্ট্র যে কাজের জন্য অন্যের নিন্দা করছে পরে সেই রাষ্ট্রই নিজে ঠিক সেই অন্যায় কাজটি করছে, স্রেফ নিজের স্বার্থের জন্যে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যখন হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুরে হত্যা করে তখন এটা ছিল আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা রাশিয়ার কাছে নিন্দনীয় কিন্তু এই আমেরিকাই আবার নাগাসাকি এবং হিরোসিমাতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষদের বিকলাঙ্গ করেছে। তখন তো নিরপরাধ অসামরিক লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এখনও তারা এর অভিশাপ বহন করে চলেছে। সোভিয়েত দেশেও শাসন নেতৃত্বের হুকুমে শুধু 'কুলাক' (ভূম্যধিকারী) নয়, রাজনৈতিক প্রতিবাদীকে নির্যাতন অথবা নিধন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এজন্যই কোন সুষ্ঠু নীতিবোধ গড়ে ওঠেনি। তবে বর্তমানে পারস্পরিক সহযোগিতা, শান্তি, ন্যায়, অন্যায়, অবিচার, অন্যায়ভাবে অন্য রাষ্ট্রের জনগণকে হত্যা করা বা অন্য রাষ্ট্রের উপর বর্বর আক্রমণ এসমস্ত বিষয়কে অনৈতিক বলে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর বড় কারণ হ'ল যে মানুষ এখন শান্তি চায়—দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সমস্ত দেশেরই কম বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি বন্ধ হয়েছে। আবার বিজ্ঞান এবং কারিগরির উন্নতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি কারণে এক অঞ্চলের খবর অন্য অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে বিশ্বজনমত জাগ্রত হচ্ছে। এই বিশ্বজনমত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যখন Gulf-War চলছিল তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্বজনমত এর বিরুদ্ধে যায়। আবার ভিয়েতনাম বা বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ও বিশ্বজনমত বিরুদ্ধে যায়।

৩.৫.৪ আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইন বা International Law কিন্তু সত্যিই আন্তর্জাতিক আইন বা প্রকৃত অর্থে

জাতীয় (Municipal বা Domestic) আইনের মত আইন কিনা এবং এটা রাষ্ট্রীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আন্তর্জাতিক তাকেই বলা হয় যা সভ্য রাষ্ট্রগুলি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মেনে নেয়। ওপেনহাইম বলেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা দরকার। হল (Hall), লরেন্স (Lawrence) প্রমুখ লেখকগণও এই মত পোষণ করেন। যদি আমরা ওপেনহাইমের কথা মেনে নিই তা হলে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যি আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের ওপর বলবৎ হওয়ার মত আইন কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। হল্যান্ড একে আইন বলে গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে "It is the vanishing point of Jurisprudence." অস্টিন এর মতবাদের সমর্থকরা বলেছেন যে আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু নেই আসলে এটি আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি আন্তর্জাতিক আইন এখনও রাষ্ট্রের সাধু ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। একে জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হলে দরকার "আন্তর্জাতিক সরকার" — কিন্তু World Government দূর অস্ত। আমরা অহরহ দেখছি যে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হচ্ছে এবং রাষ্ট্রগুলি নীরব দর্শকরূপে কাজ করছে। এখানে যার জোর আছে U.N. তার বিরুদ্ধে কোনো action নিতে পারছে না কিন্তু যার শক্তি কম যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, U.N. সেখানেই তাকে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অজুহাতে দোষী সাব্যস্ত করছে।

৩.৬ অনুশীলনী

1. জাতীয় শক্তি বলে? এর দুটো উপাদান নিয়ে আলোচনা করুন।
2. জাতীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।
3. *Geopolitik* কি? এটি কার মতবাদ।
4. কে বলেছিলেন যে একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভূগোলের দ্বারা নির্ধারিত হয়।
5. জাতীয় শক্তির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
6. জাতীয় শক্তির তিনটি উপাদানের নাম করুন।
7. জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে শক্তিসাম্যের আলোচনা করুন।
8. শক্তিসাম্য কাকে বলে?
9. জাতীয় শক্তির নির্ধারক রূপে জনসংখ্যা সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখুন।
10. নিরস্ত্রীকরণ কি সম্ভব? কেন?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Morgenthau, *Politics among Nations*, 1st Indian reprint, N.D., 1985.
2. Palmer & Perkins, *International Politis*, A.I.T.B.S., New Delhi, 1997.
3. Schleicher, *International Politics*, Prentice-Hall, India, 1963.
4. Couloumbiss & Wolfe, *International Politics*, Prentice-Hall, N.D., 1981.
5. P. Chanda, *International Politics*, Vikas Publishing House, Reprint, 1982.

একক ৪ □ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও নয়া উপনিবেশবাদ

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

৪.২.১ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা ও বিশ্লেষণ

৪.২.২ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে হবসনের বক্তব্য

৪.৩ ঔপনিবেশিকতার উদ্ভব

৪.৩.১ ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ

৪.৩.২ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন

৪.৪ নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব

৪.৪.১ নয়া উপনিবেশবাদের প্রকৃতি

৪.৪.২ শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন :

- সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে ও তার স্বরূপ
- সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিন ও হবসনের বক্তব্য
- ঔপনিবেশিকতার উদ্ভব, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনের প্রকৃতি
- নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব কিভাবে হ'ল এবং তার প্রকৃতি।

৪.১ প্রস্তাবনা

সাম্রাজ্যবাদ কথাটি খুব একটা নতুন নয়। প্রাচীনকালেও সাম্রাজ্যবাদ ছিল তবে তার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তিশালী শাসকের ক্ষমতালিপ্সা,

ধর্ম, ব্যক্তিগত কারণ বা দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল প্রাচীন সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণ। আমরা রোমান, গ্রীক, অ্যাসিরীয়, পারস্য বা মিশরের সাম্রাজ্যের কথা জানি। কিন্তু এগুলির পিছনে তেমন কোনও জোরালো বা স্থায়ী অর্থনৈতিক বাধ্যতা ছিল না। ক্ষমতার লিপ্সা এবং অন্যকে পদানত করার আনন্দই এখানে মুখ্য চালিকাশক্তিরূপে কাজ করেছিল।

ঔপনিবেশিকতা কথাটি খুবই প্রাচীন। প্রাচীনকালেও ঔপনিবেশিকতা ছিল তবে অন্যরূপে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের মধ্যেও এই মানসিকতা ছিল। রোম এবং ভারতের কথা আমরা ভালো করেই জানি। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। ঐ সমস্ত দেশের রাজারা এদের প্রতি শুধু আনুগত্য প্রকাশ করতেন। অনেক সময় ধর্মবিস্তার করার জন্যও এঁরা আধিপত্য বিস্তার করতেন। অর্থনৈতিক কারণ অবশ্যই ছিল। তবে এটা ছিল দু'টো দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন বা পারস্পরিক ব্যবসাবাণিজ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতার প্রকৃতির বদল হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অতীতের মতো উপনিবেশ শাসন করা আর সম্ভব নয়। প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশলের উন্নতি পুরনো পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়েছে। বর্তমানে নতুন কৌশল এবং পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখাই হ'ল নয়া উপনিবেশবাদের লক্ষ্য।

৪.২ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা অনেকে অনেকভাবে দিয়েছেন। মরগেনথাওর মতে "It is a policy that aims at the overthrow of status quo, at reversal of the power relations between two or more states."[1] অর্থাৎ সহজ কথায় মরগেনথাও বলেছেন রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অন্য রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে স্থিতাবস্থার পরিবর্তনকেই সাম্রাজ্যবাদ বলে। মরগেনথাও স্পষ্টতই অর্থনৈতিক উপাদানের উপর জোর দেননি। এক রাজ্যের উপর অন্য রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাকেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দিতে পারি। আবার অনেক লেখক মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদ হ'ল একটা রীতি যার মাধ্যমে কোন দেশ অপর কোন দেশের উপর নিজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আবার অনেকে মনে করেন "It is a policy which aims at creating organising and maintaining an empire."[2] অর্থাৎ এর মাধ্যমে সাম্রাজ্য তৈরি করা হয়, সংগঠিত করা হয় এবং রক্ষা করা হয়। এর সাহায্যে অন্য রাষ্ট্রকে জোর করে পদানত করে তাকে অধীনস্থ ভূখণ্ডে পরিণত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং ভাষাভাষীর লোকসহ এক বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্র। যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বড় ছিল যে প্রবাদ ছিল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি সবাই কিন্তু এক কেন্দ্রীভূত শক্তি অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা এক সূত্রে বাঁধা ছিল। ইংল্যান্ডের "King-in-Parliament"-ই

এগুলি সম্পর্কে শেষ কথা বা সিদ্ধান্ত নিতে পারত। তবে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা বুঝি প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক কারণে অন্য রাষ্ট্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টা। শিল্প-বিপ্লবের পরেই আমরা আধুনিক অর্থে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পাই। শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হয়। এই দ্রব্য সামগ্রী স্বদেশের বাজারে বিক্রি করা পুঁজিপতিদের সম্ভব হয় না কারণ পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কেবলমাত্র কোনো রকমে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য মজুরী দেয় তাদের যে সামান্য মজুরী দেয় তা দিয়ে ঐ সমস্ত ভোগ্যপণ্য কেনা সম্ভব হয় না। তাই পুঁজিপতিরা বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন অনুভব করে। আবার তাদের ক্রমবর্ধমান দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার জন্য তাদের প্রয়োজন হ'ল সস্তা কাঁচামাল। এজন্য পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম দিকে সৃষ্ট হয় ঔপনিবেশিকতাবাদ যা পরে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। প্রথমদিকে উপনিবেশগুলি বাজার এবং সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করতো। পরে এগুলিই পাকাপোক্তরূপে সাম্রাজ্যের এবং কায়েমী শোষণের দেশে রূপান্তরিত হ'ল।

৪.২.১ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা ও বিশ্লেষণ

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিলেও তিনি একে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ হ'ল "The Highest Stage of Capitalism." অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ হ'ল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। লেনিন এই স্তরকে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন।

লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয় তখনই Monopoly capitalism বা একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাব ঘটে। পুঁজিবাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায় যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাস করে। যার ফলে সৃষ্ট হয় কতকগুলি আন্তর্জাতিক trust এবং cartel। অর্থাৎ লেনিন বলতে চেয়েছেন যে যখন পুঁজিবাদ আরও উন্নতি লাভ করে তখন শিল্পগুলি আরও বড় হয় এবং এগুলি বিভিন্ন সংঘ এবং সংস্থায় পরিণত হয়ে একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদন করে। লেনিন বলেছেন যে, এই স্তরেই পুঁজিবাদকে বাঁচার জন্য সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। লেনিনের বক্তব্যকে আমরা আরও বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে পারি যে পুঁজিবাদ বিকাসের সর্বোচ্চ স্তরে একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যাংকের পুঁজি — উভয়ের মিলন হয় এই পর্যায়ে এবং সৃষ্টি হয় finance capital বা মহাজনী পুঁজি। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদের বড় কথা হ'ল পুঁজির কেন্দ্রীভবন কয়েকটি বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাতে।

দ্বিতীয়ত, এই স্তরেই একচেটিয়া শিল্প পুঁজি এবং ব্যাংক পুঁজির মিলন হয়ে মহাজনী পুঁজির সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিদেশে পুঁজির রপ্তানি। এই পুঁজি রপ্তানির ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিদেশের উৎপাদনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, শিল্পবাণিজ্যকে নষ্ট করে তার আর্থিক অগ্রগতি স্তব্ধ করে।

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যৌথ সংস্থা তৈরি করে পৃথিবীর বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু এই ভাগ বা ফয়সালা দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারণ পুঁজিবাদকে বাঁচতে হলে তাকে আরও সম্প্রসারিত হতে হবে। ফলে বাজার, কাঁচামাল, এবং পুঁজির রপ্তানির জন্য অর্থাৎ নিজের বাঁচার জন্যই পুঁজিবাদকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এইভাবে এই যুদ্ধই পুঁজিবাদের ধ্বংস নিয়ে আসে। এই জন্যই লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে "moribund capitalism" বা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। পুঁজিবাদ নিজেই নিজের মৃত্যু নিয়ে আসে।

৪.২.২ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে হবসনের বক্তব্য

মার্ক্স এবং লেনিনের ব্যাখ্যা ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদের আরও একটি ব্যাখ্যা হবসন দিয়েছেন। একে আমরা সাম্রাজ্যবাদের উদারনৈতিক ব্যাখ্যারূপে অভিহিত করতে পারি। হবসনের মতে, দেশে যখন চাহিদার চেয়ে ভোগ্যবস্তুর যোগান বেশি হয়ে যায় তখন সেই উদ্বৃত্ত ভোগ্যবস্তু পুঁজিপতিরা নষ্ট করতে পারেনা নিজেদের স্বার্থেই। তখনই পুঁজিপতিরা ঐ সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিক্রির জন্য দেশের বাইরের বাজার খোঁজার চেষ্টা করে। এ থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। এই যোগান এবং চাহিদার মধ্যে কেন সামঞ্জস্য থাকছে না, কেন যোগান চাহিদার চাইতে বেশি হচ্ছে তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হবসন দিতে পারেননি। তবে তাঁর মতে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যেই এর সমাধান লুকিয়ে আছে। উদারনৈতিক মতবাদের সমর্থকদের মতে সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যম্ভাবী নয় যা মার্ক্সবাদীরা মনে করেন। এইখানেই উদারনৈতিক মতবাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের পার্থক্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছে। তবে নতুন কলেবর নিয়ে নতুন রূপ নিয়ে তা আবার দেখা দিয়েছে। একেই আমরা বলি নয়া উপনিবেশিকতাবাদ বা নয়া সাম্রাজ্যবাদ বা globalisation. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরনো সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন কারণে লুপ্ত হয়েছে। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের বহু সৈনিক নিহত হয়। এজন্য ঐ সব দেশের পক্ষে আর সাম্রাজ্য রাখা সম্ভবপর হ'ল না। ঐ সব দেশেও জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় ব্যাপক গণজাগরণের ফল হিসাবে। ঐ সমস্ত দেশে অতি দ্রুত জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়. এর পরিণতি হয় সাম্রাজ্যবাদের অবসানে।

তৃতীয়ত বিভিন্ন উপনিবেশে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসারের ফলে ঐ সমস্ত দেশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি একটা বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠে। আবার নিজের ভাগ্য নিজে

নির্ধারণ করার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জোরদার হয়, ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি এদের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

৪.৩ ঔপনিবেশিকতার উদ্ভব

কিন্তু বর্তমানে Colonialism বা ঔপনিবেশিকতা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই ঔপনিবেশিকতা সাধারণত Renaissance বা নবজাগরণের পরেই দেখা দেয়। Renaissance মানুষকে মধ্যযুগের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং তমসা থেকে মুক্ত করে মানুষের যুক্তি এবং অদম্য শক্তির উপর বিশেষ জোর দেয়। মানুষ অমিত শক্তির অধিকারী এবং তার অসাধ্য কিছু নেই, নবজাগরণ এই কথাই ঘোষণা করে। রেনেসাঁ মানুষকে অজানাকে জানতে নতুনকে জানতে উৎসাহ দেয়। ফলে আরম্ভ হয় নতুন নতুন দেশের সন্ধান বা Geographical Discovery। মানুষ বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশের সন্ধানে। বিখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যকার মার্লো (Marlow) Dr. Faustus এর মধ্যে আমরা Colonialism-এর উল্লেখ পাই। মার্লোকে আমরা নবজাগরণের জাতক (Child of Renaissance) বলতে পারি। ভৌগোলিক আবিষ্কার বা নতুন নতুন দেশের আবিষ্কারের সঙ্গেই আসে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব যার ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয়, এক নতুন শ্রেণীর উদয় হয় যাদের আমরা পুঁজিপতি আখ্যা দিতে পারি। এদের চাপেই বিভিন্ন দেশ থেকে উদীয়মান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত, ঐ সমস্ত দেশকে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার রূপে ব্যবহার করা। এর ফলে ঐ সমস্ত দেশের হস্তনির্মিত শিল্প বা শিশু শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। এইভাবে এরা উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে যেত। ভারতে ইংরেজরা এইভাবেই শোষণ চালাতো। এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কায়েমী করতে হলে দরকার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। তাই ভারতে আমরা দেখি "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে. পোহালে শর্বরী"। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে-র ভাষায় "Economic control leads to political control". ক্রমে ক্রমে উপনিবেশটি যুক্ত হয় সাম্রাজ্যের অংশ রূপে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। দুটোর মধ্যে প্রকৃতিতে নয়, পার্থক্য স্তরভেদের।

৪.৩.১ ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ

শোষণের প্রথম স্তরটি হ'ল ঔপনিবেশিকতা এবং উচ্চতর স্তরটি হ'ল সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম স্তরটি হ'ল ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং উচ্চতর স্তরটি হ'ল সাম্রাজ্যবাদ। সাধারণত Colony বলতে আমরা বুঝি "A movement of nationals from a home country to a territory abroad for permanent settlement in that territory."[1] অর্থাৎ কোনো একটি দেশ থেকে কিছু লোক যখন স্থায়ী বসবাসের জন্য অন্য কোন ভূখণ্ডে যায় তখন ঐ ভূখণ্ডটিকে আমরা colony বা উপনিবেশ

আখ্যা দিতে পারি। সহজ কথায় একে বলা যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে মানবসমাজের স্থানান্তকরণ। Chamber's Dictionary অনুরূপভাবে এর ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কলোনি বলতে বোঝায় ঃ "A body of persons settled in a foreign country." অর্থাৎ কিছু লোকের বিদেশে স্থায়ী বসবাস। ইংরেজরা এই ভাবেই আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। সাদামাটা অর্থে উপনিবেশ বলতে আমরা একেই বুঝি। হবসন তাঁর Imperialism : A study গ্রন্থে বলেছেন যে ঃ "Colonialism is a natural outflow of nationality; its test is the power of colonists to transplant the civilisation they represent to the new national and social environment in which they find themselves."[2] অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে উপনিবেশিকতা হ'ল মানুষের স্বাভাবিক ধারা। ঔপনিবেশিক দেশ কতখানি শক্তির মাধ্যমে তার সভ্যতাকে নতুন জাতীয় এবং সামাজিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার উপরই এর অস্তিত্ব নির্ভর করে। ইংরেজরা একসময় "White Man's burden" এই অজুহাতে অর্থাৎ তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত করার অজুহাতে নতুন নতুন উপনিবেশ শক্তির সাহায্যে দখল করত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত করার অজুহাতে নতুন নতুন উপনিবেশ শক্তির সাহায্যে দখল করত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা একটা চতুর যুক্তিমাত্র। আসল উদ্দেশ্য অন্য কোন দেশ বা জাতিকে পদানত করা। সুতরাং হবসনের সংজ্ঞা যে একপেশে এবং বুর্জোয়া মতবাদ ঘেঁষা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এটি নিঃসন্দেহে প্রক্রিয়াশীল। আমরা একে গ্রহণ করতে পারি না। রাজনৈতিক অর্থে Colonialism বলতে আমরা বুঝি "Parent-offspring" relationship. অর্থাৎ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। পুত্র যেমন পিতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। উইন্‌স্‌লো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, ঔপনিবেশিকতার অর্থ হ'ল অন্য দেশ দখল করা। আমাদের মনে হয় উইন্‌স্‌লোর সংজ্ঞাই অনেকখানি বাস্তব ঘেঁষা। সাধারণত উপনিবেশ বলতে আমরা কিছুটা "Master-Servant relation" বা অন্য কথায় বিজয়ী এবং বিজিতর সম্পর্ক দেখতে পাই। উপনিবেশ বলতে আমরা এমন একটি ভূখণ্ডকে বুঝি যে ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—এক কথায় সামগ্রিক জীবনধারাই দখলধারী দেশের সংখ্যালঘু মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় যারা সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, বিশ্বাস, জীবনধারা প্রভৃতি দিক থেকে বিজিত দেশের মানুষের চাইতে একদম পৃথক।

ঔপনিবেশিকতার পিছনে অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে সাধারণত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার জন্যই উপনিবেশ স্থাপন করা হয় আবার অনেক সময় উদ্বৃত্ত জনগণকে বাইরে পাঠানোর জন্যও রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর রাশিয়া দখলের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জার্মান জাতির বসবাসের জন্য রাশিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করা। বর্তমানকালে অনেক দেশই জনসংখ্যার চাপে বাধ্য হয়েই আগ্রাসী নীতি নিচ্ছে। একে ঠিক ঔপনিবেশিকতা না বলে বলা যায় নিজের আধিপত্য বিস্তার। চীন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তিক্ত সম্পর্কের পিছনে আছে সীমান্ত বিরোধ। আবার ভারত-চীন সম্পর্কের

ফাটলের পিছনেও আছে চীনের আগ্রাসী নীতি। চীন তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নতুন বসতি খুঁজছে। ঔপনিবেশিকতার পিছনে আরও একটি কারণ হ'ল সামরিক। অনেক সময় সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উপর খবরদারি করা সম্ভব। সিঙ্গাপুর, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজরা এই কারণেই উপনিবেশ স্থাপন করে। সিঙ্গাপুর এবং সাইপ্রাসের ভৌগোলিক অবস্থানই তাদের সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব এনে দিয়েছে।

৪.৩.২ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন

ঔপনিবেশিকতাকে আমরা কোনদিক থেকেই সমর্থন করতে পারি না। প্রথমত তা অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক। গণতন্ত্রের বড় কথা পছন্দমত সরকার বেছে নেওয়ার অধিকার এবং মতামতের স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক জাতিগুলি কখনও এই দাবি মেনে নেয়নি। ভারতের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে যদিও এখানে একটি সরকার ছিল কিন্তু সেই সরকারের প্রধান ছিলেন ভাইসরয় বা Governor General। তিনি আবার তাঁর কাজের জন্য দায়ী ছিলেন Secretary of State এর কাছে যিনি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্য ছিলেন। সুতরাং ভারত কিভাবে শাসিত হবে, কোন্ আইনের দ্বারা শাসিত হবে তা ঠিক করত ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট এবং পার্লামেন্ট। ১৯১৯, ১৯৩৫ সালের সমস্ত ভারতশাসন আইনই পার্লামেন্ট পাশ করে। ভাইসরয় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন না। সরকারের উপর ভারতের জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল। জনমত এবং জনরোষকে কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে।

অমানবিক এজন্যই যে, এই ব্যবস্থা বর্ণবিদ্বেষ, দমননীতি সমর্থন করে। উপরন্তু এর ফলে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় যার ফলে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র আরো বেড়ে যায়। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি হ'ল এই যে তা উপনিবেশের ধনসম্পদ লুঠ করে নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে। ভারতে ইংরেজরা এইরূপে "Great Plunder" বা মহা লুণ্ঠনের দ্বারা ভারতের আর্থিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি করে। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে উপনিবেশের শিল্প, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সবই ধ্বংস হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সমস্ত কিছুই করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য।

বর্তমানকালে বিশেষ করে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বিভিন্ন উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি এই সমস্ত ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেয়—অবশ্য স্বেচ্ছায় নয় বাধ্য হয়েই। ভারতে যে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান হয় তার জন্যই ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র সংগ্রামের অবদানই বিশেষ এক ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতই যুদ্ধের পরে প্রথমে স্বাধীন হয়। তার পরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে পাত্তাড়ি গোটায়। এদিক থেকে ভারতই প্রথমে পথ দেখায়

অন্যদেশগুলি পরে ভারতকে অনুসরণ করে। উপনিবেশগুলি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। প্রথমত, এর ফলে এই দেশগুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই তৃতীয় বিশ্ব জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে তাদের প্রভাব সৃষ্টি করছে। এর ফলে পুরনো শক্তিসাম্যের ধারণাটি নষ্ট হয়ে গেছে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে দ্বিমেরুকরণ (bipolarisation)-এর সৃষ্টি হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব তাকেও আঘাত করেছে।

বিশ্বরাজনীতিতে যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি বৃহৎ শক্তি খবরদারি করত, তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যেমন ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও তাদের বিপুল জনসংখ্যা এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে তাদের নীতি এবং পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। এরা নিজেরাই আর এক স্বতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এদের মতামতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বিশ্বরাজনীতিতে। বর্তমানকালে সোভিয়েত রাশিয়া ধ্বংসের পর পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এখন এক একটি ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখন অনেক দেশই আণবিক শক্তির অধিকারী। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই এখন বিশ্বরাজনীতিতে ভালভাবেই প্রভাব বিস্তার করছে।

৪.৪ নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আগেকার পুরনো ঔপনিবেশিকতার অবসান হয়েছে। এর স্থানে দেখা দিয়েছে এক নতুন ধরনের ঔপনিবেশিকতা, এর নামই হ'ল নয়া ঔপনিবেশিকতা। বর্তমানে পৃথিবীতে পুরনো ধাঁচের ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দেশ শাসন বা অর্থনৈতিক শোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সাম্রাজ্য রাখা এখন আর লাভজনক নয় উপরন্তু বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবীর একস্থানের ঘটনা অন্য প্রান্তে অতি সহজে দ্রুত পৌঁছিয়ে যায়। সুতরাং কোন অঞ্চল দখল করে সেখানে শাসন এবং শোষণ চালালে সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব পড়বে। যেহেতু বিশ্বের অধিকাংশ লোকই এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতন্ত্রপ্রেমী তাই পুরনো সাম্রাজ্যবাদকে এরা সহ্য করতে পারছেন না। কিন্তু পুঁজিবাদ তো পৃথিবী থেকে এখনও লুপ্ত হয়নি। তারা চায় এক সুদৃশ্য মোড়কের আড়ালে, নতুন কৌশল এবং পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ এবং শাসন বজায় রাখতে। এদিকে তাকিয়েই মিশরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নাসের মন্তব্য করেছেন যে, নয়া ঔপনিবেশিকতা হ'ল একটা "Veil to dominate the resources of nations and to exhaust them for the benefit of exploiters." অর্থাৎ এটা হ'ল একটা অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা বা আবরণ যার আড়ালে অন্য দেশের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের অর্থাৎ শোষকদের স্বার্থে এর সম্পদ নিঃশেষ করা। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বা ঔপনিবেশিকতা বিদায় নিলেও পিছনের দরজা দিয়ে এর মূল উদ্দেশ্যগুলি নতুন ভাবে আমাদের সামনে তথা সমগ্র বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছে।

৪.৪.১ নয়া উপনিবেশবাদের প্রকৃতি

নয়া উপনিবেশবাদ কিছুই নয়, এটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখার এক সুচতুর কৌশলমাত্র। একে আমরা "Old wine in new bottle" রূপেও আখ্যা দিতে পারি। ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নক্রুমা (Nkruma) যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন তিনি একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, এর নাম ছিল ঃ Neo-colonialism : The last stage of Imperialism. সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে বর্তমান দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিভিন্নভাবে তাদের আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে—যেমন সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, মতাদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক কৌশল, মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশ প্রভৃতির সাহায্যে।

খোলাখুলিভাবে বা অনাবৃতভাবে তাদের শাসন কায়েম না করেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুচুরভাবে এরা এদের শাসন, শোষণ এবং স্বার্থ লোকচক্ষুর আড়ালে বজায় রেখে চলছে। এদের কার্যকলাপ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে হলে দরকার রাজনৈতিক জ্ঞান, সচেতনতা, বিচার এবং বিশ্লেষণ। পামার এবং পারকিনস ব্রায়ান ক্রজিয়ের (Brian Crozier) এর কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে ঃ "The neo-colonialist argument is that the imperialists, though surrendering political power, retain real control by economic, military, or cultural means, or by a combination of all three." অর্থাৎ যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছে তবুও তারা সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা তিনটির সমন্বয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। আমরা আগেই এবিষয়ে আলোকপাত করেছি।

৪.৪.২ শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

এবার আমরা দেখি কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে। প্রথমত, বিভিন্ন দেশে এরা উপগ্রহস্থল সরকার (satellite অথবা puppet government) তৈরি করে সেই সরকারকে এরা নিয়ন্ত্রণ করে। এর কারণ হ'ল এই সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যারা দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল। তারা স্বভাবতই দরিদ্র, এই দারিদ্রই তাদের দরিদ্র হওয়ার কারণ ("A country is poor because it is poor.") এই চরম দারিদ্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই এরা বিভিন্ন ধনী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে ঋণ নেয় কিন্তু এই ঋণের নাগপাশ থেকে এরা মুক্ত হতে পারে না, বছর বছর কয়েখ কোটি টাকা শুধু এদের সুদ হিসাবেই দিতে হয় অনেক দেশ এই সুদ এবং ঋণ শোধ করতে না পেরে নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করছে। ভারতকেও প্রচুর টাকা শুধু সুদ হিসাবেই দিতে হচ্ছে, আসল আর শোধ হচ্ছে না। যেহেতু এরা প্রচুর ঋণ নেয় এজন্যই এদের সরকারও চালিত হয় তাদেরই স্বার্থে। যখনই কোন সরকার এদের স্বার্থবিরোধী নীতি নেয় তখনই তারা এই সরকারকে ফেলে দেয়। পর্দার আড়াল থেকে এরাই সরকারকে বসায় বা

ফেলে দেয়। এই সমস্ত সরকারেরও কিছু করার থাকে না কারণ এরা তো পুরোপুরি বন্ধক (Mortgaged) হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আনবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এই সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিই তাদের অনুকূলে বাজেট তৈরি করে, সরকারের শুল্কনীতি তাদের সপক্ষে তৈরি করতে বলে যাতে তাদের দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানী আরো বাড়ে, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় এদেরই আদেশে যাতে কাঁচামাল বা কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী এরা সস্তায় কিনতে পারে। এভাবে আমরা দেখেছি বিদেশের দ্রব্য আমাদের চড়া দামে কিনতে হচ্ছে অথচ আমাদের দ্রব্য এরা সস্তায় কিনছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি রিক্ত এবং নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে, মূলধন তৈরি হচ্ছে না, ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও ব্যাহত হচ্ছে। এদের পক্ষে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাদীনভাবে দেশ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীনতা ঠিকই আছে তবে তা নামমাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। আবার এই অর্থনৈতিক শোষণ শুধুমাত্র সরকারি স্তরেই সীমিত থাকে না, বেসরকারি ক্ষেত্রেও চলে এই শোষণ। বিভিন্ন বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি (Multinational company) বিদেশে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে এবং এই টাকা চলে যায় বিদেশে—স্বদেশে এর বিনিয়োগ হয় না। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতিও হয় না। এইভাবে লাতিন আমেরিকা আফ্রিকা বা এশিয়া থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করে আগেকার ঔপনিবেশিক দেশগুলি ঋণগ্রহণকারী দেশগুলির সর্বনাশ করে।

দ্বিতীয়ত, নয়া ঔপনিবেশিকতা নানা ধরনের সামরিক জোট গঠন করে অন্য দেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং সামরিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। আমরা NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক জোটের উল্লেখ করতে পারি। এই জোটগুলির লক্ষ্যই হ'ল দমন নীতির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং বামপন্থী আন্দোলনকে ধ্বংস করা। শুধু তাই নয়, সন্নিহিত এলাকায় অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রকে সন্ত্রস্ত করে রাখাও এইসব সামরিক জোটের লক্ষ্য। তৃতীয়ত, নয়া ঔপনিবেশিকতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মতাদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নিজের মতাদর্শ অন্য দেশের জনগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করে। একে আমরা এক ধরনের রাজনৈতিক বশীকরণ (political subordination) বলতে পারি। এজন্য এরা বিভিন্ন দেশে প্রচারকার্য করে। বিভিন্ন দেশে Centre বা Information Service গঠন করে তারা এই কাজ অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পাদন করে। এরা বিভিন্ন দেশের জনগণের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে, যাতে দেশের মধ্যে সুস্থ প্রগতিশীল নীতিবোধ গড়ে উঠতে না পারে। এজন্য এরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। এরা সমস্ত অপসংস্কৃতিকে আমদানি করে দেশের নতুন প্রজন্মের নৈতিক চরিত্র ও মেরদণ্ডকে ভেঙে দেয়। এদের সৎসাহস, স্বাধীন চিন্তা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ—সবকিছুই ধ্বংস করে যাতে এরা কোনদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে। সুস্থ সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতিই বড় হতে পারে না। এরা এর মূলেই কুঠারাঘাত করে। আবার এরা শিক্ষার মাধ্যমে ঐ দেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন দেশে বৃত্তি দিয়ে, শিক্ষার জন্য অর্থ

সাহায্য দিয়ে ঐ সমস্ত দেশের শিক্ষাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে এরা নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের মগজ ধোলাই করার চেষ্টা করে। সাহিত্য, সঙ্গীত, পোষাক পরিচ্ছদ, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমেও এরা সুস্থ প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

চতুর্থত, নয়া ঔপনিবেশিকতার আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এরা বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এবং সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে নিকটস্থ দেশগুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। এসমস্ত ছাড়া নয়া ঔপনিবেশিকতা বিভিন্ন দেশকে দুর্বল করার জন্য সেই সমস্ত দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদত দেয় উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে এদের জন্য প্রচুর অর্থ বা অস্ত্রশস্ত্র গোপনে পাঠায়। অনেকসময় এরা আবার এদের প্রশিক্ষণও দেয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে এর পিছনে আগেকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাত আছে।

ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে উভয়ের মধ্যে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধুমাত্র নামে। নয়া ঔপনিবেশিকতা দক্ষ বাজীকরের মত পরোক্ষভাবে পর্দার আড়ালে থেকে পূর্বের শাসন, শোষণ, আধিপত্য সবই বজায় রাখছে। এইভাবে নয়া ঔপনিবেশিকতা অন্য দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিজস্বতা ধ্বংস করে, উগ্রপন্থীদের মদত দিয়ে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের পরিমণ্ডল তৈরি করে। বর্তমানে যে বিশ্বায়ন বা globalisation চলছে এটাও নয়া উপনিবেশিকতার একটা রূপ। বিশ্বায়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র নামান্তর করে পুরনো অর্থনৈতিক শোষণকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা ব্যাহত হতে বাধা।

৪.৫ অনুশীলনী

1. সাম্রাজ্যবাদের উপর একটা রচনা লিখুন।
2. সাম্রাজ্যবাদের অবসানের দুটি কারণ দেখাও।
3. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়? এর উৎপত্তির কারণগুলি সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।
4. সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিন। আপনি কি একে সমর্থন করেন?
5. সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের মত কি?
6. সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসনের মতবাদ আলোচনা করুন।

7. ঔপনিবেশিকতা কি? এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

8. ঔপনিবেশিকতার উৎপত্তির পিছনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

9. ঔপনিবেশিকতার অবসানের কারণ কি?

10. নয়া ঔপনিবেশিকতা কাকে বলে?

11. Globalisation বলতে আপনি কি বোঝেন?

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Schleicher– *International Politics, Prentice-Hall of India (Pvt) Ltd. New Delhi, 1963.*

2. Buston, J.W.– *International Relations : A General Theory, Cambridge, England, 1965.*

3. Frankel, Joseph– *International Relations in a Changing World. O.U.P, Bombay, 1983.*

4. Palmer & Parkins.– *International Relations, 3rd Revised Edition, A.I.T.B.S, Publications New Delhi, 1997.*

5. Chandra, P– *International Politics, Vikas, New Delhi, 1982.*

6. Lorton Kaplan– *Syustem and Process in Organisational Politics, New York, Wiley, 1957.*

7. John Herr II– *Political Realism and Political Idealism : A Study in Theories & Realities, Chicago University Press, 1951.*

8. Stanley Hoffman (ed).– *Contemporary Theory in International Relations, Engelwood Cliffs. 1960.*

9. Liska, George– *International Equilibrium, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1977.*

10. Crozier, Brian– *Neo-colonialism : A Critical Analysis, Landon, 1964.*

11. Nkrumah, Kwame– *Neo-colonialism : The Last State of Imperialism, New York, International Publishers Co. 1965.*

12. Hans Kohn– *Reflections on Colonialism, University of Pensylvania, 1956.*

13. Hobson, J. A.– *Imperialism, A Study, 3rd ed. London, 1938.*

14. Lenin, V. I.– *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Int. Publishers Co., N. Y. 1933.*

একক ১ □ ঠাণ্ডা লড়াই এবং তার বিবর্তন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

১.২.১ অনুশীলনী

১.২.২ ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

১.২.৩ এশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

১.২.৪ ইন্দোচীনের সংকট

১.২.৫ অনুশীলনী

১.২.৬ ঠাণ্ডা লড়াই ও সমঝোতা

১.২.৭ অনুশীলনী

২.০ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরবর্তী পর্যায়

২.১ অনুশীলনী

২.২ সারাংশ

২.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ □ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানব। এই এককের পাঠ শেষ হলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে, তা জানতে পারবেন।
- মেরুকৃত রাজনীতির কীভাবে বিবর্তন হয়, এবং ক্রমশ তা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছয়, সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।
- বিশ্ব রাজনীতির ওলটপালট কীভাবে এক নতুন আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, তা জানতে পারবেন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছিল, তার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।

- ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তৃতীয় বিশ্বের বর্তমান আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কী প্রকার; তাদের সমস্যাবলীই বা কি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

১.১ ❑ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে ক্ষমতা ও মতাদর্শের সংঘাত বিশ্ব রাজনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তাকেই (cold war) নামে চিহ্নিত করা হয়। যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয়, এ এক অদ্ভুত সংঘাত, যা ইতিপূর্বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়নি। সরাসরি বলপ্রয়োগ ছাড়াও যে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়, ঠাণ্ডা লড়াই হল তারই একটি উদাহরণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে, এসেছে এক নতুন রাজনীতি, যার নাম সমঝোতার রাজনীতি (Detente)। অবশ্য এই সমঝোতার রাজনীতির সূচনা হয়েছিল কিউবার সংকটের (Cuban crisis) ঠিক পরে পরেই, ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে, যখন আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই বুঝেছিল যে সম্মুখ সমরে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামা তাদের কারও পক্ষেই নিরাপদ নয়।

১.২ ❑ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত যে উত্তেজক পরিস্থিতি বিশ্ব রাজনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তাকেই এক কথায় 'ঠাণ্ডা লড়াই' নামে চিহ্নিত করা হয়। মহাশক্তিধর দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত দেশের মধ্যে যুগপৎ ক্ষমতা ও আদর্শের সংঘাতকে বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল এই উত্তেজক পরিস্থিতি। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অপর এক নাম 'স্নায়ু যুদ্ধ' (War of Nerves)। এই সংঘাতের কারণ হিসাবে যে আদর্শের লড়াইয়ের অজুহাত দাঁড় করানো হয়, তা ছিল আসলে নেহাতই এক আবরণমাত্র। এর পিছনে ছিল দুই মহাশক্তিধর দেশের পৃথিবীব্যাপী অপ্রতিরোধ্য প্রভাববিস্তারের এক উদগ্র বাসনা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহ পশ্চিমী শিবির তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে যে মহাজোটে (grand alliance) ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত দেশও সামিল হয়েছিল, সেটি ছিল এক অস্থায়ী ঐক্য। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এর মধ্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় যদি ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকে, বিজয়ী মহাজোটের ছত্রভঙ্গ হওয়ার মধ্যে ছিল এক অনুজ্জ্বল অশুভ ইঙ্গিত। প্রকৃতপক্ষে মহাজোটের জন্মলগ্নেই তার ধ্বংসের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্ব পর্যন্ত জঙ্গি জার্মানিকে নিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলি যে দুমুখো নীতি অনুসরণ করেছিল, যুদ্ধ শেষ হবার পর সেই ষড়যন্ত্র, সেই পারস্পরিক অবিশ্বাসই এক স্থায়ী বৈরিতার জন্ম দেয়।

রাশিয়ার বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই প্রতিবিপ্লব ঘটানোর যে অপচেষ্টা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি করেছিল, তখন থেকেই রাশিয়ার নেতাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে তাদের দেশ পুঁজিবাদী শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং এই নিরাপত্তাহীনতা থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে। যুদ্ধের সময় সাধারণ শত্রুকে ঠেকাতে সকলে যতই ঐক্যবদ্ধ হোক না কেন, যুদ্ধের শেষে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ যে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী আলাদা সন্ধি চুক্তি করবে না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই, এই আশঙ্কা রুশনেতাদের মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। তাছাড়া, যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে যখন সোভিয়েত দেশের তরফ থেকে জার্মানির বিরুদ্ধে একজোট হবার প্রস্তাব বারংবার আসে, তখন ব্রিটেন বা ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া তো আসেই নি, উপরন্তু হিটলারকে তোষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যে কারণে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্ববিরোধ কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে ভাঙন ধরাতে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতা স্তালিন জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান হিটলারের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন।

এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাৎসি শক্তির সম্ভাব্য রাশিয়া অভিমুখী অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখা। এই চুক্তির ফল হিসাবে সোভিয়েত দেশ দ্বারা পোল্যান্ডের একাংশ দখল, ফিনল্যান্ড আক্রমণ, এবং এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এই তিনটি স্বাধীন বাল্টিক রাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি ঘটনাবলীর কারণে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত নেতাদের মতলব নিয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এরপর যখন হিটলারের সর্বগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করতে পশ্চিমী দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হল, তখনও কিন্তু রুশ নেতৃত্বকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। যে কারণে তাদের কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর্থিক সাহায্য কিছুটা পেলেও কোনও সামরিক সাহায্য ঐ সময় পায়নি।

স্তালিনের পরামর্শ সত্ত্বেও পশ্চিম দিক থেকে জার্মানি ও ইতালির উপর কোনও প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যতক্ষণ না সোভিয়েত সেনাবাহিনী হিটলারের ফৌজকে ফেরত যেতে বাধ্য করেছে, সময়টা ছিল ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সাল। যুদ্ধের শেষদিকে হিরোশিমা-নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা ব্যবহার করার পর সারা দুনিয়া জানতে পারল যে, আমেরিকার হাতে চলে এসেছে এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে রাশিয়া 'মহান দেশাত্মবোধক যুদ্ধ' নাম দিয়েছিল। কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদের কথা একবারও বলেনি। পশ্চিমী দেশগুলির যে আশঙ্কা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে অর্থাৎ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে সাম্যবাদ প্রচারের চেষ্টা রাশিয়া করবে, তা কিন্তু অমূলক বলেই প্রতিভাত হল। কমিনটার্ন (Comintern) ছিল কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বান্তকরণে পশ্চিমী দেশগুলিকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছিল। এসব সত্ত্বেও যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। ইয়াল্টা ত্রিশক্তি সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) ঠিক হয় নাৎসিমুক্ত সমস্ত ইউরোপীয় জাতিগুলিকে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু যুদ্ধের আগে পোল্যান্ডকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অডার নীস নদী বরাবর সোভিয়েত সীমানা প্রসারিত হয়। পোল্যান্ডকে নাৎসি কবলমুক্ত করার পর সেখানে একটি পোলিশ কমিটি অব ন্যাশনাল লিবারেশন গড়ে উঠেছিল। এই কমিটিকেই সোভিয়েত সরকার পোল্যান্ডের নতুন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধের সময় তখনকার পোলিশ সরকার বিতাড়িত হয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিল, আমেরিকা ও ব্রিটেন তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন

হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের পর পোল্যান্ডে কম্যুনিস্ট পার্টিই ক্ষমতা দখল করে, এবং এ ব্যাপারে তারা রাশিয়ার লাল ফৌজের পরোক্ষ সাহায্য পায়। লাল ফৌজ তখন পোল্যান্ডে অবস্থান করছিল। পূর্ব ইউপোপের অন্যান্য নাৎসিমুক্ত অঞ্চলেও একই পরিস্থিতির সূচনা হয়। যার জন্য পশ্চিমী দেশগুলি মনে করে যে সোভিয়েত দেশ আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করেছে, তাকে আটকানো দরকার। আমেরিকা কিন্তু প্রথমদিকে এভাবে চিন্তা করেনি। যুদ্ধের পর তার দেশের ভেতর থেকে চাপ আসছিল সমস্ত মার্কিন সৈন্যকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাছাড়া ইউরোপীয় সমস্যাবলীতে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছাও তার ছিল না। যে কারণে আমেরিকা সোভিয়েতের সাথে একটা সম্মানজনক রফা করে যুদ্ধের পরিণতি ঘটাতেই বেশি আগ্রহী ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সোভিয়েতের বিদেশমন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে আলোচনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হতাশ হয়ে পড়েন এবং সোভিয়েতের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায়। ১৯৪৬ সালের শুরুতে তিনি সোভিয়েত ঔদ্ধত্যের জবাব দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা (মিসৌরী, মার্চ, ১৯৪৬) আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়, যেখানে চার্চিল পৃথিবীতে 'দুই শিবিরের' কথা প্রথম উল্লেখ করেন। ইউরোপকে দ্বিখণ্ডিত করে দাঁড়িয়ে আছে এ লৌহ যবনিকা, এর জন্য দায়ী সোভিয়েত দেশ, যার আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে ইঙ্গ-মার্কিন দুই দেশ যৌথ প্রচেষ্টা চালাবে, ঐ বক্তৃতাতে এ কথা বলা হয়। স্তালিন স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন এবং এর সমুচিত জবাব দিতে তৈরি হতে থাকেন। সোভিয়েত নেতৃবন্দ মনে করছিলেন যে পৃথিবীতে যেহেতু তাঁদের দেশই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাঁদের বিপদে পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। হিটলারের পতন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতেই পারে।

এই কারণে আবার শুরু হয় আগেকার সেই অবিশ্বাস আর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক।

ইয়াল্টা সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইউরোপ থেকে সমস্ত আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। সেনা প্রত্যাহারের কাজ হঠাৎ করে থামিয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীব্যাপী নানা রাজনৈতিক ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে। জার্মানির ভবিষ্যৎ কী হবে, বার্লিনের ভাগাভাগি কীভাবে হবে, পারস্য থেকে রুশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা, উত্তর গ্রীসে ব্রিটেনের মদতপুষ্ট রাজতন্ত্র সমর্থক বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় কম্যুনিস্ট গেরিলাবাহিনীর সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটনা পৃথিবীকে ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশ এবং ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

১.২.১ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলী

১। স্নায়ুযুদ্ধ বা War of Nerves বলতে আপনি কী বোঝেন? এটা কি কোনও আদর্শগত সংঘাত ছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। স্তালিন ১৯৩৯ সালে হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন কেন?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর পশ্চিমী দেশগুলি কেন সোভিয়েত দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে?

১.২.২ ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে পটস্‌ডাম সম্মেলনের (জুলাই ১৯৪১) সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠিক হয়েছিল যে, জার্মানির ঐক্য বজায় রাখা হবে, তার ভারী শিল্প ও অস্ত্র কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং নাৎসি সংগঠন ও কার্যকলাপ বেআইনি বলে ঘোষিত হবে। সাময়িকভাবে জার্মানিকে কয়েকটি সামরিক দখলীকৃত এলাকায় ভাগ করা হয়েছিল এবং তাকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি Control Commission বা নিয়ন্ত্রণ অধিকারও স্থাপিত হয়েছিল। সমস্যার সৃষ্টি হয় জার্মানির পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে। পশ্চিম অংশে ইঙ্গ মার্কিন-ফরাসি দখলদারী ছিল, আর পূর্ব অংশে সোভিয়েত দখলদারী। দুই অংশের মধ্যে আর্থিক সংযোগ স্থাপন করা নিয়ে বিবাদ শুরু হল, কারণ জার্মানির ভারী শিল্পগুলি ছিল পশ্চিমাংশে, আর চাষ আবাদ হত পূর্বাংশে। পূর্ব জার্মানিতে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) সোভিয়েত "লাল ফৌজে'র সমর্থনের জোরে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করল, পশ্চিম জার্মানিতে পুঁজিবাদী এক গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে দেওয়ার চেষ্টা হল। এভাবেই ১৯৪৭ সালের মধ্যেই জার্মানির রাজনৈতিক ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। জন্ম হয় দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই মিলিটারী শিবিরের জন্য যে সীমানা ঠিক করা হয়েছিল, সেটিই হয়ে দাঁড়াল, দুই রাষ্ট্রের ভিতরকার স্থায়ী রাজনৈতিক বিভেদ রেখা।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম বড় ঘটনা বার্লিন শহরকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধ পূর্ব জার্মানির রাজধানী বার্লিনকেও সোভিয়েত ও ইঙ্গ-আমেরিকান এলাকাভিত্তিক দুটি অঞ্চলে ভাগ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে বার্লিন শহর ছিল কম্যুনিস্ট-শাসিত পূর্ব জার্মান অংশের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরই সুযোগ নিয়ে রুশ কর্তৃপক্ষ বার্লিনে ইঙ্গ-মার্কিনের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এই ভাবে তাঁরা পশ্চিম বার্লিন থেকে ইঙ্গ মার্কিন সৈন্যদলকে হঠে যেতে বাধ্য করবেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গও বিমানের সাহায্যে নিয়মিত তাঁদের সেনাদের এবং পশ্চিম বার্লিনের জনগণকে খাদ্য ও অস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করে যেতে লাগলেন। অগত্যা রুশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি নাগাদ বার্লিন অবরোধ তুলে নেন। কিন্তু এই উত্তেজক ঘটনাবলী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একটা মহড়া হিসাবে ধরা যেতে পারে।

ইউরোপের রাজনৈতিক দ্বিখণ্ডীকরণও এই সময় থেকেই স্থায়িত্ব লাভ করে।

১.২.৩ এশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

১৯৪৯ সালে চীনে মাও জে-দঙের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সাফল্যে পশ্চিমী দেশগুলি উদ্বিগ্ন বোধ করে। বিপ্লবী সরকারকে তারা স্বীকৃতি দেয় না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘে (United Nations) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করে। চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত এবং ফরমোজা দ্বীপে (বর্তমানে তাইওয়ান) স্থাপিত চিয়াং কাইশেকের সরকারকেই তারা চীন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি

দেয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে একটি স্থায়ী সদস্যপদ প্রদান করে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ভীত হয়েছিল এই ভেবে যে হয়ত অচিরেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে, কারণ রাশিয়ার পরে চীনই হল আরেকটি অতিবৃহৎ সাম্যবাদী দেশ। সে নিশ্চয়ই চেষ্টা চালাবে সাম্যবাদ ছড়াতে, অন্ততপক্ষে তার নিকটবর্তী দেশগুলিতে।

কোরিয় যুদ্ধ (1950-1953)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার কারণে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে জাপানের অধীনস্থ কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মিত্রশক্তি কোরিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি দখলীকৃত এলাকায় (Zone of Occupation) পরিণত করে। এই দুটি এলাকায় দুটি স্বাধীন সরকার শাসনকার্য শুরু করে, উত্তর কোরিয়ায় কম্যুনিস্ট সরকার এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় অকম্যুনিস্ট সরকার এদিকে জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে কেননা প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই সচেষ্ট ছিল। জাপানের ঘাঁটি থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এর কারণ স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে উত্তর কোরিয়া থেকে কম্যুনিস্ট ফৌজ দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করতে চলেছে, অতএব তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় সেনা পাঠাচ্ছে।

এই বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয় তখন উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিবাদ জানায় কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপুঞ্জ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণ পরিষদে (General Assembly) গৃহীত Uniting for Peace Resolution বা 'শান্তির জন্য একত্র হওয়া' প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী জেনারেল ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন জানায় এবং সহযোগিতা করে, নামে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনী হলেও আসলে তা ছিল প্রায় সর্বার্থেই আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন উত্তর কোরিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায় যার ফলে পশ্চিমীবাহিনী রীতিমত পর্যুদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হয়। ১৯৫৪ সালে জেনিভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কোরিয়ার আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচিত হয় এবং মীমাংসার সূত্র পাওয়া যায়, যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময় সম্পন্ন হয়।

কোরিয় যুদ্ধের ফলে বিশ্বরাজনীতি প্রভাবান্বিত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সেই প্রথম এক যৌথ নিরাপত্তাদায়ক সংস্থা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছিল। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সকলের সম্মতি ছাড়াই এ কাজে পশ্চিমী শক্তিসমূহ সাধারণ সভার অধিকাংশের আনুগত্য পেতে পারে, এটাও প্রমাণিত হল। এটাও বোঝা গেল যে যৌথ নিরাপত্তার কাজটি মোটেই সহজ নয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের শক্তি আরও বাড়ানো দরকার।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন, এই দুই কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পশ্চিমের পুঁজিবাদী

দেশগুলির শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হয়। NATO-কে (North Atlantic Treaty Organization) আরও শক্তিশালী করার আয়োজন শুরু হয়। একনায়কতন্ত্রী জেনারেল ফ্রাঙ্কের স্পেনকে NATO-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাপানের সঙ্গে বিশেষ এক নিরাপত্তা চুক্তি হয়। কম্যুনিজম যাতে বেশি ছড়াতে না পারে তার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি সামরিক জোট তৈরি করা হল যার নাম হল ANZUS, এতে ফিলিপিনস্, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে রাখা হল, কোরিয় যুদ্ধের ফলে আমেরিকার ভিতরে দেশবাসীর মনের মধ্যেও কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দেয়।

১.২.৪ ইন্দোচীনের সঙ্কট

ইন্দোচীন দীর্ঘদিন ফরাসি উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন আক্রমণ করে। সেখানকার মানুষ জাপানী এবং ফরাসি উভয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পর ফরাসিরা ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে তাদের হারানো জমি পুনর্দখলের চেষ্টা চালাতে গেলে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ সেখানকার কম্যুনিস্ট দলের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ায়। এই যুদ্ধ ছিল ভিয়েতনামের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেখানকার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীরা ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু নামক অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা বিশাল ফরাসি সেনা বাহিনীকে টানা ছমাস আটক রেখে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করেন। তখন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের পেছনে ছিল আমেরিকা এবং ভিয়েতনামকে সাহায্য করছিল কম্যুনিস্ট চীন। জেনিভায় ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকা ও কম্যুনিস্ট চীন উভয়ের সম্মতিক্রমে ঠিক হয়, যে-যুদ্ধ বিরতি রেখার দুদিক থেকে দুপক্ষের সেনাবাহিনী সরানো হল, তা সাময়িকভাবে ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করবে। ভবিষ্যতে ফরাসি ফৌজ সরে গেলে দুই অংশেই নির্বাচনের মাধ্যমে এক জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হবে যাতে থাকবে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ভারত, কানাডা ও পোল্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ। ১৯৫৬ সালের মধ্যে দুই ভিয়েতনামের একীকরণ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কম্যুনিস্ট বিরোধিতার উদ্দেশ্যে আমেরিকা এই কাজে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের পছন্দের ব্যক্তি নো দিন দিয়েমকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসায়। রাজধানী সাইগনে প্রচুর আমেরিকান আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আসতে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতমিন বাহিনী আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে (১৯৬৪-'৭৫) অবশেষে সমগ্র ভিয়েতনাম ও লাওস এবং কামপুচিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাভূত করে। দুই ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষে সম্মিলিত স্বাধীন দেশের গৌরব অর্জন করে।

ভিয়েতনামের এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশ এই দুই মহাশক্তি (Super Power) জড়িয়ে পড়েছিল। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই যুদ্ধে ঐ দুই প্রবলপরাক্রান্ত দেশের জড়িয়ে পড়ার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দুপক্ষই তাদের নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছিল ঐ যুদ্ধে। সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী যুদ্ধে কে কোন পক্ষ অবলম্বন করছে, সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল সোভিয়েতের অনুকূলে যাওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে তার প্রভাব বেড়ে গেল। চীন প্রথম দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল কিন্তু শেষ দিকে সোভিয়েতের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত তাকে ঐ যুদ্ধ থেকে দূরে নিয়ে যায়, যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

তখন চীনের সঙ্গে বিশেষ এক বোঝাপড়া তৈরি করে নেয়। দুই শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াই এর ফলে এক ত্রিমুখী প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়।

১.২.৫ অনুশীলনী

১। বার্লিন অবরোধ বলতে আপনি কী বোঝেন? কত সালে এই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়?

২। কোরিয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

৩। ১৯৫৪ সালের জেনিভা সম্মেলনে ভিয়েতনামের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল?

৪। দুই ভিয়েতনাম, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম কিভাবে আবার সম্মিলিত স্বাধীন দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করে?

১.২.৬ ঠাণ্ডা লড়াই ও সমঝোতা (Detente)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। দুটি মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পঞ্চাশের দশক থেকেই সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই তাকে তার পূর্বের বিচ্ছিন্নতার নীতি বা Policy of Isolation থেকে সরিয়ে আনে। এখানে ঐ নীতি অনুসরণ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সেখানে প্রাচীনপন্থী সমাজব্যবস্থা, চরম দারিদ্র্য এবং প্রায় সর্বত্র প্রচলিত একনায়কতন্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মের প্রসারে সাহায্য করে। ক্রমশ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যেকার ঠাণ্ডা লড়াই প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল।

আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ, সে কখনই চায়নি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। যে কারণে প্রথমে ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে এশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে বা সাম্যবাদকে প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। দক্ষিণ আমেরিকা তার নিকট প্রতিবেশী। মহাযুদ্ধের আগে থেকেই সেখানে আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল একটি নিয়মিত ঘটনা। পানামা খাল এবং ক্যারিবিয়ান উপসাগর আমেরিকা তার নিজস্ব সরোবর বা লেকের মতো ব্যবহার করছিল। লাতিন আমেরিকান দেশগুলি আর্থিক দিক দিয়ে ছিল অনগ্রসর। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন দেশ বাণিজ্যের ছলে তাদের নানাভাবে শোষণ করেছে। ১৯৩০-এর দশকে যে সর্বগ্রাসী মন্দা দেখা দিয়েছিল, ঐ সময় এই দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলবৎ ছিল, মার্কিন মদতপুষ্ট এই সামরিক শাসকবৃন্দ ফ্যাসিস্ত কায়দায় দেশ শাসন করত। ক্রমশ সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশালী র‍্যাডিকাল মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় নিজের স্বার্থে। তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদ্য তৈরি হয়েছে। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দরকার। এই কারণে মার্কিনদেশ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা করে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে আন্তঃ আমেরিকান একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতিপুঞ্জের সনদে (uncharter) আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে Organization of American States বা OAS (আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন) তৈরি হয়। সকল সমস্যায় জোটবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হবার আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে হাতে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

লাতিন আমেরিকার প্রসঙ্গে কিউবার কথা বলতেই হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে স্বৈরাচারী বাতিস্তাকে অপসারিত করে ফিদেল কাস্ত্রো কিউবায় নতুন সরকার গড়লেন। কাস্ত্রো ছিলেন সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী এক বিপ্লবী নেতা। কাস্ত্রোর সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সোভিয়েতপন্থী দেশসমূহ পূর্ণ সমর্থন জানাল। ১৯৬২ সালে রুশ যুদ্ধ জাহাজ এক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরির উদ্দেশ্যে কিউবার দিকে অগ্রসর হয়। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে কিউবার সঙ্কট (Cuban Crisis) নামে পরিচিত। ১৯৬০-এর দশকে দুই মহাশক্তিধর দেশ পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার শীর্ষে অবস্থান করছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ ঘটনা সোভিয়েত দেশকে আমেরিকান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে ফেলে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি চতুর্দিক থেকে রুশ রণতরীগুলিকে ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে কিউবার সঙ্কটকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা সারা পৃথিবীকে এক অজানা আশঙ্কার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী আবার যেন এক মহাযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পায়। তখন সোভিয়েত দেশের কর্ণধার ক্রুশ্চেভ। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতা কেনেডি এক সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নৌবহর ফিরিয়ে নিয়ে যায়। উভয় পক্ষই সম্যক উপলব্ধি করে যে, আবার একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধলে তারা কেউই পরিত্রাণ পাবে না। এর পর থেকেই বলা যায় যে এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাস্তা থেকে সরে এসে ক্রমশ এক সমঝোতার রাজনীতি বা Detente-এর পথ অবলম্বন করার দিকে ঝোঁকে।

১.২.৭ অনুশীলনী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতি কী ছিল?

২। কিউবার সঙ্কট (Cuban Crisis) সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশ কেন ঠাণ্ডা লড়াই বর্জন করে সমঝোতার রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়?

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশ যে দীর্ঘদিন বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে গেছে তাকে কি শুধুই মতাদর্শগত সংঘাত বলা ঠিক হবে? আপনি কি মনে করেন?

১.২.৮ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটার পর অনেকেই মনে করছে যে পৃথিবী থেকে ঠাণ্ডা লড়াই চিরতরে বিদায় নিয়েছে। বার্লিনের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয় ১৯৮৯ সালে দুই জার্মানির সংযুক্তি ঘটানোর জন্য। ১৯৮৯ সাল থেকে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা ১৯৯১ সালে ওয়ারশ জোটের নীরব প্রস্থানের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। ওয়ারশ জোট ছিল সোভিয়েত শিবিরের প্রতীক, আর নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন অথবা সংক্ষেপে NATO ছিল আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী জোটের প্রতীক। এরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জমানায়। রুশ নেতা গর্বাচেভ এবং মার্কিন নেতা জর্জ বুশ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে বলে ১৯৯০-এর ২রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। মনে করা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী এক শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে এর ফলে, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সমস্যার সমাধানের বদলে জটিলতা যেন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান কোন স্থায়ী শান্তির বার্তা বহন করে আনেনি।

দুই মহাশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু দেশ দুর্ভোগের কবলে পড়েছিল। ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই যখন তুঙ্গে, তখনও কিন্তু ন্যাটো ও ওয়ারশ জোটের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়নি। বরঞ্চ তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলিই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপে পড়ে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটায় এইসব জাতিরাষ্ট্র খানিকটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের একে অপরের সাথে সম্পর্ক ভবিষ্যতে কীরকম রূপ ধারণ করতে চলেছে, আগামী পৃথিবীর চেহারাটা ঠিক কীরকম হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে কেউই যেন ঠিক নিশ্চিত নয়।

এখন দেখা যাচ্ছে একদিকে বিশ্বের ধনীদেশগুলি যেন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নয়নকামী দেশগুলিকে সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর, অপরদিকে এই অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত বিশ্বায়নের চাপে পড়ে তারা যেন খানিকটা অসহায় বোধ করছে।

বলা যেতে পারে বর্তমান পৃথিবীতে দুই মহাশক্তিধর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে সমঝোতা বা Detente-এর সম্পর্কটিই তৃতীয় বিশ্বের কাছে বেশি উদ্বেগজনক। দুই শিবিরের সম্মুখ সমরের সম্ভাবনা বহু আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি কিউবার সঙ্কটের পর সকলেই আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। দুই শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি অনেক সময় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে কাজে লাগাত। এবার আর তা সম্ভব হচ্ছে না বলেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সব দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে, বা হওয়া উচিত, তা বুঝে উঠতে পারছে না।

দুই শিবিরের ভিতরকার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই আপন আপন সমর্থক সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। ঐ দুই শিবিরের ছত্রছায়ায় যারা ছিল, তাদের তুলনায় শিবিরের বাইরে ছিল অনেক বেশি সংখ্যক দেশ। ঐ দুই দেশ নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছিল, যেমন অর্থনৈতিক চাপ, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, এবং সামরিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। এ সবেরই ফল হিসাবে গড়ে উঠেছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যা প্রকারান্তরে দুই শিবিরের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সমঝোতা তৈরি করেছিল। তৃতীয় দুনিয়া যেন জেগে উঠেছিল নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। শুরু হয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৫-১৯৭৫)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিশ্বশক্তির ভারসাম্যে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটায়। পূর্বেই বলা হয়েছে কিভাবে ঐ যুদ্ধের শেষের দিকে চীন মার্কিন সমঝোতা গড়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন দুই শক্তি তাদের নিজ নিজ অবস্থানে পরিস্থিতি অনুযায়ী অদলবদল ঘটিয়েছে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক উদগ্র বাসনার জন্ম হয়েছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, সাতাত্তর রাষ্ট্রসমষ্টি (G-77) এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠন মারফৎ বিশ্বের আর্থিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ঢেলে সাজাবার দাবি উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বে কয়েকটি মাঝারী মাপের শক্তির উত্থান ঘটেছে, যারা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান। পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনও তারা করতে চলেছে। যার ফল হিসাবে বিশ্বরাজনীতির বিভিন্ন মঞ্চে একেকটি দেশ মাতব্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শুরু হল তৃতীয় পর্যায় (১৯৭৫-৮৫) যেখানে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় শিবিরের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত ঘটেছে। এতদিন পৃথিবীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

উত্তর গোলার্ধ ধনীদের, দক্ষিণ গোলার্ধ গরিবদের, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে এক কল্পিত বিভাজনকারী রেখা, এ যেন এক নতুন বিষুবরেখা। এক নতুন বঞ্চনাবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে উত্তরের প্রতি দক্ষিণের ধিক্কার, "তোমরা ধনী হয়েছ আমাদের শোষণ ও বঞ্চনা করে", এটাই তাদের মনের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধনী দেশগুলিও ছেড়ে কথা বলছে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যাতে প্রযুক্তিতে বেশি এগোতে না পারে, সেজন্য পেটেন্টের জালে, তাদের জড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। ব্রেজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে পরিবেশ-দূষণের জন্য উত্তরকে দায়ী করেছে দক্ষিণ। আমেরিকা মোটেই এটা মেনে নেয়নি। ব্রেজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি অনুন্নত দেশকে আর্থিক সাহায্যের টোপ ফেলে দলে টানার চেষ্টা চলছে। এদিকে ব্রেজিলেরই এক অধ্যাপক জো লুই পিরান্দ হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে উন্নয়ন-ঋণের সুদ বাবদ তৃতীয় বিশ্ব থেকে উন্নত দেশগুলি পঁচিশ-তিরিশ বছরে যে পরিমাণ পুঁজি আদায় করে নিয়েছে, তাতে আসল ঋণ শোধ হয়েও বেশ খানিকটা বাড়তি চলে গেছে তাদের পকেটে।

১৯৯০-এর দশকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সমাপ্তির পর সারা পৃথিবী জুড়ে মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার তীব্রতা বেশ কিছুটা কমে গেছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ঠাণ্ডা লড়াই থেকে গেলেও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। কারণ অস্থিরতার জন্ম শুধু সামরিক সংঘর্ষ থেকে হয় না, অসামরিক কারণেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যে কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations) এখন অসামরিক নানা সমস্যা নিয়ে জর্জরিত। ঐসব সমস্যা অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু জাতিপুঞ্জ তার পুরনো ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমান দুনিয়ার নানা অদ্ভুত সমস্যাবলী নিয়ে ব্যাপৃত থাকছে অথবা সমাধানের চেষ্টা করছে। এমনিতেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানে আগেকার বিশ্বের সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আর নেই, ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাটকীয় ভূমিকা এখন অনেকটাই ম্লান। অস্ত্র দিয়ে আটকানো যায় না, এমন বহুবিধ সমস্যার কয়েকটি হল AIDS, জনবিস্ফোরণ, আতঙ্কবাদ, পরিবেশ দূষণ, কৃষিজমির অনুর্বরতা ইত্যাদি। সমস্যাগুলি এমনই ভয়ানক যে কোনও একটি বা দু-তিনটি দেশ এর সমাধান করতে পারবে না। অতএব এখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামনে এসে যাচ্ছে এক নতুন দায়িত্ব, এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

১.২.৯ অনুশীলনী

১। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে কেন?

২। বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সমঝোতা বা Detente-এর সম্পর্ক তৃতীয় বিশ্বের কাছে বেশি উদ্বেগজনক কেন?

৩। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কেন গড়ে উঠেছিল?

৪। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় বলতে আপনি কী বোঝেন?

৫। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামনে নতুন কী দায়িত্ব এসে পড়েছে?

৬। আপনি কি মনে করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে চলে?

২.০ ❑ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরবর্তী পর্যায়

ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হতে না হতেই শুরু হতে চলেছে আরেক লড়াই—উত্তর বনাম দক্ষিণের লড়াই। এই লড়াইতে অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সে রকম দাপট দেখাতে পারেনি তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও পারস্পরিক সন্দেহের কারণে। তাছাড়া উত্তর-দক্ষিণ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অনুগামী রাষ্ট্রগুলির মনোভাবও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মতই ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত সোভিয়েত দেশ তৃতীয় দুনিয়াকে নিজের স্বার্থের প্রয়োজনেই ব্যবহার করার চেষ্টা করে গেছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে কোনও সদর্থক গণ-সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। এটাতে অবশ্য খানিকটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারও ছিল কারণ তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে নিজেদের স্বার্থেই গাঁটছড়া বাঁধবার প্রয়াস পেয়েছিল। আলজিরিয়া, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া ইত্যাদি আফ্রিকার দেশগুলি এর উদাহরণ। অপরদিকে ভারত, কিউবা প্রভৃতি দেশও সোভিয়েত সামরিক এবং কুটনৈতিক মদত অপরিহার্য বলে মনে করেছে। কোনও কোনও দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের নিজস্বার্থে একদলীয় শাসনের সপক্ষে সোভিয়েত দেশ বা চীনের উদাহরণ কাজে লাগিয়েছে। এতদসত্ত্বেও বলা যায় তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কোনও দেশই সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে একটি বরণীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করেনি।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দেখা যায় সোভিয়েত দেশ তার বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে। তার নিজের দেশের আর্থিক অবস্থা তখন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। উৎপাদন ঢিমে তালে চলছে। তৃতীয় বিশ্বের সাথে তার বাণিজ্য-বৃদ্ধির হার ২৩.৮ শতাংশ থেকে কমে ৩.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল সত্তরের দশকের শেষাশেষি। উদাহরণস্বরূপ ইরাকের কথা বলা যায়। বিশ্ববাজারে তেলের দাম ক্রমশ বাড়ছে দেখে ইরাক সোভিয়েতের সাথে বিনিময়-ভিত্তিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাজার ধরতে। চাপে পড়ে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পক্ষেত্রেও এগিয়ে এল। উপায় কি, সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব আঁকড়ে থাকলে তো বাঁচা যাবে না, সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ করতেই হবে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপীয় অর্থনীতি ধুঁকতে শুরু করে। বাঁচার আশায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক বোঝাপড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। রাশিয়া আজ আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে আগ্রহী বাঁচার তাগিদেই। তৃতীয় বিশ্ব বুঝতে পেরেছে যে রাশিয়া এখন নখদন্তহীন সিংহ, সে নিজেই এখন আমেরিকার কৃপাপ্রার্থী, সে আর অন্যকে কি দেখবে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাভাবিক ভাবেই উদার এবং বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে যে এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, সেই সোভিয়েত দেশ আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সবথেকে বড় টুকরোটির নাম রাশিয়া। তৃতীয়া বিশ্ব তাদের চোখের সামনেই রাশিয়ার পালাবদল দেখেছে তাই নিজেদের স্বার্থেই তারা এখন নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজাচ্ছে। ইউরোপের কেন্দ্রীভূত সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (European Community Vs U.S.Vs Japan) এক অন্যধরনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সূচনা করছে। এ যেন এক নতুন ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই। কুয়েত-ইরাক সংঘর্ষের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন বিশ্ববিজয়ী হয়ে গেছে। সোভিয়েত দেশ ভেঙে যাবার পর সে সারা বিশ্বে একাধিপত্য কায়েম করতে চাইছে। তিনটি বড় কারণ এর পশ্চাতে আছে। প্রথমত পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এখন দুর্বল। দ্বিতীয়ত দুনিয়াদারী কায়েম করার

জন্য যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল, তার প্রধান কারণটিই এখন অনুপস্থিত, অর্থাৎ ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র এখন আর কোনও বিচার্য বিষয় নয়। যে কারণে আমেরিকা নিজেকে একমাত্র মহাশক্তি বলে মনে করছে। তৃতীয়ত শ্রেণীসংগ্রাম এখন আর আন্তর্জাতিক বিভীষিকা হিসেবে ধরা হচ্ছে না, বরং সরকারি সাম্যবাদী মহলে সেটা একরকম 'পরিহার্য ঝঞ্ঝাট' বলেই গণ্য করা হচ্ছে।

পাশ্চাত্যের কোনও কোনও পণ্ডিত এই ব্যাপারটিকে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' বলে দার্শনিক ঘোষণা করে দিয়েছেন। যে সব শব্দ সম্প্রতিকালে শোনা যাচ্ছে, যেমন Post-Cold War Period অথবা ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর সময়কাল, Post-Communist era অথবা সাম্যবাদোত্তর যুগ ইত্যাদি, তার মূল বক্তব্য হল নতুন বিশ্বে বাজার অর্থনীতি ছাড়া আর সবই বিগত, বলা যেতে পারে যে নতুন জমানায় পুঁজিবাদোত্তর বা post-capitalism বলে কোনও শব্দ নেই। তাহলে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নতুনত্ব কোথায়? ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হয়ে গেছে তাহলে কি আমরা আবার বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি, যখন সমাজতন্ত্র কোনও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হয়নি অর্থাৎ পুঁজিবাদ আবার পৃথিবীতে জাঁকিয়ে বসতে চলছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত, আমেরিকা এটা বুঝতে পারছে যে নতুন বিশ্বে আরও শক্তির উদ্ভব হয়েছে যারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে যেমন অর্থ, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে ইউরোপে জার্মানি ও এশিয়ায় জাপান। World Hegemony বা বিশ্বকর্তৃত্ব অথবা Pax Americana বা আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত শান্তি কোনওটাই একন বাস্তবসম্মত নয়। এখন দরকার ক্ষমতাশালী দেশগুলির একজোট হওয়া। সুতরাং পৃথিবীকে এখন একমেরুসম্পন্ন বা Uni-polar ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এশিয়ায় চীনও অনেকটাই অগ্রগামী হয়ে উঠেছে। তবে কেথা বললে হয়তো ভুল হবে। না যে যতদিন এইসব শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার বন্ধুস্থানীয় থাকবে এবং ক্ষমতার দৌলতে তার মোসাহেব দেশের ও অভাব হবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতির শীর্ষে ঠিক ততদিনই বহালতবিয়তে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারবে। সে কারণে বিশ্বব্যাপী ফৌজী খবরদারী সে চালিয়েই যাবে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সহায়তায়।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যেটা হল মতাদর্শগত প্রশ্ন বা Ideology-সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রতিযোগিতামূলক বাজার-অর্থনীতি এবং গণতন্ত্র একসঙ্গে চলবে। পাশ্চাত্যে এটিই কাম্য ব্যবস্থা কিন্তু তাঁদের মোসাহেব রাষ্ট্রসমূহে যে ধরনের অগণতান্ত্রিক শাসন চলছে, তা পালটানোর ঝুঁকি নেওয়া পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রপ্রেমীদের পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ তাইওয়ান, পাকিস্তান, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়ার নাম করা যায়, যেখানে বাজার অর্থনীতি চালু হলেও গণতন্ত্র অনুপস্থিত। মনে হয় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালের বিশ্বে মতাদর্শ (ideology) তার পূর্বেকার গুরুত্ব হারিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, নতুন বিশ্বে নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হচ্ছে। বিশেষ কোনও গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। বৃহৎ শক্তিবর্গ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে নিজেদের স্বার্থে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে বলা হচ্ছে যেন তারা পরমাণু, রাসায়নিক এবং কীটাণুঘটিত যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন না করে। তারা নিজেরা কিন্তু সব নিষেধাজ্ঞার ঊর্ধ্বে। তারা অতীতে বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র ঐসব দেশগুলিকে যোগান দিয়েছে, আজ তারা ভাবছে যদি অস্ত্র সরবরাহের কাজে এরাও প্রতিযোগী হিসাবে দেখা দেয়, তাহলে তো সমস্যায় পড়তে

হবে। তৃতীয় বিশ্বের যেসব রাষ্ট্র পরমাণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে, তাদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রণ না মানলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুনজরে পড়তে হচ্ছে যেমন পড়েছে ইরাক এবং ভারত।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকার কথাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা যেন যা খুশি তাই করতে পারে। তারা এককাট্টা হতে চাইলে যে কোনও অস্থায়ী সদস্য দেশকে সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। বৃহৎ শক্তিবর্গই স্থায়ী সদস্যপদ ভোগ করছে। পদাধিকার বলে এরা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে। আটবছর ধরে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলেছিল, তখন কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। কিন্তু যখন ইরাক কুয়েতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ নড়েচড়ে বসল। সোভিয়েত দেশ ভেঙে যাবার পর তার স্থায়ী আসনটি রাশিয়া বিনাবাধায় পেয়ে গেল অথচ তাইওয়ানের মত ক্ষুদ্র দেশটিকে সরিয়ে অত বড় দেশ চীনকে স্থায়ী সদস্যপদ দেবার সময় কতই না দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এদিকে জাপান ও জার্মানীকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থায়ী আসন দেবারও কথা উঠেছে। এই দুটি সমৃদ্ধ দেশ মার্কিনীদের বিশ্বশাসনে বাগড়া দিতে পারে, এই ভয়ও অবশ্য আমেরিকার আছে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর পৃথিবী আর ধনবাদী ও সমাজবাদী এই দুভাগে বিভক্ত নয়। তবু তৃতীয় বিশ্ব তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এটি আসলে একটি অনুভূতির ব্যাপার। এখানকার মানুষ এখনও মানসিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী। তারা উন্নয়নকামী, যে কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী দেশগুলির কারও কারও সাথে হয়তো আপস করতেও রাজি। কিন্তু এই আপস কখনই জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ এখন রাজনৈতিকভাবে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সচেতন।

২.১ ☐ অনুশীলনী

১। উত্তর বনাম দক্ষিণের লড়াই বলতে আপনি কী বোঝেন?

২। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কেন এখন বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে?

৩। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪। বর্তমান বিশ্বে মতাদর্শের (Idcology) গুরুত্ব কতখানি? আপনি কি মনে করেন বিদেশ নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য?

২.২ ☐ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। এই বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ছিল পশ্চিমের বৃহৎ শক্তিসমূহ, যাদের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এসে গিয়েছিল পরিস্থিতির চাপে। পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশ। বিশ্বযুদ্ধের অপরপক্ষে ছিল নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট, ইতালি এবং রাজতন্ত্রী জাপান। যুদ্ধে পশ্চিমী গোষ্ঠী সোভিয়েতসহ জয়লাভ করে। পৃথিবীতে দুটি সুপার পাওয়ার বা মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে দুটি দেশ মতাদর্শজনিত ভিন্নতার কারণে একে অপরের বন্ধু হতে পারে না, বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই, পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস মাথাচাড়া

দেয়, যার দ্বারা প্রভাবিত হয় পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশ, বিশেষত অনুন্নত দেশগুলি আত্মরক্ষার তাগিদে হয় আমেরিকা নয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুটি সুপার পাওয়ারের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৮৯-১৯৯০ সালের মধ্যে সোভিয়েত দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে বিশ্বরাজনীতি এক নতুন দিকে মোড় নেয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর এক নতুন রাজনীতির জন্ম হয়েছে, যার নাম সমঝোতার রাজনীতি বা Detente। এখন আমেরিকা, তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহ এবং রাশিয়া উপলব্ধি করতে পেরেছে যে পারস্পরিক রেষারেষি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে যদি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে, তাহলে সম্ভবত গোটা পৃথিবীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কেউই রক্ষা পাবে না। তার ওপর বর্তমানে দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদ, যে সমস্যা পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলিকে ভীষণভাবে বিব্রত করে তুলেছে।

২.৩ ❑ গ্রন্থপঞ্জি

1. D. F. Fleming—The Cold War and its Origins. (Allen and Unwin 1961)
2. Ronald Barston—International Politics Since 1945.
3. Peter Calvocorressi—World Politics since 1945 (Essex : Longman group 1991).
4. Gopal Krishnan : Non-Alignment and Politics (V.I. Publishers, New Delhi).
5. Radharaman Chakraborty—Samakaleen Antarjatik Samparka (in Bengali) (Paschimbanga Rajya Pustak Parshat 1999).

একক ২ ☐ যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপের ক্রমবিকাশ ঃ ঐক্য আন্দোলন ও সংহতির প্রয়াস

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ঐক্যের প্রথম প্রয়াস
২.৩ রোম চুক্তি-ইউরোপের সাধারণ বাজারের (EEC) প্রতিষ্ঠা
২.৪ EEC-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ
  ২.৪.১ মন্ত্রীপরিষদ (The Council of Ministers)
  ২.৪.২ কমিশন (The Commission)
  ২.৪.৩ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (The European Parliament)
  ২.৪.৪ আদালত (The court of Justice)
  ২.৪.৫ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.৫ EEC-এর প্রকৃতি-আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া-সাধারণ বাজার
  ২.৫.১ EEC-এর প্রকৃতি
  ২.৫.২ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া
  ২.৫.৩ সাধারণ বাজার
২.৬ ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ
  ২.৬.১ ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান
  ২.৬.২ EEC-এর সম্প্রসারণ
  ২.৬.৩ ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ।
২.৭ সারাংশ
২.৮ সংকেত
২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ ☐ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইয়োরোপের পুনরুত্থান কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে নিম্নলিখিত পর্যায়ে, যেমন :

- বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের প্রেক্ষাপট।
- ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের প্রথম প্রয়াস।
- রোম চুক্তির দ্বারা ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (EEC) প্রতিষ্ঠা।
- EEC-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের গঠন ও কার্যাবলী।

- EEC-এর প্রকৃতি, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও সাধারণ বাজারের বৈশিষ্ট্য।
- ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান ও EEC-এর সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ।

২.১ ☐ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ইউরোপের সাম্প্রতিক পুনরুত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপই ছিল বিশ্ব রাজনীতির মূল কেন্দ্র এবং বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হত কয়েকটি ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির দ্বারা, যথা : গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া এবং স্বল্প পরিমাণে ইতালি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিপর্যয় ডেকে আনে। উত্থান ঘটে দুটি অ-ইউরোপীয় মহাশক্তির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদের নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রচুর পরিমাণ ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদ যার দ্বারা ওয়াশিংটন এবং মস্কো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের 'বৃহৎ শক্তির মর্যাদা' হ্রাসই কেবল ইউরোপের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ছিল না, ছয় বছরের বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র মহাদেশটিকেই বিপর্যস্ত করে দেয়। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রায় সকল রাষ্ট্রই প্রভূত পরিমাণ অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক এবং বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। অসংখ্য নরনারী ও শিশু হতাহত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এদের অধিকাংশেরই আশ্রয় নেওয়ার মতো কোন স্থান ছিল না এবং ফলত তারা এক দিশাহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে এসে দাঁড়ায়। ইউরোপে দেখা দেয় আত্মবিশ্বাসের সংকট।

সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের প্রধান সমস্যাটিকে সামনের সারিতে এনে দাঁড় করায়—এটি হল নিয়ন্ত্রণহীন আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমস্যা। ফরাসি বিপ্লবের পরেই ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ১৮৭১ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির উত্থানের সাথে সাথে এই সংঘাত তীব্রতর হয়। তাই যথার্থই বলা যায় যে এই শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছিল ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণহীন জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইউরোপের সর্বত্র ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের চিত্র। ইউরোপের দেশগুলি এক অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় ইউরোপের সামনে কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন বা কয়েকটি দেশের লুপ্ত বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউরোপের জনসাধারণ দুটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক কি-না। কারণ এই জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাই ছিল ইউরোপের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। এই প্রেক্ষাপটেই ইউরোপে সংহতি সাধনের সাম্প্রতিক প্রয়াসটিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ইউরোপে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নতুন নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চিন্তাবিদ্ এবং রাষ্ট্রনায়কগণ একটিমাত্র কর্তৃপক্ষের অধীনে সমগ্র মহাদেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছেন। পোপের আধিপত্যের যুগে

খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যের ধারণা ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে নবম শতকে শার্লেমান, ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে নেপোলিয়ান এবং সবশেষে বিংশ শতকে হিটলার সামরিক শক্তি দিয়ে ইউরোপে ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা চালান যদিও এর পরিণতি হয়েছিল মারাত্মক।

২.২ ☐ ঐক্যের প্রথম প্রয়াস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্‌দের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে দীর্ঘদিনের পুরোনো এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দূর করার একমাত্র উপায় হল সহমতের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধ পরবর্তী যুগের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই চিন্তাবিদ্‌গণের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে। ইউরোপে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দেন ব্রিটেনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইন্‌স্টন চার্চিল। ১৯৪৬ সালে সেপ্টম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে এক ভাষণে চার্চিল ফ্রান্স-জার্মানির মধ্যে মতবিরোধ দূর করে "সম্মিলিত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র" ধাঁচের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে মত দেন। তিনি একটি "ইউরোপীয় পরিষদ" (Council of Europe) প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন।

ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের বিবর্তনে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত পুরোনো দৃষ্টি-ভঙ্গিকে আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গি (Inter-Governmental Approach) বলে অভিহিত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঐক্য প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই এই কর্ম প্রক্রিয়ার সূচনা করেন এবং এর ব্যাপ্তি কতদূর হবে সে বিষয়ে তাঁদের পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় অধি-জাতীয়তাবাদ (Supranationalism) যেখানে কোনও অধি জাতীয় সংস্থার সদস্যরাষ্ট্রগুলি এর প্রধান অঙ্গগুলিকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করে।

১৯৪৫ সালের ঠিক পরেই যখন ঐক্য আন্দোলনের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে সময় গ্রেট ব্রিটেনই ছিল আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা। তখন ব্রিটেনই ছিল একমাত্র ইউরোপীয় শক্তি যার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। ১৯৪৮ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ (Organization for European Economic Co-operation বা OEEC) গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনের এই দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। OEEC-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা (Marshal Plan) অনুযায়ী প্রদত্ত মার্কিন সাহায্যের সঠিক বণ্টনের জন্য একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এইভাবে OEEC-ই প্রথম ব্যাপক ইউরোপীয় আর্থিক সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলে। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশই এর সদস্য হয়। ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে সহযোগী সদস্যপদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে যুগোস্লাভিয়া এর কিছু কিছু কার্যকলাপে অংশ নিতে থাকে। এই সংস্থার মধ্যে ছিল একটি কাউন্সিল যাতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ছিল, একটি কার্যনির্বাহী কমিটি, বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং একটি সচিবালয় যার সদর দপ্তর ছিল প্যারিসে। কাউন্সিলের সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ঐক্যমতের নিয়ম মানা হত। স্বাভাবিকভাবেই একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা হিসাবে OEEC-তে ঐক্যমতের এই নিয়ম ছিল এর কার্যকরী হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা। ১৯৫৮ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (European

Economic Community) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই OEEC-এর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

ইউরোপে একীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম যুগে আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গির অপর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ১৯৪৯ সালের মে মাসে ইউরোপীয় পরিষদ (Council of Europe)-এর প্রতিষ্ঠা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এর সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতির পরিপোষণ। সমস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশ ছাড়াও, সাইপ্রাস, আইসল্যান্ড, সমাজতন্ত্র-উত্তর রাশিয়া এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও এখন এই পরিষদের সদস্য। এটিও একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা যার মধ্যে আছে সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি (Committee of Ministers), সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্থায়ী প্রতিনিধি যাঁদের কাজ হল সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিমাসে অধিবেশনে মিলিত হওয়া, সব সদস্যরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রণাসভা (Consultative Assembly) এবং স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত একটি সচিবালয়। এই পরিষদের কার্যকলাপের আওতাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে আছে মানবাধিকার, সামাজিক সমস্যাবলী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, সংরক্ষণ, আইনগত সহযোগিতা এবং অপরাধ প্রতিরোধ। এইসব বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনগুলির মধ্যে সমতা বিধানের জন্য পরিষদ অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদন করে। বিশেষত মানবাধিকারের ক্ষেত্রে 'মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ বিষয়ক ইউরোপীয় সভা' (European Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedom)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রেট ব্রিটেনই ছিল আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা। অধিজাতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু জাতীয় সার্বভৌমিকতার সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা ছিল তাই ব্রিটেন ছিল এর বিরোধী। কিন্তু ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের বহু দেশ যথা ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশসমূহের বহু মানুষের অভিমত ছিল যে, ইউরোপের সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধান খুঁজতে গেলে প্রয়োজন নতুন ধরনের সহযোগিতা। শিল্প, বাণিজ্য, শক্তি, পরিবহন প্রভৃতির মত কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি সংস্থা গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যা তার এলাকভুক্ত দেশগুলির মতৈক্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজের নিজের এলাকায় এগুলির রূপায়ণ করতে বাধ্য থাকবে।

এই চিন্তাধারার প্রথম সফল বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫১ সালে European Coal and Steel Community (ECSC) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জার্মান সমস্যার সমাধান খোঁজার লক্ষ্যেই ECSC স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসি-জার্মান, দ্বন্দ্বই ছিল আধুনিক ইউরোপের অধিকাংশ সমস্যার প্রধান কারণ এবং এই দুটি দেশের মধ্যে শত্রুতা দূর করেই কেবল একটি শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধিশালী ইউরোপ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। একটি অধি-জাতীয় (Supranational) কাঠামোর মধ্যে পুনরুদীয়মান এবং সম্ভাব্য শক্তিশালী জার্মানিকে বেঁধে রাখার পাশাপাশি ECSC ফরাসি-জার্মানির বিরোধ দূরীকরণের সুযোগও সৃষ্টি করেছিল। এই ভাবে ১৯৫০ সালের মে মাসে ঘোষিত সুম্যান পরিকল্পনা (এই উদ্যোগের প্রধান রূপকার ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর নামাঙ্কিত) অনুযায়ী ফ্রান্স এবং জার্মানিকে তাদের কয়লা এবং ইস্পাতের উৎপাদন একটি উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অন্য দেশগুলি যদি এই প্রকল্পে যোগ দিতে আগ্রহী হয় তবে তাদেরও স্বাগত জানানো হয়। এর ফল হিসাবে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং ইতালি এই প্রকল্পে যোগ দেয়। ব্রিটেন

এতে অংশ নিতে অস্বীকার করে কারণ তার মতে এই পরিকল্পনা ছিল অতিমাত্রা-জাতীয় এবং ব্রিটিশ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ECSC প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ছয়টি সদস্য দেশের মধ্যে কয়লা, কোক কয়লা, ইস্পাত এবং লৌহপিণ্ড এবং উপজাত লৌহের বাণিজ্যের পথে সব বাধা দূর করা। ECSC-এর কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে প্রভূত অধি-জাতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়; যথা এই সংস্থার হাতে কয়লা এবং ইস্পাতের মূল্য নির্ধারণের অধিকার এবং চুক্তির নিয়মভঙ্গকারীর উপর জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণেও কাজ হারানো শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ, তাদের পুনর্বাসন, এবং কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের পুনর্গঠনে ECSC আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় কয়লা এবং ইস্পাত উৎপাদনের উপর আদায় (Levy) আরোপ করে। লেভির হার প্রতিবছর নির্ধারণ করা হত।

ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাসে ECSC-এর প্রতিষ্ঠা আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গির বদলে অধি-জাতীয়তাবাদের উত্থানের সূচনা ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপ যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল সেগুলির সঠিক সমাধানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল কিছু মৌলিক ধাঁচের প্রতিষ্ঠানের। গ্রেট ব্রিটেনের তীব্র আপত্তি এবং কিছু আনুষঙ্গিক বাধা সত্ত্বেও পরবর্তী বছরগুলিতে অধি-জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমন্বিত অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তীব্রতা লাভ করে।

অনুশীলনী-১

২.৩ □ রোমচুক্তি-ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (ECSC) প্রতিষ্ঠা

একটি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের ধারণা (Common market) বহুদিন ধরেই ইউরোপীয় বিভিন্ন মহলে ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ECSC-এর সাফল্যের ফলে এই বিষয়টি নিয়েও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৫ সালের ২০শে মে বেলজিয়াম হল্যান্ড এবং লুক্সেমবার্গের সরকারগুলি (Benelux Governments) ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির সরকার সমূহের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে একটি 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' গঠনের অনুরোধ জানায়। এই বছরের ২রা জুন ইতালির মেসিনায় ছয়টি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ মিলিত হয়ে এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন এবং এই বিষয়ে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করতে একটি আন্তঃসরকারি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৫৬ সালের বসন্তে যে রিপোর্ট পেশ করে তার উপর ভিত্তি করেই ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ European Economic Community (EEC) এবং European Atomic Energy Agency (EURATOM) গঠন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইতালির রোমে। পরবর্তী মাসগুলিতে ছয়টি দেশ এই চুক্তিগুলো অনুমোদন করে। ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এই সংস্থাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।

EEC-এর অঙ্গীকার ছিল 'ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলা।' ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ECSC এবং ১৯৫৮ সালে EEC-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত EURATOM-লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। তবে পরবর্তী সময়ে এই দুটি সংস্থার তুলনায় EEC-এর গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি এই

সংস্থাসমূহের আইনসংক্রান্ত বিভাজন বিভিন্ন নীতিগত ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ শক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে (যা পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) নীতি নির্ধারণ ক্ষমতা বিভক্ত ছিল। ECSC (কয়লা), EURATOM (পরমাণু জ্বালানী) এবং EEC (তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য জ্বালানী)-এর মধ্যে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম বারের জন্য EEC-এর কলেবর বৃদ্ধি করে ব্রিটেন, আয়ার্ল্যান্ড এবং ডেনমার্ককে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সাথে সাথে উপরোক্ত তিনটি সংস্থার কার্যকলাপের পার্থক্যও ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে। তিনটি সংস্থা একটি একক সত্তা লাভ করে এবং পরিচিত হয় ইউরোপীয় গোষ্ঠী (European Community) নামে।

EEC-এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত রোম চুক্তির ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি অভিন্ন সম্প্রদায়ের ধারণার ভিত্তিতে EEC সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহকে তার আওতাভুক্ত করবে। এর উদ্দেশ্য কেবল এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করা নয়। একটি সাধারণ স্বার্থের কাছে এদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাখাও এদের কাজ। ২৩৭নং ধারা অনুযায়ী EEC-এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারলে অন্য দেশও এই গোষ্ঠীতে যোগদান করতে পারে।

রোম চুক্তির ২নং ধারায় EEC-এর বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে বর্ণনা করা হয় : গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হবে একটি সাধারণ বাজারের প্রতিষ্ঠা এবং সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রগতিমূলক প্রয়োগের মাধ্যমে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ঐক্যবদ্ধ বিকাশ ঘটানো, ক্রমাগত এবং ভারসাম্যযুক্ত সম্প্রসারণ, স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়ন এবং সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্রগুলি একটি শুল্ক ইউনিয়ন (Customs Union) প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেয় ('শুল্ক ইউনিয়ন' হল একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক এবং অন্যান্য নিষেধ বিধি দূর করতে এবং তৃতীয় কোনো দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন করতে এবং সাধারণ বাহ্যিক শুল্ক আরোপ করতে সম্মত হয়)। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় কোনো দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতির প্রণয়ন এবং কৃষি, পরিবহণ এবং বাণিজ্যিক চলাচল নিশ্চিত করতে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি এবং আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতেও তারা সম্মত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিশেষ সংযোগ আছে এমন সব আর্থিক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে EEC চুক্তি ছিল মূলত একটি কাঠামো। এর দ্বারা প্রণীত নীতির ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব ছিল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে নীতি নির্ধারণ করা। EEC প্রণীত বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত করতে সম্মত হয়।

সুতরাং ইউরোপীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত রোম চুক্তি ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। EEC ব্যতীত অন্য কোনো ইউরোপীয় সংগঠন এমন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। EEC গঠন সংক্রান্ত চুক্তিতে এই সংস্থার আওতায় কতকগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় যারা নিজ নিজ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.৪ ☐ EEC-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রথাগত আন্তঃসরকারি সহযোগিতা পদ্ধতির বদলে এর নয়া পদক্ষেপ। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে যারা প্রচুর পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এবং EEC-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সাধারণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। EEC-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

EEC-এর মধ্যে আছে চারটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান-মন্ত্রীপরিষদ, কমিশন, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং আদালত। এ ছাড়াও আছে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এবং হিসাব পরীক্ষকদের একটি সভা। কমিশন এবং মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে EEC-এর সাধারণ নীতিগুলি প্রণীত হয়। পার্লামেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এই প্রতিক্রিয়ায় মূলত পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে। সমগ্র কর্ম প্রক্রিয়াই আদালতের আওতাভুক্ত। হিসাব পরীক্ষকদের সভার কাজ হল EEC-এর বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। সুতরাং বলা যায় এখানে নীতি নির্ধারণ হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক।

২.৪.১ মন্ত্রীপরিষদ

EEC-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হল মন্ত্রীপরিষদ। এই সংস্থার মধ্য দিয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে এবং এগুলিকে একটি সাধারণ গোষ্ঠীগত স্বার্থে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। পরিষদে সকল সদস্যরাষ্ট্রের একজন করে মন্ত্রী প্রতিনিধিত্ব থাকে। আলোচনার বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মন্ত্রী তাঁদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মূলত বিদেশ মন্ত্রীরাই অধিকাংশ সম্মেলনে যোগ দেন, যদিও কৃষি, অর্থ, পরিবহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি দপ্তরের মন্ত্রীগণও এইসব বিষয়ের আলোচনায় নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা ব্যতীত মন্ত্রীপরিষদ কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে EEC চুক্তিতে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিটির বদলে ঐক্যমত্যের নীতিটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ওই বছর সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতির ভিত্তিতে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ফরাসি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় এই অজুহাতে ফ্রান্স নয় মাসের জন্য EEC-এর সকল প্রতিষ্ঠান বয়কট করে। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যদিও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলিতে ঐক্যমত্যের নীতিটিই প্রচলিত আছে। বর্তমানে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এমনভাবে কাজ করে যার ফলে অন্তত একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সমর্থন ব্যতীত বৃহৎ সদস্য রাষ্ট্রগুলি (ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, ইতালি ও স্পেন) কেবল তাদের নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

পরিষদে প্রতি ছয় মাস অন্তর সদস্য দেশগুলির একজন করে পর্যায়ক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। যে সদস্যরাষ্ট্র থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন, পরিষদের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করে নেয়। সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ একদিকে সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে অন্যদিকে সভাপতি হিসাবে পরিষদের সভায় অংশ নেয়। সভাপতির দায়িত্ব হল বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। সুতরাং সভাপতির দায়িত্ব পালন করার সময় সদস্য রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলিতে সংযমের পরিচয় দেবে এটাই আশা করা হয়।

স্থায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি (যা COREPER নামে পরিচিত) এবং কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কর্মী গোষ্ঠী মন্ত্রীপরিষদকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা দান করে। ব্রাসেল্‌সে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই একটি স্থায়ী প্রতিনিধিদল আছে যা দূতাবাসের সমান মর্যাদা সম্পন্ন। COREPER এবং কর্মী গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রস্তাব এবং নীতির ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা চালায় এবং ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এই বিষয়গুলিকে নিয়ে যাতে মন্ত্রীস্তরে আলোচনা প্রয়োজন না হয় সেই চেষ্টা করে। মন্ত্রীগণ স্বল্প সময়ের জন্য ব্রাসেল্‌সে আসেন। সুতরাং কর্মী গোষ্ঠীগুলি এবং COREPER-এর মূল লক্ষ্য থাকে EEC-এর নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা করে নেওয়া এবং সম্ভব হলে ঐক্যমতে উপনীত হওয়া। যে বিষয়গুলি নিয়ে বিরোধ সবচেয়ে বেশি এবং যেগুলি নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ঐক্যমতে পৌঁছানো সম্ভব হয় না সেগুলিই কেবল আলাপ-আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের জন্য পরিষদের সভায় পেশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিগত ২৫ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৭৪ সালে ইউরোপীয় পরিষদ (European Council)-এর প্রতিষ্ঠা। এই পরিষদ হল সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের এক নিয়মিত শীর্ষ বৈঠক যা বছরে অন্ততপক্ষে দুবার অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ একজন সভাপতির কার্যকলাপের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য প্রয়োজনে অন্য সময়েও এই অধিবেশন আহ্বান করা যায়। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি, বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণও এই বৈঠকে যোগ দেন। ইউরোপীয় পরিষদ হল একটি নীতি নির্ধারক সংস্থা। মন্ত্রীপরিষদ যে সব বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হতে ব্যর্থ হয় ইউরোপীয় পরিষদ রাজনৈতিক স্তরে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করে।

২.৪.২ কমিশন

কমিশন একটি অদ্বিতীয় সংস্থা। ECSC-এর উচ্চ কর্তৃপক্ষের আদলেই এই সংস্থাটিকে গড়ে তোলা হয়। কিছু বিশ্লেষকের মতে ইউরোপীয় কমিশনকে ভবিষ্যতের একটি একক অধি-জাতিক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক পর্যায় বা ভ্রূণাবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সংস্থা হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়নের উদ্যোক্তা এবং সমন্বয়সাধনকারী। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনসমূহের প্রয়োগ বা রূপায়ণের পাশাপাশি কমিশন এই সংস্থার পরিচালনা ও নীতি সংক্রান্ত নিয়মিত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করে, বিভিন্ন অর্থসাহায্যের কর্মসূচিগুলির তদারক করে। উপরন্তু কতগুলি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষত প্রতিযোগিতার নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে।

কমিশন ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সদস্যদের বলা হয় কমিশনার। সদস্য রাষ্ট্রগুলি এদের নিযুক্ত করে। পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্র দুই জন করে এবং দশটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে একজন করে প্রতিনিধি এই সংস্থায় প্রেরণ করে। রোম চুক্তি

অনুযায়ী কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের দেশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত হন না, সাধারণ যোগ্যতার নিরিখেই তাদের নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্ত হওয়ার পর কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের জাতীয় সরকার ব্যতিরেকেই সাধারণ গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করবেন বলে আশা করা হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলি কমিশনারদের নিযুক্ত করলেও সংস্থা হিসাবে কমিশন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল। কেবল পার্লামেন্টই কমিশনকে বাতিল করে দিতে পারে।

EEC চুক্তির ১৫৫ ধারায় কমিশনের চারটি প্রাথমিক ভূমিকার কথা বলা হয় :

(i) চুক্তির সকল ধারা যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তা নিশ্চিত করা এবং পরবর্তী সময়ে গৃহীত সকল আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা,

(ii) চুক্তির আওতার মধ্যে সকল বিষয়ে সুপারিশ এবং মতামতগুলিকে সন্নিবিষ্ট করা,

(iii) নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যবহার করা এবং চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সাথে নীতি নির্ধারণে নিজেকে যুক্ত করা এবং

(iv) গোষ্ঠী সংক্রান্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রীপরিষদ যে ক্ষমতা অর্পণ করবে সেগুলি ব্যবহার করা। এছাড়াও কমিশন ইউরোপীয় সামাজিক তহবিল (European Social Fund), ইউরোপীয় বিকাশ তহবিল (European Development Fund), ইউরোপীয় আঞ্চলিক উন্নয়ন তহবিল (European Regional Devlopment Fund) এবং EURATOM-এর যৌথ গবেষণা কেন্দ্রে (Joint Research Centre) তত্ত্বাবধান করে।

এইভাবে EEC চুক্তি অনুযায়ী কমিশনের হাতে যে ব্যাপক পরিমাণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় তার দ্বারা এই সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দৈনন্দিন কার্যকলাপের উপর প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একে তাই EEC-এর যান্ত্রিক শক্তি, EEC চুক্তির অতন্দ্রপ্রহরী প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করা হয়। ১৯৯১ সালের মাসট্রিষ্ট (Maastricht) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কমিশনের কার্যকলাপের মেয়াদ চার বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়। কমিশনের একজন সভাপতি এবং দুই জন সহসভাপতি থাকেন। কমিশনের প্রত্যেক সদস্যকে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিশনের আছে ২৩টি বিভাগ, সেগুলি ডিরেক্টরেট জেনারেল (Directorates General) নামে পরিচিত। এছাড়াও আছে একটি সাধারণ সচিবালয়, একটি আইন বিভাগ, একটি পরিসংখ্যান বিভাগ এবং কয়েকটি বিশেষীকৃত সংস্থা। দায়িত্বের এই বিভাজন সত্ত্বেও কমিশন একটি গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে এবং এর সকল কাজের জন্য যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। কমিশনের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতির উপর। যাঁদের তিনি নেতৃত্ব দেন তাঁদের মনে গোষ্ঠীচেতনা কতখানি জাগিয়ে তুলতে পারেন তার উপরেও কমিশনের সাফল্য নির্ভর করে। যদিও ইউরোপীয় পরিষদ হল EEC-র সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তথাপি এর বিচিত্র কর্মপ্রক্রিয়ার সমন্বয়ে কমিশন ইউরোপীয় গোষ্ঠীর স্নায়ুকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

২.৪.৩ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হল ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ১৯৭৯ সালের আগে এর সদস্যগণ নির্ধারিত 'কোটা' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জাতীয় আইনসভা দ্বারা মনোনীত হতেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভোটদাতাদের দ্বারা

সরাসরি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে জার্মানির পুনর্মিলন এবং তিনটি দেশ যোগ দেওয়ার পর ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা হয়েছে ১৫ এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৬২৬। সদস্য রাষ্ট্রগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা নিম্নরূপ : অস্ট্রিয়া-২১, ফ্রান্স-৮৭, জার্মানি-৯৯, ইতালি-৮৭, যুক্তরাজ্য-৮৭, স্পেন-৬৪, হল্যান্ড-৩১, ফিনল্যান্ড-১৬, গ্রিস-২৫, পর্তুগাল-২৫, বেলজিয়াম-২৫, ডেনমার্ক-১৬, আয়ারল্যান্ড-১৫, লুক্সেমবার্গ-৬, সুইডেন-২২। সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে প্রথাগত অর্থে আইনসভা বলা যায় না। এর ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং বর্তমানে অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর এর তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। পার্লামেন্টের ভূমিকা মূলত পরামর্শদান এবং তত্ত্বাবধানমূলক। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে পার্লামেন্টের সাথে আলোচনা করতে হয় এবং পার্লামেন্ট এ বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারে। পার্লামেন্ট আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলির অধিকাংশকেই নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এটি প্রথা মাত্র, অবশ্যমান্য নয়। ১৯৮৬ সালে রোম চুক্তির সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে আইনটি (single European Act) গৃহীত হয় তাতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। নতুন আইন অনুযায়ী পার্লামেন্ট-আনীত সংশোধনীগুলি যদি প্রস্তাবের আকারে গৃহীত না হয় তবে পার্লামেন্ট এই আইনটিকে কিছু দিনের জন্য আটকে দিতে পারে।

সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। প্রস্তাবের আকারে পার্লামেন্ট তার যে সব অভিমত জানায় সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রকে, বিশেষত উন্নতশীল দেশগুলির সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে, প্রভাবিত করে। পার্লামেন্টের অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাও আছে, যেমন : কমিশনের সভাপতি মনোনীত করা, নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে কমিশনকে বাতিল করে দেওয়া, বাজেট এবং ব্যয়ের কর্মসূচিগুলিকে অনুমোদন করা। ৭০-এর দশকের প্রথম থেকেই পার্লামেন্ট কমিশনকে পার্লামেন্টীয় প্রথা অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে দায়িত্ববদ্ধ করার চেষ্টা করছে। কমিশনের মতো আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব না থাকলেও মন্ত্রীপরিষদ তার সদস্যদের প্রশ্ন করার ব্যাপারে পার্লামেন্টের অধিকার মেনে নিয়েছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট তার কার্যকারিতার পূর্ণমাত্রায় এখনও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তথাপি এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে পূর্বতন বৎসরগুলির তুলনায় পার্লামেন্ট তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এটা আশা করা যায় যে, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান সমূহের গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে দাবি যত জোরদার হবে পার্লামেন্টের ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে।

২.৪.৪ আদালত

লুক্সেমবার্গে অবস্থিত আদালত (ECJ) ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত প্রদানের অধিকারী। যে ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী নয় সেখানে আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগীয় সংস্থা কোনও গোষ্ঠীর গঠনকারী একক এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত মতামত জানায়। বস্তুত আদালত ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একটি শক্তিশালী সংস্থা যার প্রধান কাজ হল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা। এ ছাড়া রোম চুক্তি এবং এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে গৃহীত আইনগুলির ব্যাখ্যা কেবল এই আদালতই দিতে পারে।

আদালতের মোট বিচারপতির সংখ্যা ১৫ এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের সংখ্যা ৯। সদস্য ১৫ রাষ্ট্রের থেকে সাধারণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে এঁরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এঁদের কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। আদালতের সামনে কোনও মামলা উত্থাপিত হলে এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে একজন অ্যাডভোকেট জেনারেল একটি 'নিরপেক্ষ-মূল্যায়ন' প্রস্তুত করেন। রায়দানের আগে বিচারপতিগণ এই মূল্যায়ন শোনেন যদিও এই সিদ্ধান্ত তাঁরা মানতে বাধ্য হন। বিচার অনুষ্ঠিত হয় গোপনে তবে রায় দেওয়া হয় প্রকাশ্য অধিবেশনে। বিচারপতিদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৬ সালে Single European Act অনুযায়ী আদালতের হাতে জমে যাওয়া মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি Court of the First Instance of the European Communities (CFI) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫টি সদস্যরাষ্ট্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর সদস্যসংখ্যা হয় ১৫। প্রাথমিক পর্যায়ে এর ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ : তবে ১৯৯৩ সালে মাসট্রিক্ট চুক্তি সংশোধনের মাধ্যমে এর এলাকাকে অনেকখানি বাড়ানো হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় আদালতের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে অনেকে একে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মতোই 'রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস' বলে মন্তব্য করেন। আদালতের প্রধান কাজ হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলির সঠিক রূপায়ণ নিসিচত করা। কমিশন, সদস্য রাষ্ট্রগুলি, কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা কোনও আইন-সংস্থা ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আদালতে উত্থাপন করতে পারে। 'গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণও এই ধরনের অভিযোগ জানতে পারেন। আদালতের সিদ্ধান্ত মানা বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপীল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। আদালত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে এবং নির্দেশ না মানলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থা করতে পারে। বিরোধ মীমাংসার পর্যায়ে আদালত বিভিন্ন চুক্তি এবং আইনের অস্পষ্ট বিষয়গুলির ব্যাখ্যা এবং এগুলির ভবিষ্যৎ রূপায়ণ সম্পর্কে নির্দেশিকা দেয়। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলিকে সমানভাবে রূপায়িত করার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে ইউরোপীয় আদালত ইউরোপে সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে।

২.৪.৫ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আপেক্ষিক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ আরো প্রতিষ্ঠান আছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি (The Economic and Social Committee) এবং হিসাব পরীক্ষকদের সভা (The Court of Auditors) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি হল মূলত একটি পরামর্শদাতা সংস্থা। ২২২ জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি চার বছরের জন্য মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হয়। তবে পরিষদকে এ ব্যাপারে কমিশনের সাথে পরামর্শ করতে হয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশেষত শিল্প মালিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি থেকে এই কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হন। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও যুক্তরাজ্য থেকে ২৪ জন করে, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, গ্রিস, হল্যান্ড, পর্তুগাল এবং সুইডেন থেকে ১২ জন করে, স্পেন থেকে ২১, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আয়ার্ল্যান্ড থেকে ৯ জন করে এবং লুক্সেমবার্গের ৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এটি মূলত একটি পরমর্শদাতা কমিটি, নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব প্রণয়নের সময়ে কমিশনকে এর পরামর্শ নিতে হয়।

১৯৭৭ সালে একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা হিসাবে হিসাব পরীক্ষকদের সভা স্থাপিত হয়, এই সংস্থা হল গোষ্ঠীর আর্থিক বিষয়ের নজরদার। লুক্সেমবার্গে স্থাপিত এই সভা 'গোষ্ঠী'র আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে। এর সদস্যসংখ্যা ১৫ জন। মন্ত্রীপরিষদ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি দেশ থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে এই সংস্থা গঠন করে। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছয় বছর।

কমিশনের মতোই এই সংস্থার সদস্যদের ইউরোপীয় গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করতে হয়। নিজস্ব কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এই সংস্থার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সভার আছে ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক ক্ষমতা। প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষে সভা 'গোষ্ঠী'র বাজেট সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। প্রস্তাবিত আর্থিক কর্মসূচি এবং আইন সম্পর্কে সভা এই প্রতিবেদনে তার অভিমত জানায়।

অনুশীলনী-৩

২.৫ EEC-এর প্রকৃতি-আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া—সাধারণ বাজার :

২.৫.১ EEC-এর প্রকৃতি

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এর মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নতুন নাম রাখা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)। এই গোষ্ঠীর সরকারি নাম যাইহোক এর ক্ষমতা এবং ভূমিকা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

অনেক আইনবিদের মতে এই সংগঠনের হাতে পুরোপুরি অধিজাতীয় (Supranational) ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদিও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার মাত্রা কিছুটা বেশি তা সত্ত্বেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে এর তেমন কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না। আবার অনেকের মতে EEC-এর ভূমিকা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এর সবচেয়ে বড় অবদান হল সার্বভৌমিকতাকে জাতীয় স্তর থেকে সরিয়ে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্তরে নিয়ে যাওয়া। এই দুটি ধারণার মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে ইউরোপীয় আদালতের এক প্রাক্তন সভাপতি মন্তব্য করেন যে, EEC হল "এমন একটি সংস্থা যার সৃষ্টি করা হয়েছে একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে এক হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব এবং ব্যাপক পরিমাণ সার্বভৌম ক্ষমতা। একে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত এককে পরিণত করা না হলেও এর স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বভৌমিকতার পরিমাণ যথেষ্ট"। ইউরোপীয় আদালত রোম চুক্তিকে একটি 'নয়া আইনগত ব্যবস্থা'র আখ্যা দিয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি এর আছে স্বাধীন অস্তিত্ব এবং এদের উপর এবং কার্যকালের প্রত্যক্ষ আইনগত প্রভাব আছে। সাধারণভাবে জাতীয় আইনগুলির তুলনায় 'গোষ্ঠী'র আইন অধিক প্রাধান্য লাভ করে। এইভাবে এই গোষ্ঠী'র সদস্যভুক্ত দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমিকতা নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যার পরিমাণ জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির তুলনায় অনেক বেশি।

২.৫.২ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করলে এর প্রকৃতির সত্যতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। তবে সাধারণভাবে মন্ত্রীপরিষদ এবং কমিশনের মধ্যে আলাপ-আলোচনাই এই প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরে জাতীয় এবং গোষ্ঠীগত উপাদানগুলি জড়িত থাকে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সংস্থাসমূহ, জাতীয় বা স্থানীয় স্তরের সরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্বার্থগোষ্ঠী যে কোনও মহল থেকেই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কমিশনকে 'গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রচুর পরামর্শ করতে হয়। জাতীয় আইনসভায় আইন প্রণয়নের পর্যায়েও এত পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। এর মূল লক্ষ্য হল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে একটি ব্যাপক মতৈক্য গড়ে তোলা। এই প্রস্তাবগুলিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটিতে পেশ করা হয় তাদের অভিমতের জন্য। এই সংস্থাগুলির অভিমতসমেত প্রস্তাবগুলি এরপর বিবেচিত হয় মন্ত্রীপরিষদ দ্বারা। অবশ্য এই পর্যায়ে COREPER প্রায়ই পরিষদের হয়ে কাজ করে।

রোম চুক্তি অনুযায়ী কেবল কমিশনই চুক্তির প্রস্তাবগুলিকে সংশোধনের অধিকারী। তবে বহুক্ষেত্রেই মন্ত্রীপরিষদের চাপে এই প্রস্তাবগুলি সংশোধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নমনীয় হয়েও কমিশন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার উপর তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে কমিশন যদি বেশিমাত্রায় অনমনীয় হত তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পেয়ে এর কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে হ্রাস পেত।

কমিশনের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ হল সংস্থা জাতীয় দাবিগুলির কাছে খুব তাড়াতাড়ি মাথা নত করে এবং এর ফলে 'গোষ্ঠীমনন' (Community spirit) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমালোচকদের মতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার গতি নির্ধারিত হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলির দ্বারা, কমিশনের দ্বারা নয়। ফলে চুক্তিতে যাই বলা থাক বাস্তবে প্রকৃত ভূমিকা পালন করেন রাষ্ট্রনায়কগণ। ইউরোপীয় পরিষদ (European council)-এর মত একটি সভা গোষ্ঠী'র কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

EEC এবং তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলোচনার মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়ন এই আলাপ আলোচনারই ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভূত হয়। নিম্নলিখিত তিনটি রূপের যে কোনও একটির মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যথা নিয়মনীতি (Regulation), নির্দেশিকা (Directive) এবং সিদ্ধান্ত (Decision)।

'নিয়মনীতি'গুলি সামগ্রিকভাবে, সমানভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর আরোপিত হয়। সাধারণভাবে মন্ত্রীপরিষদ এই নিয়মনীতিগুলি আরোপ করে, তবে কমিশনও এ ব্যাপারে ক্ষমতাশালী। এই নিয়মনীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করতে জাতীয় আইন সভাগুলি কর্তৃক আইন প্রণয়নের কোনও প্রয়োজন হয় না। তবে এগুলি প্রবর্তন করার আগে থেকে যে সকল জাতীয় আইন চালু হয়েছে সেগুলির সাথে এই নিয়মনীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে জাতীয় আইনগুলির সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

'নির্দেশিকা' হল অবশ্য পালনীয় বিষয়। মন্ত্রীপরিষদ বা কমিশন এগুলি জারি করতে পারে। জাতীয় আইন সভাগুলির উদ্দেশ্যেই এগুলি জারি করা হয়। এই নির্দেশাবলীতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয় এই লক্ষ্যগুলি অর্জনে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি পছন্দমত উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

'সিদ্ধান্ত' নিতে পারে মন্ত্রীপরিষদ বা কমিশন। যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তারা তা মানতে বাধ্য থাকে। জাতীয় সরকার, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রয়োজ্য। 'সিদ্ধান্ত' রূপায়িত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে নির্দেশিত সংস্থাগুলির দায়বদ্ধ থাকে।

নিয়মনীতি, নির্দেশিকা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা যায়। আদালতের নির্দেশ এবং প্রণীত আইনসমূহ রূপায়ণের ব্যাপারে সাধারণত সদস্য রাষ্ট্রগুলিই দায়বদ্ধ থাকে।

২.৫.৩ সাধারণ বাজার

আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সদস্য রাষ্ট্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলেও EEC-র প্রেক্ষাপটে তারা তাদের সম্মিলিত ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে এবং এই গোষ্ঠীকে সমবেত প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করে। এর প্রধান উদাহরণ হল শুল্ক ইউনিয়ন (Customs Union)-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়াম নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের কর ও শুল্ক বিলোপ করে। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কলেবর বৃদ্ধি করার পর (১৯৭৩) নয়টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সব বাধা দূর হয়ে যায়। বর্তমানে একটি ইউরোপীয় শুল্ক ইউনিয়ন রয়েছে এবং এর পরিধির ভিতর সর্বপ্রকার পণ্য অবাধে চলাচল করতে পারে। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বাইরের কোনও দেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যের উপর গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সর্বত্র একই হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। আবার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কৃষিপণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের আমদানীর উপর লেভি আরোপ EEC-এর অভ্যন্তরীণ বাজারটিকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

EEC-এর ভূমিকার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা। যে কোনও সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিক গোষ্ঠীভুক্ত অপর রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারে বা চাকরি করতে পারে। কোনও দেশই কর্মসংস্থান নীতিতে জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে না। তবে জনশৃঙ্খলা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করা যায়। আবার কোনও দেশ নিজের দেশের নাগরিকদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষত পেশাদার বৃত্তিজীবীদের, অবাধ গমনাগমনের ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীকে, যে দেশে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক সেই দেশের নির্ধারিত যোগ্যতামান অর্জন করতে হয়। চিকিৎসা, কোম্পানি আইন, ব্যাঙ্ক, যানবাহনের জন্য বীমাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সীমিত সাফল্য পাওয়া গেছে। সাফল্য অর্জিত হয়েছে আইন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। তবে বলা যায় যে এ বিষয়গুলিতে সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।

পুঁজির স্বাধীন চলাচলের জন্য তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক ঋণের নীতিকে উদার করতে ইউরোপীয় গোষ্ঠী নির্দেশিকা প্রদান করে। এই সংস্থা স্থাপনের প্রথম দিকেই এই নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছিল। তবে ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সদস্যদেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং রোমচুক্তির সুবিধা নিয়ে তারা পুঁজির অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। তবে চুক্তির ধারা লঙ্ঘন করলেই কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছে।

শুল্ক ইউনিয়ন (Custom union) এবং সাধারণ বাজার (Common Market) প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সাফল্যের দ্যোতক। তবে একীকরণ প্রক্রিয়ার মূল বিষয় হল কতকগুলি সাধারণ নীতি প্রণয়ন। EEC চুক্তিতেই একটি সাধারণ কৃষিনীতি এবং সাধারণ বহির্বাণিজ্য নীতির কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলি সামাজিক নীতি, যানবাহনের নীতি, অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে সাহায্যদান, শক্তি, পরিবেশ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে। এই সাধারণ নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্যসমূহ আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা সংক্রান্ত নীতিটির সাথে সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের সমস্যা ছিল চরিত্রগত দিক দিয়ে বহুজাতিক এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত এগুলির সমাধান ছিল অসম্ভব।

সাধারণ নীতি প্রণয়ন এবং এগুলির রূপায়ণই ছিল জাতীয় স্তর থেকে অধিজাতীয় সংস্থার স্তরে সার্বভৌমিকতা স্থানান্তরের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র। প্রথম যুগে ফ্রান্স এবং পরবর্তীকালে ব্রিটেন বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের সার্বভৌমিকতা বজায় রাখতে জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় স্বার্থগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা EEC-এর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বহুবারই সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও এই সংস্থা কেবল তার অস্তিত্ব রক্ষা করেনি, নিজের কার্যকলাপের ক্ষেত্রটিকেও বিস্তৃত করেছে।

অনুশীলনী-৪

২.৬ ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ :

২.৬.১ ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে বার্লিন প্রাচীরের নাটকীয় পতনের সঙ্গে প্রায় পাঁচ দশকব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর অবসান ঘটে। যে কেন্দ্রীয় উপদ্রব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে বিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বিশ্বরাজনীতিকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল যাকে 'ঠাণ্ডা লড়াই' নামে চিহ্নিত করা হয়—ইউরোপেই তার উৎপত্তি। ভাবাদর্শ ও শক্তির প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দুই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ইউরোপই ছিল তার প্রধান পটভূমি স্বভাবতই এই মহাদেশে যে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকাঠামো তৈরি হয় তা ছিল এই ঠাণ্ডা লড়াই প্রসূত মেরুকরণের এক প্রতিচ্ছবি।

এই মেরুকরণকে কেন্দ্র করে ইউরোপ দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত জোটে সামিল হয় যার প্রধান স্তম্ভ দুটি ছিল সামরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন বা ন্যাটো (NATO) ও অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC) যা এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) নামে পরিচিত। এর বিরোধী শিবির তৈরি হয় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত জোটে যাতে সামিল হয় পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলি। এই জোটের প্রধান স্তম্ভ দুটি ছিল সামরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (CMEA)।

এই পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের ওপর ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত

হত। স্বভাবতই ১৯৮৯ সালে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা সরাসরি আঘাত হানে এই পরিকাঠামোর ওপর। ১৮৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এই অঞ্চলে যে আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে তার প্রধান অঙ্গ ছিল মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে বাজার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের (Pluralism) উদ্ভব, দ্বিখণ্ডিত জার্মানির ঐক্যস্থাপন ও সবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব।

এইসব ঘটনাবলির প্রধান ফল হল চল্লিশ বৎসরের ওপর গড়ে ওঠা পূর্ব ইউরোপের সামরিক ও আর্থরাজনৈতিক পরিকাঠামোর পতন ও একধরনের শূন্যতার সৃষ্টি। গত দশ বছরে ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিকল্পে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে তা বিশেষ লক্ষণীয়। এই এক দশকের ইউরোপীয় রণনীতির প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের সাবেকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বাজার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও ন্যাটো, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ব দিকে প্রসারণ।

২.৬.২ EEC-এর সম্প্রসারণ

আগেই বলা হয়েছে যে রোম চুক্তির প্রস্তাবনায় 'ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য প্রতিষ্ঠা'র কথা বলা হয়। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাগণ মনে করেছিলেন যে, মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে এই সংগঠন তার যাত্রা শুরু করলেও তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে পশ্চিম, উত্তর, মধ্য এবং চূড়ান্তভাবে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে এর আওতাভুক্ত করা।

এই লক্ষ্যে এই সংস্থাটিকে আজ পর্যন্ত চারবার সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৭৩ সালে প্রথম সম্প্রসারণে ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং আয়ার্ল্যাণ্ড, ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় সম্প্রসারণে গ্রিস, ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল এবং ১৯৯৫ সালের প্রথমদিকে চতুর্থ এবং শেষ সম্প্রসারণে সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড এই সংস্থায় যোগ দেয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১৫।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এই সম্প্রসারণ বিগত চার দশকের ইউরোপীয় সংহতি আন্দোলনের কতকগুলি বাস্তব দিকের প্রতিফলন ঘটায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটেন এবং স্ক্যানডিনেভীয় দেশগুলি অধিজাতীয়তাবাদ (supranationalism) সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের কারণে এই সংস্থা থেকে দূরে ছিল, পরবর্তী সময়ে তারা এই সংস্থায় যোগ দেয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে এই সংস্থাকে তারা যতখানি অধিজাতীয়তাবাদী মনে করেছিল পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে এই সংস্থা ততখানি অধিজাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত নয়।

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকের প্রথমদিকে গ্রিস, স্পেন এবং পর্তুগাল একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয় এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে তাঁদের সদস্য হওয়ার পথও এর ফলে সুগম হয়। সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার এই সংস্থায় যোগ না দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি তাদের অনুসৃত নিরপেক্ষতা নীতির প্রশ্নটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে'র পরিসমাপ্তি এবং একটি সফল ইউরোপীয় সংস্থা হিসাবে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অবস্থান এই দেশগুলির মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত করে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে এর আওতায় নিয়ে এসে (অবশ্য নরওয়ে এবং সুইজারল্যাণ্ড এর সদস্য হয়নি) এই গোষ্ঠী এক নতুন যুগের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তির পর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

গত দশ বছরে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বিরাট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এই অঞ্চলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রসারণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই পরিবর্তনকে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে স্বাগত জানায় এবং এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে এই রাষ্ট্রগুলির বাজার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্যের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়ক হয় এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পাদিত ইউনিয়নের 'ইউরোপীয় চুক্তিগুলি'। এ বিষয়ে প্রথম তিনটি রাষ্ট্রকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারা হল পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র। এদের বাজার অর্থনীতির দিকে এগোতে উৎসাহিত করা হয় ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ইউনিয়নের সাহায্য দানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ইউরোপীয় কমিশনের উদ্যোগে ও ২৪টি শিল্পোন্নত দেশের সহায়তায় ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে এই কর্মসূচি চালু হয়। ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলি ও যুগোশ্লাভিয়াকেও এর আওতায় আনা হয়। পরিকাঠামো পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেগুলি ছিল কৃষি, শিল্প, বিনিয়োগ, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, প্রশিক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিষেবা। এই একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ ও অর্থনীতি, পরিকাঠামো এবং সরকারি ও শিল্প পরিচালনার (Management) ক্ষেত্রেও বিশেষ সাহায্যদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৯৯০ সালে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচি রূপায়ণে একটি আর্থিক সাহায্য দানের পরিকল্পনা শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে ২৪টি শিল্পোন্নত দেশের গোষ্ঠীর (G-24) সহায়তায় ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (European Bank for Reconstruction and development বা EBRD) গঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল এই রাষ্ট্রগুলির বাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রগমন ত্বরান্বিত করা, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগের প্রচলন, বহু দলভিত্তিক গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ও একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনে সাহায্য করা। এরপর থেকেই এই রাষ্ট্রগুলিতে মোটা অঙ্কের বিদেশি, প্রধানত ইউরোপীয়, বিনিয়োগ আসতে শুরু করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পূর্ব-মধ্য ইউরোপের দেশগুলির সহযোগিতার ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রাথমিক পর্যায়ের চুক্তিগুলির দ্বারা স্থাপিত হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের সহযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপীয় কাউন্সিল (ইউনিয়নের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা) একটি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে চুক্তি দ্বারা ইউনিয়নের অংশীদার করা হোক। এই রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি করায় এরা ইউনিয়নের অংশীদার হবার যোগ্যতা অর্জন করে। এরা প্রত্যেকেই আশাপ্রকাশ করে যে এই অংশীদারী চুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে তারা ইউনিয়নের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবে। এই চুক্তিগুলি ১৯৯১ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে সম্পাদিত হলেও কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালে কার্যকর করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এই চুক্তিগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে এগুলির মাধ্যমে যেমন এই চারটি দেশের (১লা জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়) সমস্যাবলির প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি ইউনিয়নের সদস্যদের সাবধানতার মনোভাবও পরিলক্ষিত

হয়েছে। এই চুক্তিগুলির প্রধান অঙ্গ ছিল পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন ও অংশীদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি শ্রমশিল্প সংক্রান্ত শুল্ক ও কোটাবিহীন মুক্ত-বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলা (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যথা : বোনা কাপড়)। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি থেকে ইউনিয়নের বাজারে কিছু কৃষিজাত পণ্যের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেও ইউনিয়নে কর্মপ্রার্থীদের অবাধ যাতায়াতের অধিকার দেওয়া হয়নি।

ইউনিয়নের ১৯৯৩ সালের জুন মাসে কোপেনহেগেন শীর্ষ বৈঠকে স্থির হয় যে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ভবিষ্যতে ইউনিয়নের সদস্যপদ পাবে যদিও এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা হয়নি ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড উভয়েই ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য নিয়মমাফিক আবেদন করে এই বছরের শেষ দিকে চেক প্রজাতন্ত্র ও ১৯৯৫ সালে স্লোভাকিয়া তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

ইউরোপ চুক্তি মারফত এই অঞ্চলের যেসব অন্য রাষ্ট্র পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তির আশায় এই গোষ্ঠীর সহেগ সহযোগিতার পরিকাঠামো গড়ে তোলে তাদের মধ্যে ছিল রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া। অবশ্য এই রাষ্ট্র দুটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির হার ছিল অপেক্ষাকৃত মন্থর ও এদের সমস্যাবলী ছিল আরো ব্যাপক। এর ফলে ইউনিয়নের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরের ইউনিয়নের শীর্ষ বৈঠকে এই ছটি দেশের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ইউরোপীয় চুক্তিগুলিতে এই রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তি কী করে দেওয়া সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৭ই জুন আমস্টারডাম শীর্ষ বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র সমেত ছটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সদস্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের আলোচনা শুরু হয় যা এখনও অব্যাহত আছে।

ইউরোপের ইউনিয়নের প্রধান দেশগুলি, বিশেষত জার্মানি, উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বজায় রাখতে গেলে এই দেশগুলিকেও সদস্যপদ দিতে হবে। ইউরোপীয় গোষ্ঠী পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যে দেশ গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির শর্ত পূরণ করতে পারবে তাকেই এই গোষ্ঠীর সদস্যপদ দেওয়া হবে। সমাজতন্ত্র-উত্তর মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও বর্তমানে এই শর্তপূরণ করেছে। সুতরাং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ থেকে এদের আর বঞ্চিত রাখা সম্ভব নয়।

তবে এই লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে দুটি বড় বাধা আছে। প্রথমত, ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির বিরাট ব্যবধান আছে। ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়ার আগে এই দেশগুলিকে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ন্যূনতম মান অর্জন করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত-করণের বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে ইউনিয়নও বর্তমানে নিজের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রবণতা থেকে দেখা যায় হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতি ক্রমশই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিকাঠামোর সমকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। বর্তমানে এই দেশগুলির ৬০ শতাংশ বাণিজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে হয়ে থাকে।

২.৬.৩ ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ

ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলন পাঁচ দশকের পুরানো। এই সময়কালে ইউরোপের চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের ইউরোপ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপনীত। ইউরোপীয় ইউনিয়নও আজ একটি পরিবর্তিত সত্তা। এর সদস্য সংখ্যা কেবল ৬ থেকে ১৫ হয়নি, এর কার্যকালের ক্ষেত্রও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত দশকে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারটিকে আরও শক্তিশালী করতে ১৯৮৬ সালে রোম চুক্তির সংশোধন ঘটিয়ে Single European Act প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক, পরিবেশগত এবং ফিসক্যাল নীতির ক্ষেত্রেও EEC গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে।

ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে উত্থাপিত এবং ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চালু হওয়া মাসট্রিক্ট (Maastrict) চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা ইউরোপীয় একীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকেই কেবল গুরুত্ব দেওয়া হত। এই চুক্তির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলি তিনটি মূল ভিত্তির উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নকে স্থাপন করতে রাজি হয়েছে। এগুলি হল একটি ইউরোপীয় গোষ্ঠী, একটি সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি (Common Foreign and Security Policy) এবং ন্যায় বিচার ও স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে (Home Affairs) সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা। শেষোক্ত ভিত্তি দুটি বর্তমানে সাধারণ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর প্রতিফলন ঘটে মূলত মন্ত্রীপরিষদে এবং এগুলির চরিত্র হল আন্তঃসরকারি; তবে রাজনৈতিক সহযোগিতার একটি রূপ হিসাবে তারা এখনকার ইউরোপীয় রাজনৈতিক, সহযোগিতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে 'গোষ্ঠী' প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মাসট্রিক্ট কাঠামোর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক এবং অর্থ সংক্রান্ত ইউনিয়ন (Economic and Monetary union বা-EMU)। ১৯৭২ সাল থেকেই ইউরোপে একক মুদ্রা ব্যবস্থা এবং একটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফরাসি রাষ্ট্রপতি এবং জার্মান চ্যান্সেলর এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং বিংশ শতকের মধ্যেই এর লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালানো হয়। কতগুলি শর্তপূরণ সাপেক্ষে ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এক অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা ইউরোপে চালু করা হয়েছে।

তবে এই পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হওয়ার পথে রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বাধার সংখ্যাও অনেক। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হলে পরিচিতির প্রতীক নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে হবে। ফলে অনেক অনেক দেশ এ ব্যাপারে উৎসাহী নয়। ব্রিটেন প্রথম থেকেই নিজেকে এই পরিকল্পনার বাইরে রেখেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের আগে সকল সদস্যরাষ্ট্রকে কতকগুলি প্রযুক্তিগত শর্তপূরণ করতে হয় যা অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে। যদিও মাসট্রিক্ট চুক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জার্মানিসহ কিছু সদস্যরাষ্ট্র প্রচেষ্টা চালায় তথাপি ১৫টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে কেবল ১১টি রাষ্ট্র এই একক মুদ্রাব্যবস্থায় যোগ দেয়।

ইউরোপে সংহতি প্রক্রিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। বহু বাধা সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার

সাফল্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এক সুদৃঢ় সমজাতীয় গোষ্ঠী ৬টি দেশ নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে আজ ১৫-তে পৌঁছেছে। এর কলেবর আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। তবে এর ফলে এর সমজাতীয় চরিত্র রক্ষিত নাও হতে পারে এবং এর কার্যকলাপের উপরও তার প্রভাব পড়তে পারে। এই গোষ্ঠী বর্তমানে কার্যকলাপের গভীরতা এবং সংখ্যার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা চালাচ্ছে। আকৃতি ক্ষুদ্র হলে সমন্বয়-সাধনের কাজ এবং সংগঠনের গভীরতা বৃদ্ধির কাজ সহজ হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনা সমস্যা সংকুল হয়ে পড়তে পারে। ফলে সংগঠনের মধ্যেই ছোট ছোট গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। EMU-এর রূপায়ণের ব্যাপারে এই প্রবণতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দী যতই সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে মানব জাতির সামনে ততই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে। অনেক দিক দিয়েই আজকের ইউরোপ মানবতার একটি নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মানব সভ্যতার কতকগুলি পুরনো সমস্যা (যা সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আরও দুরূহ হয়েছে) দূর করার ব্যাপারে ইউরোপের প্রচেষ্টা সমগ্র মানবজাতির উপরেই প্রভাব ফেলেছে। অদূর ভবিষ্যতে একীকরণের পথে ইউরোপের বৃহত্তর সাফল্য অন্যান্য অঞ্চলেও সমজাতীয় অগ্রগতির পথ আরও প্রশস্ত করবে।

অনুশীলনী-৫

অনুশীলনী-১ :

১। ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের বিবর্তনে আন্তঃসরকারি দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ এর প্রকৃতি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৩। অধি-জাতীয়তাবাদ কাহাকে বলে?

অনুশীলনী-২ :

১। রোমচুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল?

অনুশীলনী-৩ :

১। EEC-এর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

২। নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(ক) মন্ত্রীপরিষদ—গঠন ও কার্যাবলী।

(খ) কমিশন-গঠন ও কার্যাবলী।

(গ) ইউরোপীয় পার্লামেন্ট-গঠন ও কার্যাবলী।

(ঘ) আদালত—গঠন ও কার্যাবলী।

অনুশীলনী-৪ :

১। EEC-এর মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। EEC-এর Custom Union-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৪। EEC-এর সাধারণ নীতি বলতে কি বোঝায়?

অনুশীলনী-৫ :

১। ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান বলতে কী বোঝায়?

২। EEC-এর সম্প্রসারণ কতবার ঘটছে? সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

৩। EEC-এর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ভূমিকা কী?

৪। ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ কী?

২.৭ ❑ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রমুখ পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগুলির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং এইসব দেশগুলির চিন্তাশীল রাজনীতিবিদ্‌দের মননশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলশ্রুতি হিসাবে ইউরোপের ঐক্য আন্দোলনের জন্ম হয়। অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আন্তঃসরকারি ও অধিজাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে রোম চুক্তি দ্বারা ১৯৫৮ সালে ইউরোপের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা EEC-এর পত্তন হয়।

অনুপম বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত এই সংস্থার চারটি প্রধান অঙ্গ আছে যথা মন্ত্রীপরিষদ, কমিশন পার্লামেন্ট ও আদালত। রোমচুক্তি অনুযায়ী কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকার নীতি প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা সদস্য রাষ্ট্রগুলি ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সমর্পণ করে। এর ফলে গোষ্ঠীর স্তরে যে নীতি প্রণীত হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলি তা মানতে বাধ্য থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল অঙ্গ হিসাবে একটি সাধারণ বাজারের পত্তন হয়েছে যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানুষ, স্ব-নিযুক্ত পেশাদার বৃত্তিজীবী, পণ্য ও পুঁজির গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ভিতর অবাধ চলাচলের অধিকার। এছাড়া একীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম বিষয় হল কতকগুলি সাধারণ নীতি প্রণয়ন। এই নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতার মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের সমস্যাগুলির বহুজাতিক ও সমষ্টিগত সমাধান।

১৯৮৯ সালে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানের ফলে ইউরোপীয় ঐক্য আন্দোলনের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। গোষ্ঠীর অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্য একে ইতোমধ্যেই অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা প্রাথমিক ৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-এ ১৫-তে দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তির পর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এই অঞ্চলের সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সদস্যপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ইউরোপে সংহতি প্রক্রিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। এক সুদৃঢ় সমজাতীয় গোষ্ঠী ৬টি দেশ নিয়ে যাত্রা করে আজ ১৫-তে পৌঁছেছে এবং এর কলেবর আরো বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। আজকের ইউরোপ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপনীত। আগামী দিনে এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গোষ্ঠীর সমজাতীয় চরিত্র ও সমন্বয় বজায় রাখা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (এর বর্তমান নাম) সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

২.৮ ☐ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী-১ :

১। ২.২ অংশ দেখুন।

২। ২.২ অংশ দেখুন।

৩। ২.২ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-২ :

১। ২.৩ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-৩ :

১। ২.৪ অংশ দেখুন।

২। ২.৪ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-৪ :

১। ২.৫.১ অংশ দেখুন।

২। ২.৫.২ অংশ দেখুন।

৩। ২.৫.৩ অংশ দেখুন।

৪। ২.৫.৪ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-৫ :

১। ২.৬.১ অংশ দেখুন।

২। ২.৬.২ অংশ দেখুন।

৩। ২.৬.৩ অংশ দেখুন।

৪। ২.৬.৪ অংশ দেখুন।

২.৯ ❑ গ্রন্থপঞ্জি

1. Desmond Dinan, Ever Closer Union : An Introduction to the European Community (Macmillan, London, 1994).
2. Clive Archer and Fiona Butler, The European Union : Structure and process (Pinter, London, 1996)
3. Neil Nugent, The Government and Politics of the European Union, (Macmillan, Basingstoke, 1994).
4. Paul Taylor, The European Union in the 1990. (Oxford University Press, 1996).
5. Christopher Bright, The Eu : Understanding the Brussels process (Chichester, Wiley, 1995).

একক ৩ □ উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের বিস্তার

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ উত্তর-দক্ষিণ প্রেক্ষাপট
৩.৩ ঐতিহাসিক পরিক্রমা
৩.৪ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা
৩.৫ উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের বিস্তার
৩.৬ উত্তর-দক্ষিণ বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা
৩.৭ উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার গুরুত্ব
৩.৭.১ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন
৩.৭.২ UNCTAD
৩.৭.৩ সাধারণ পরিষদ
৩.৭.৪ নতুন উদ্যোগ, ব্রান্ট কমিশন
৩.৭.৫ কানকুন শীর্ষ বৈঠক
৩.৮ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ অনুশীলনী
৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ □ উদ্দেশ্য

এই এককে উত্তর-দক্ষিণের বিবাদের বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে যাতে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে যে চিরাচরিত ব্যবধান আছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা করা যায়। এই একক পাঠ করার পর জানা যাবে :

১. কেন বিষয়টিকে উত্তর-দক্ষিণ বিতর্ক বলা হয়।

২. বর্তমান উত্তর-দক্ষিণ ভেদ রেখার ঐতিহাসিক কারণ কি?

৩. দক্ষিণের বর্তমান সমস্যা এবং উত্তরের দ্বারা পূর্বাপর তাদের শোষণ।

৪. বিশ্বের মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থে আন্তরাষ্ট্রীয় আলোচনার গুরুত্ব।

৩.১ ❑ প্রস্তাবনা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেটি বিভিন্ন কারণে বহুভাবে বিভক্ত। বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ ভৌগোলিক ভাবে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া এক একটি দেশ, জাতি, ভাষা, কৃষ্টি ও আদর্শগতভাবে পরস্পরের থেকে ভিন্ন। কিন্তু বিভাজনের আরও একটি প্রধান কারণ হল ধনী ও নির্ধনের বিস্তর ব্যবধান। অর্থনীতিক পার্থক্য অন্য সব প্রভেদকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক মানব সমাজ গঠিত হয়েছে উত্তরের কিছু সংখ্যক ধনী দেশ এবং দক্ষিণের বহু সংখ্যক দরিদ্র দেশের দ্বারা, যাদের বলা হয় অনুন্নত রাষ্ট্র। দক্ষিণী রাষ্ট্রের অধিবাসী বেশির ভাগই শোষিত ও বঞ্চিত। তাদের মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ জীবন ধারণের ন্যূনতম উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম, কিন্তু অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক জনতা নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের অভাবে পীড়িত।

উত্তর ও দক্ষিণ দেশের অবস্থার পার্থক্যের অবশ্য এখানেই ইতি নয়। দক্ষিণের দেশগুলি অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের তুলনায় তারা ব্যবহারিক শক্তিতেও দুর্বল। ফলে রাজনীতিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক সব বিষয়ে শক্তিধর উত্তরের দেশের কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে তারা বাধ্য হয়। এর জন্য দায়ী কে? দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলোর এমন কি চরিত্রগত ত্রুটি আছে যার জন্য ওরা দুর্বল, হতদরিদ্র। অথবা এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক কারণ আছে? এই এককে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।

৩.২ ❑ উত্তর-দক্ষিণের প্রেক্ষাপট

উত্তর-দক্ষিণ বলতে কি বোঝায় সর্বপ্রথম সেটি জানা দরকার। আমরা জানি বিষুবরেখাকে মাঝখানে রেখে পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণ দুই গোলার্ধে বিভক্ত। ঘটনাচক্রে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি বেশির ভাগ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির বেশিরভাগ দক্ষিণ গোলার্ধে। তাই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলি 'উত্তরের' প্রতিনিধিত্ব করে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি 'দক্ষিণের' অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড শিল্পসমৃদ্ধ ধনী দেশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। জাপান শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় তাকেও এই উত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। অপরদিকে সৌদি আরব, কুয়েত, দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত, কিন্তু ভূগর্ভস্থ তেলের দৌলতে তাদের অর্থনীতিক অবস্থা অনেক উত্তরের দেশের চেয়েও ভাল। উত্তরের তুলনায় দক্ষিণের দেশে অধিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এদিকে যেমন ধনী তেল রপ্তানিকারী OPEC ভুক্ত দেশগুলি আছে, তেমনি আবার বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মত নামমাত্র শিল্পাঞ্চল দেশও আছে। কুয়েত ও সৌদি আরবের মত দেশ, যারা ধনী হয়েও অনুন্নত প্রযুক্তির জন্য তাদের অর্থকে শক্তিতে পরিণত করতে পারেনি বলে তারা দক্ষিণের উন্নয়নশীল অর্থনীতির এলাকাভুক্ত বলে গণ্য। চীন ও ভারতবর্ষ শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বিশাল জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত হওয়ার ফলে শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হওয়ায় 'দক্ষিণ' এর অংশ রূপে গণ্য। তাই সম্পূর্ণ সমধর্মী একক গুণবিশিষ্ট না হয়ে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' ব্যাপক অর্থে ধনী ও দরিদ্র, উন্নত ও উন্নতিশীল নামে পরিচিত হয়েছে।

সুতরাং মূলত একটি ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিতে থাকা সত্ত্বেও "উত্তর" ও "দক্ষিণ" শব্দ দুটি একদিকে ধনী শিল্পে উন্নত দেশ এবং অপরদিকে দরিদ্রতর, শিল্পে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতিক ভেদরেখা বোঝায়।

৩.৩ ❑ ঐতিহাসিক পরিক্রমা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র দেশের এই ভেদরেখা খুব বেশিদিনের পুরনো ব্যাপার নয়। প্রায় ২০০ বছর আগে পাশ্চাত্য দেশে যখন শিল্প বিপ্লব হয়, ধীরে ধীরে বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে এবং ক্রমশ পুরো দক্ষিণের দেশগুলি অর্থাৎ যাকে "তৃতীয় বিশ্ব" বলা হয়, সেগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে আসতে থাকে।

এইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনতিবিলম্বে নব অধিকৃত উপনিবেশগুলির উপর তাদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে শোষণ চালায় ও তাদের সম্পদ অপরহণ করতে শুরু করে। এইসব ঔপনিবেশিক শক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। শাসক দেশের শিল্পের প্রয়োজনে উপনিবেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ করা হত এবং বল প্রয়োগ করে সেখানকার শ্রমিকদের শোষণ করা হত। সেই সঙ্গে তাদের দেশে উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী বেশি দামে উপনিবেশের বাজারে বিক্রি করা হত। এই ভাবে উপনিবেশগুলি শাসক দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতো। এতে করে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দিনে দিনে তাদের সম্পদ বাড়িয়ে তুলছিল, অপরদিকে উপনিবেশগুলি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল, তাদের অর্থনীতির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। উপনিবেশবাদ উত্তরের দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছিল সেই সঙ্গে দক্ষিণের দেশগুলিকে শুধু কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে ব্যবহার করে তাদের আর্থনীতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে অনুন্নতিকে চিরস্থায়ী করে তুলছিল।

পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এইসব শোষিত দেশে সাম্রাজ্যবিরোধী জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। কিন্তু সেটা কি ধরনের স্বাধীনতা? সাধারণভাবে বলা যায় সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর শোষণ ও বঞ্চনায় তাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছিল। সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার ছিল জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নত করা এবং স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থবহ করে তোলার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন এবং দক্ষ প্রযুক্তি আয়ত্তে ছিল না। তাই মূলধন ও উন্নত প্রযুক্তির জন্য উত্তরের শিল্প সমৃদ্ধ ধনী দেশগুলির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এই দুর্বলতার সুযোগে ধনী দেশগুলি নতুন করে এবং আরও সূক্ষ্মভাবে দরিদ্র দেশগুলিকে শোষণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। পুরনো সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে শুরু হয় এক নতুন সাম্রাজ্যবাদ। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদে 'উত্তর' তার ব্যবসার স্বার্থে 'দক্ষিণের' উপর নিজস্ব শর্ত আরোপ করতে থাকে। নয়া সাম্রাজ্যবাদের মোদ্দা ফল হল দক্ষিণ দেশগুলির অর্থনীতিকে চিরস্থায়ীভাবে অনুন্নতির দিকে ঠেলে দেওয়া।

দক্ষিণের দেশের অর্থনীতির অবনতির জন্য যে উত্তরের দেশগুলিই দায়ী সেকথা আর বলা অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এক অভিশপ্ত গোলক ধাঁধার সম্মুখীন। তাদের ঔপনিবেশিক অতীত, তাদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং স্থবির অর্থনীতির জন্য দায়ী। আবার বর্তমানে তারা অর্থনীতিতে যে স্বাবলম্বী হতে পারছে না, তার কারণও তাদের অতীত। যতদিন তারা নিজেদের উন্নতি করতে না পারছে, ততদিন উত্তরের ধনী দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঋণদাতা ও দেনাদার হয়ে থাকতে হবে। যতদিন পর্যন্ত 'উত্তর' দরিদ্রতর দক্ষিণের

সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে রাজী না হচ্ছে, ততদিন 'দক্ষিণের' পক্ষে উন্নতি শুধুমাত্র এক অপূর্ব বাসনা হয়ে থাকবে। এভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে এর তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়।

৩.৪ ❑ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা

আর্থনীতিক দুর্বলতা ও আভ্যন্তরীণ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের সাব্যস্ত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবাদের বিরুদ্ধে (racism) বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই এক সময় কোন না কোন বৃহৎ শক্তির উপনিবেশ ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের কুফল সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাই সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ও অন্যত্র তারা অহরহ এই ব্যবস্থা অবসানের জন্য প্রচার চালিয়ে এসেছে। এতদিন পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ প্রচার করেছিল যে জাতীয়তাবাদ বিশেষ কোন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ফলে বিশ্ব জনমনে এক গণচেতনা গড়ে উঠেছে যে জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এক আন্তর্জাতিক সমস্যা।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সবধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সেসব দেশকে সাহায্য করেছে। ইদানীংকালে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামিবিয়ার জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। ওরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও পূর্বতন উপনিবেশগুলির মধ্যেকার অসম চুক্তি ও বোঝাপড়ার শর্তগুলি নাকচ করতে কৃতকার্য হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেছে এবং বিদেশি সৈন্যদের অপসারণের ব্যাপারে বহুলাংশে সফল হয়েছে।

তৃতীয়ত, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের উপর শক্তিধর দেশের শোষণের অবসান ঘটাতে এবং সমতার ভিত্তিতে আর্থিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে তারা সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ তাদের সীমানার অন্তর্গত বিদেশি সম্পত্তি জাতীয়করণ করেছে। তাদের দাবিমত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে এক অধিকার সনদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের আর্থনীতিক অধিকার রক্ষায় অনেকটা সহায়তা হয়েছে।

চতুর্থত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বৃহৎ ক্ষমতা গোষ্ঠীর দলভুক্ত না হয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রয়োজনে উভয় ক্ষমতা কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য তবু বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকেন্দ্রের মধ্যে অশান্তির আশঙ্কা উপশমে তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আত্মরক্ষার বাইরে অন্যকোন যুদ্ধ কাজে অংশগ্রহণ না করা এবং সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে তারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

পঞ্চমত রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও তার বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সামাজিক, রাজনীতিক

ও আর্থনীতিক সমস্যা, সমাধানের দাবি করেছে এবং এভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে চলেছে। তাদের আনুগত্য ও আস্থাজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুকূলে বিশ্বজনমত গঠন করতে সাহায্য করেছে।

ষষ্ঠত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নতুন আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য, মুদ্রা ও আর্থনীতিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য তারা সমস্বরে দাবি জানিয়ে এসেছে এবং তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৭৪ সালে নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়েছে। নিজের দেশে জাতিগঠন, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আবির্ভাবের পর থেকে তারা এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং যতদিন যাচ্ছে এই প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৫ ❑ উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের বিস্তার

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ককে সঙ্গতভাবেই অসম সম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করা যায় যেখানে 'উত্তর' অবিসম্বাদিতভাবে এক কর্তৃত্বমূলক অবস্থা ভোগ করে। অবশ্য উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ এক বহুমুখী সমস্যা, তাই এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এর পর্যালোচনা করা দরকার। এর জন্য বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যথার্থ সব দিক দিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রধান বিশেষত্ব হল উত্তর-দক্ষিণের বিভাজন রেখা। এই বিভাজন রেখাই উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের আর্থনীতিক উন্নতি, সামরিক সামর্থ্য এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির মাত্রায় পার্থক্য সূচীত করে। সারা বিশ্বের শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ উত্তরে বাস করে, অথচ বিশ্বের মোট সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ তাদের দখলে। নিচের তালিকা থেকে এই বৈষম্য স্পষ্ট বোঝা যাবে।

	উন্নতদেশ	উন্নয়নশীল দেশ
জনসংখ্যা	১.১ বিলিয়ন	৩.৪ বিলিয়ন
মাথা পিছু জাতীয় আয়	৬৪০৮ ডলার	৫৯৭ ডলার
শিক্ষার হার	৯৯%	৫২%
মাথা পিছু শিক্ষা খাতে ব্যয়	২৮৬ ডলার	১৮ ডলার
মাথা পিছু বছরে প্রতিরক্ষা ব্যয়	৩০০ ডলার	২৯ ডলার
মাথাপিছু জনস্বাস্থ্য ব্যয়	১৯৯ ডলার	৬.৫০ ডলার

শুধু সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে উত্তর-দক্ষিণের বৈষম্যের প্রকৃত চেহারা বোঝা সম্ভব নয়। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ সম্পর্কের আড়ালে উত্তরের উন্নত দেশগুলি দক্ষিণের উন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ ও আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দরিদ্র দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার নাম করে তাদের আভ্যন্তরীণ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উত্তরের দেশগুলির স্বার্থ সম্বলিত নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটি দরিদ্রদেশের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপের সামিল। দক্ষিণের দেশগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ ধরনের "নব সাম্রাজ্যবাদের"

(new-imperialism) শিকার হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারত যখন IMF এর কাছ থেকে ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের প্রথম ভাগে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করছিল, সেই সময় ভারতের অর্থনীতির মূল ধারা পরিবর্তন করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ভারতের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার দ্বারা ভারতে "সুপার-৩০১" আইন প্রয়োগের ভীতি-প্রদর্শন সেই একই রকম দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত UNESCO (The United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) ইত্যাদির মত বহুজাতিক সংস্থাগুলি, যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ "এক জাতির একটি ভোট" এই নীতিতে কাজ হয়, সেখানে সংখ্যালঘু উত্তরের দেশগুলি সংখ্যার দিকে সুবিধা করতে না পেরে রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে তারা একত্রে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক রাখতে রাজি নয়। তাই মাঝে মাঝেই এইসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে তাদের দেয় অর্থের ভাগ তারা প্রচুর পরিমাণে কমিয়ে দেবার ভীতিপ্রদর্শন করে।

তৃতীয়ত দক্ষিণের কোন দেশকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে যখন কোন ঋণ বা অনুদান দেওয়া হয়, তখন গ্রহিতা দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় না রেখে বরং উত্তমর্ণ দেশের সুপরিকল্পিত স্বার্থের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়ে পাকিস্তানকে দেওয়া আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়ে থাকে। কিন্তু সেটা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়, বরং ওই অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির সংরক্ষণের স্বার্থে। অপরদিকে ভারতের মত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ, যারা আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি হতে চায় না, তাদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি বা সামরিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ যোগান দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিরও বৃহৎ শক্তিবর্গের একাধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্পষ্ট মেরুকরণ করার মতো একাধিক কারণ আছে। তবু প্রধান কারণটি যে আর্থনীতিক এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বুঝতে পেরেছে বর্তমান সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেননা উন্নত দেশগুলি কিছুতেই তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দিতে রাজি নয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত সংস্থাগুলিতে তাদেরই প্রাধান্য বিরাজমান। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এক নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার জন্য সমস্বরে দাবি জানাচ্ছে।

৩.৬ ❑ উত্তর-দক্ষিণ বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বের এককে আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ব্যবস্থার সাবেক কাঠামো কেবলমাত্র উত্তরের দেশগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছিল এবং বৃহত্তর বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছিল। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত রাষ্ট্রের সমতার ভিত্তিতে এক নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার New

1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
2. United Nations Conference on Trade and Development.
3. United Nations Industrial Development Organisation.

Internationalk Economic Order (NIEO) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল এবং এর জন্য আবশ্যক ছিল অর্থনীতি বিষয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্য উত্তর-দক্ষিণের বিশেষ বৈঠক।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভ আছে। একটি হল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার International Monetary Fund (IMF)। দ্বিতীয়টি হল পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) যাকে সাধারণ ভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) বলা হয়, এবং তৃতীয়টি হল শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তি General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) যেগুলি সৃষ্টি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউডস শহরে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে। ব্রেটনউডসের ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে একটি পশ্চিমী ব্যবস্থা, কেননা সেই সময় উন্নয়শীল দেশের বেশির ভাগই ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রেটনউডস ব্যবস্থার অংশীদার হতে চায়নি। তারা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে নিয়ে নিজস্ব এক আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যা Council for Mutual Economic Assistance যা COMECON নামে খ্যাত। কেবলমাত্র ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ এবং ব্যতিক্রম হিসেবে, ভারতবর্ষ, ব্রেটনউডের চুক্তিতে সামিল হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়নের বিষয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গঠিত ব্রেটনউডের অর্থ যোগানের প্রতিষ্ঠানগুলি সচেতনভাবে পশ্চিমী দেশের স্বার্থ সংরক্ষণকেই আদর্শ মনে করে কাজ করতে থাকে এবং মোটামুটিভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। কোন দেশের লেনদেনের ঘাটতি (balance of payments) মেটাবার জন্য স্বল্পকালীন ঋণদানের উদ্দেশ্যে IMF যে গঠিত হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধু আমেরিকার মতো ধনী দেশের ওপরই ন্যস্ত ছিল, যারা IMF এর ভাণ্ডারে বেশি অর্থের যোগান দিত, এবং তাদের যোগান দেওয়া অর্থের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের ভোটের মূল্য স্থির করা হত। উন্নয়নশীল দেশকে ঋণ দেবার জন্য IMF এর সিদ্ধান্ত নেবার সময় ভোটের এই অসম মূল্য অনতিবিলম্বে বৃহৎ শক্তির ভেটো (Veto) ক্ষমতা হিসাবে দেখা দিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ভোটাধিকারের ব্যাপারে খুবই কম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে IMF এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তাছাড়া IMF থেকে বেশি অঙ্কের ঋণ নিতে গেলে গ্রহীতা দেশের উপর কিছু শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হত। এই সব শর্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের নামান্তর। ১৯৮০-র দশকের প্রথমে এবং আবার ১৯৯১ সালে ভারত যখন ঋণ নিতে গিয়েছিল, তখন IMF এর আরোপিত পূর্ব শর্ত নিয়ে দেশ জুড়ে প্রচণ্ড হট্টগোল হয়েছিল। সেই সব শর্তের উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থনীতির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং উদারীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে 'উত্তরের' বহুজাতিক সংস্থাগুলির অর্থলগ্নির পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু এই নীতি ঋণগ্রহণকারী দেশের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, কেননা পুঁজিবাদী পথে না গিয়ে তারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ভারসাম্য বিশিষ্ট নীতি গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করে।

সেইরকম ভাবে IBRD অথবা বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন উন্নয়মূলক পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবার কথা। সেখানেও তারা সেই পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ততা ও বিশুদ্ধতা যাচাই করে দেখে তবেই ঋণ দেওয়া যায় কিনা স্থির করবে। অর্থাৎ এখানেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার সেই সব ধনী দেশের হাতেই থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু বিশ্বব্যাঙ্কও ঋণগ্রহণকারী দেশগুলিকে মুক্ত বাজার নীতি গ্রহণে উৎসাহ যোগায় যাতে

ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নি করা যায়। সহজ কথায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার IMF ও বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ দানে নীট ফল দুটি প্রথমত : ঘাটতি দেশের ব্যষ্টিগত (macro) অর্থনীতিকে প্রভাবিত করা, এবং দ্বিতীয়ত, বিশেষ ধরনের উন্নয়নের ব্যাপারে (বেসরকারি, মুক্তবাজার) তাদের পক্ষপাতিত্ব।

১৯৭০-এর দশকে ব্রেটনউডের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। আমেরিকা তার মুদ্রা ডলারকে সোনায় পরিবর্তিত করতে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ডলারের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক ছেদ করে। এতে করে ডলার—সোনা যোগসূত্র ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু মুদ্রাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষপাতিত্ব নীতির পরিবর্তন হয় না।

এমন এক ধারণা থেকে GATT এর উৎপত্তি হয়েছিল যে, যেহেতু IMF ও বিশ্বব্যাঙ্ক বাণিজ্য দ্রব্য সমস্যার বিষয়ে নজরদারী করে না, সুতরাং এই বিষয়টি দেখার জন্য একটি নতুন প্রতিষ্ঠান দরকার। তাই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে GATT এর আবির্ভাব হয়। GATT চুক্তি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (Preference) নীতি বাতিল করে সুবিধা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে সমতা আনতে চেয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগ হবার কথা কিন্তু ওসব দেশ যতটা গ্রহণ করে ততটা ফিরিয়ে দেবার মত অবস্থায় এখনো পৌঁছয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা গেল যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা কতটা বৈষম্যমূলক এবং তাই যতশীঘ্র এর পরিবর্তন করা যায় ততই মঙ্গল। "উত্তর-দক্ষিণ" আলোচনার এটাই হল প্রধান বিষয়।

৩.৭ ☐ উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার গুরুত্ব

৩.৭.১ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন

নতুন স্বাধীন হওয়া উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণ মিলনক্ষেত্র হল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) এবং সেখানেই প্রথম উত্তর-দক্ষিণ সমস্যাগুলি আলোচনা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি সহজে ভুলবার নয়। তাই ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশ্ব থেকে উপনিবেশবাদ অবসানের জন্য লড়াই করেছিল। তারপর ১৯৬০ সালের পর উপনিবেশবাদ যখন শেষ হওয়ার মুখে, Non Aligned Movement (NAM) তখন বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক বৈষম্যের প্রতি নজর দিতে শুরু করে।

NAM এর প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৯৬০ সালে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড শহরে। তারা সেই সময় সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবাদের (racism) বিরুদ্ধে আলোচনায় সরব হয়েছিল, সেই সঙ্গে দীর্ঘ শোষণের ফলে সৃষ্টি হওয়া আর্থনীতিক অসাম্য দূর করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। NAM এর দ্বিতীয় সম্মেলন বসে কায়রোতে ১৯৬৪ সালে এবং সেটাও মূলত রাজনৈতিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল ১৯৭০ সালে লুসাকায় অনুষ্ঠিত NAM এর তৃতীয় সম্মেলনে তাদের আর্থনীতিক চিন্তাধারার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। এখানেই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেকার বিশাল আর্থনীতিক বৈষম্যের বিষয়ে নতুন করে সচেতনতা গড়ে ওঠে। সদস্যরা একযোগে ঘোষণা করেন যে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেকার ব্যবধান দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবার ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আশঙ্কা হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্য থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশীদারিত্ব ১৯৫০ সালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ১৯৬৯-এ এক ষষ্ঠমাংশতে কমে যায় এবং মোট জাতীয় লভ্যাংশের নামে উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত দেশে মুদ্রার প্রবাহ হ্রাস পায় এবং অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত

দেশগুলিতে মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ওখানে ঘোষণা করা হয়, "উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য এবং সম্পদশালী দেশের ওপর তাদের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বর্তমান বিশ্বের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।" প্রযুক্তিগত উপনিবেশবাদ অবিলম্বে সমাপ্ত করার আহ্বান জানানো হয়। সেখানে প্রস্তাব করা হয় যাতে মারণাস্ত্রের উৎপাদন থেকে সরে এসে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের কর্মসূচিতে অধিক পরিমাণে অর্থলগ্নি করা হয়। বিশ্বের আর্থনীতিক ব্যবস্থার দ্রুত রূপান্তরের জন্য বিশেষ করে বাণিজ্য মুদ্রা ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে আরও দাবি জানানো হয় উন্নত রাষ্ট্র থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে তাদের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থলগ্নি বাড়াতে হবে এবং এই পুঁজির শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারি উৎস থেকে আসতে হবে। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিকগণ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা তৃণমূলস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং "গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ৭৭ রাষ্ট্র সমবায়" এর সংহতি যাতে আরও জোরদার হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাদের চাপ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে বলা হয়।

অর্থনীতির পরিস্থিতির উপর NAM এর এই ধরনের গুরুত্ব আরোপ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ারস্ শহরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনেও অব্যাহত থাকে। এখানে এই দুই বিশ্বের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক ব্যবধান সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তুলে ধরা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করা হয় যে, উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে "ব্রেটনউডসে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক উন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষা করেছে। তাই এর আমূল পরিবর্তন দরকার। বহুজাতিক সংস্থার Multinational Corporation (MNC) ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে ওরা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের নীতিকে সংহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭৬ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনেও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি মুখ্য বিষয় ছিল। তাদের অর্থনৈতিক ঘোষণা পত্রে বলা হয় যে, "উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সবরকম ভীতি ও বিরোধের আশঙ্কাজনক উৎস।" আরও বলা হয়, "বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না এবং শোষিত দেশগুলোতে চাপিয়ে দেওয়া দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও অন্যসব সামাজিক ব্যাধিকে দূর করার গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে না।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, "আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন এবং নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে তবেই উন্নয়নশীল দেশগুলি এক ঈপ্সিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।"

১৯৭৯ সালে হাভানায় অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনেও সমসাময়িক বিশ্বে বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিষয় উল্লেখ করা হয় এবং NIEO (নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা) গড়ে তোলার বিলম্বকে দোষারোপ করা হয়।

১৯৮৩ সালে নয়াদিল্লী NAM সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রতিকার হিসাবে "উত্তর-দক্ষিণ" সহযোগিতার উল্লেখ করে বলা হয় যে নতুন আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রতি উত্তরের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ১৯৮৬ সালে হাভানায় অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনেও ঘনিয়ে ওঠা আর্থনীতিক সঙ্কটের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং NIEO-র পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার অচলাবস্থার জন্য উন্নত দেশগুলিকে দোষারোপ করে "দক্ষিণ-দক্ষিণ" সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের বেলগ্রেড NAM শীর্ষ সম্মেলনেও বিশ্বে ঘনীভূত অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং সঙ্কট

মোচনের জন্য আশু ব্যবস্থা নেবার আহ্বান করা হয়। মুদ্রা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কায়েমী স্বার্থমুক্ত করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়, সেই সঙ্গে "উত্তর" থেকে "দক্ষিণে" আরও উদারভাবে মূলধন জোগানের জন্য আশা পোষণ করা হয়।

৩.৭.২ United Nations Conference on Trade and Develompent (UNCTAD)

উত্তর দক্ষিণ সমস্যা আলোচনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল এই বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের সম্মেলন। উত্তর দক্ষিণের বাণিজ্য ও উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলি প্রথম দিকে এই সভায় যোগদানে আপত্তি করলেও পরে তারা সম্মত হয়। UNCTAD এর আলোচনা সভায় শক্তিশালী উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমানভাবে দরকষাকষি করার সুবিধার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি "৭৭-এর গোষ্ঠী" (Group of 77) নামে এক গোষ্ঠী তৈরি করে। যদিও এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১২৬ হয়েছে তবু পূর্বের G-77 নামেই এই গোষ্ঠী পরিচিত। প্রথমে UNCTAD কিছু কিছু রাষ্ট্র বাছাই করে উন্নয়ন খাতে সাহায্য দেবার নীতি মেনে চলতো, পরে অগ্রাধিকারের সাধারণীকরণ নীতি অনুসরণ করা হতে থাকে। কিন্তু ক্রমশ UNCTAD এর অধিবেশনে উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধান বাড়তে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নীতিগুলির প্রতি উন্নত দেশগুলির অনাগ্রহ UNCTAD-কে ক্রমশ দুর্বল সংস্থায় পরিণত করেছে।

৩.৭.৩ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির বক্তব্য তুলে ধরার উপযুক্ত মঞ্চ হল সাধারণ পরিষদ। সেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার সুবাদে তারা তাদের সমস্যা এবং বর্তমানের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিকাঠামো পরিবর্তনের জন্য দাবি উত্থাপন করতে পারে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আগে পর্যন্ত NIEO-র দাবি সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হয়নি। ১৯৭৩ সালে OPEC[1] দেশগুলিতে তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণের ফল অংশত কার্যকরী হয়েছিল এবং উত্তরের ধনী দেশের দক্ষিণের যুক্তির প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল হতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ১৯৭৩ সালে আলজিয়ারস NAM সম্মেলনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে NIEO-র জন্য একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছিল। তার ফলে সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠতম বিশেষ অধিবেশনে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের মধ্যে ব্যবধান কমাবার জন্য এক নতুন আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, অসাম্য দূরীকরণ, অন্যায়ের প্রতিকার, উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের মধ্যেকার বিরাট ব্যবধান দূর করা, সেই সঙ্গে আর্থনীতিক, সামাজিক উন্নতি সুনিশ্চিত করা ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। অপর এক প্রস্তাবে NIEO প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ পরিষদ এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচিতে বাণিজ্য, সম্পদ, প্রযুক্তি বিদ্যার হস্তান্তর, অর্থসাহায্য এবং মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার সাধন, যেগুলি উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ, সে সব বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ ও সাম্যবাদী করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের আর্থনীতিক অধিকার ও কর্তব্যের স্বীকৃতিই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

1.Orgnisation of Petrolium Exporting Countries.

এভাবে ১৯৭৪ সালে বিশেষ অধিবেশনের সময় থেকে সাধারণ পরিষদ উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশের উদ্বেগের বিষয়ে মত প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ হিসাবে কাজ করে এসেছে এবং অনতিবিলম্বে NIEO-র প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে। যদিও তাদের প্রচেষ্টা পুরোটা সফল হয়নি। এখন পর্যন্ত বাণিজ্যের শর্ত ও শুল্কনীতির পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নীতির পরিবর্তন সাধন করতে উত্তরের দেশগুলি রাজি নয়। এমন কি তাদের জাতীয় লভ্যাংশের শতকরা এক ভাগ অংশ কম উন্নত দেশের উন্নয়নে ব্যয় করতেও রাজি নয়। বরং "উত্তর" এখনো নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখনো সস্তায় শ্রমিক ও কাঁচামাল ব্যবহার করার জন্য কম উন্নত দেশে তাদের আর্থনীতিক কাজকর্ম বাড়িয়ে চলেছে। এমন পরিবেশে উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার বিষয়টি বহুলাংশে একতরফা থেকে যাচ্ছে, যেখানে দক্ষিণ তাদের আর্জি জানিয়ে যাচ্ছে এবং উত্তর থাকছে মৌন। ১৯৭৫-৭৬ সালে প্যারিসের বৈঠকে দুপক্ষেরই কিছুটা আগ্রহ দেখা গিয়েছিল কিন্তু সেখানেও মানুষের আশা পূরণ হয়নি।

পূর্বে আমরা দেখেছি "উত্তর-দক্ষিণ" সমস্যাটি ১৯৫০-৬০ এর দশক থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচিত হয়ে আসছে। এই সময় দক্ষিণের যুক্তির প্রতি উত্তরের মোটামুটি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, কেননা সেই সময় উত্তরের দেশে প্রকৃতই কিছু অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উত্তরের দেশগুলি মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারির মত সমস্যার সম্মুখীন হয়। নিজেদের দেশের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে দক্ষিণের বিষয়ে উদারনীতি নেবে উত্তরের কাছে এটা আশা করা যায় না। তাই উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা সভায় তারা NIEO প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। অবশ্য ওরা চায় এসব আলোচনা বিশ্বব্যাঙ্ক, IMF এবং GATT এর সভায় হোক, কেননা সেখানে যেকোন সিদ্ধান্ত তাদের ভেটো (Veto) ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার আছে। সম্প্রতি উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা বিষয়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এবিষয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করার জন্য পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের নেতৃত্বে একটি কমিশন তৈরি করা হয়েছিল।

৩.৭.৪ নতুন উদ্যোগ : ব্রান্ট কমিশনের প্রতিবেদন

১৯৭০ সালে উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। দক্ষিণের অভিযোগ হল, উত্তর থেকে দক্ষিণের উন্নয়নের খাতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ বহু পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাণিজ্য নীতিতে বৈষম্য করা হচ্ছে। অপরদিকে উত্তরের বক্তব্য হল, দক্ষিণ এক অন্তহীন পাত্র, সেখানে যত ঢালা হয় সব তলিয়ে যায়। এর ফলে পরস্পরের আলোচনার দরজা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব এমন অবস্থায় পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের (Willy Brandt) নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে এক স্বতন্ত্র গঠন করেন। ব্রান্ট কমিশন উত্তর-দক্ষিণ সমস্যাগুলি পরীক্ষা করে ১৯৮০ সালে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন, যেটি 'উত্তর-দক্ষিণ অস্তিত্ব রক্ষার কার্যসূচি' নামে পরিচিত। এই কমিশনের প্রতিবেদন পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের মতে, উত্তর-দক্ষিণ সমস্যা যখন সর্বজনীন, তার সমাধানও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করতে হবে। তাই কমিশন 'কর্মসূচির বিশ্বায়নের' প্রস্তাব করেন।

অন্যভাবে দেখলেও এই প্রতিবেদন বিশিষ্টতার দাবিদার। কমিশনের মতে, উত্তর-দক্ষিণ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাই পরস্পরের উন্নতির মধ্যে উভয়ের স্বার্থ নিহিত।

দক্ষিণের উন্নয়নে সাহায্য করে উত্তর কিভাবে লাভবান হতে পারে সে বিষয়ে কমিশন বক্তব্য রেখেছেন। বিশ্বমানবতার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা মাথায় রেখে উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বিচার করার কথা বলেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন দক্ষিণের উন্নয়ন কিভাবে উত্তরের বেকার সমস্যা ও রপ্তানি বাণিজ্যের মন্দা দূর করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণের অর্থনীতি যদি চাঙ্গা করা যায় তবে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং উত্তরের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। তার পরিণামে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। কমিশন দেখিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জন কর্মচারির ১ জন উন্নয়নশীল দেশে তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে।

ব্রান্ট কমিশন মনে করেন দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে অবস্থিত হবার দরুন উন্নয়নশীল দেশের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার জন্য কতগুলি প্রাকৃতিক কারণ দায়ী। সেই জন্য কমিশনের পরামর্শ হল, উন্নত দেশগুলির 'দক্ষিণে' শক্তি উৎপাদন, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে অর্থলগ্নি করা উচিত। এছাড়া স্বল্প সুদে ঋণ দান, উদার ভাবে অর্থ সাহায্য এবং তেল ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য স্থায়ীকরণের জন্য তারা সুপারিশ করেন। এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উত্তর-দক্ষিণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা মনে রেখে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য ব্রান্ট কমিশনের পর স্বয়ং উইলি ব্রান্টের নেতৃত্বে আরও একটি স্বাধীন কমিশন তৈরি হয়েছিল। তারা "সাধারণ সঙ্কট : বিশ্বত্রাণে উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতা" নামে আরও একটি প্রতিবেদন পেশ করে। উত্তর-দক্ষিণের আলোচনার ধীর গতি লক্ষ করে তারা আবার আর্থনীতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং বিশ্ব আর্থনীতিক সঙ্কটকে সাধারণ সঙ্কট হিসাবে গণ্য করে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের এক অংশের আর্থনীতিক সঙ্কটে কি করে অপর অংশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৯৮০ সালের সাময়িক বিপর্যয়ের পর উন্নত দেশগুলি যে আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করেছিল, তাতে প্রথম প্রথম উন্নয়নশীল দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরবর্তী সময়ে উন্নত দেশগুলিকেই তার ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে। সহজ কথায় দক্ষিণ যদি দ্রুত উন্নতি করতে না পারে, তবে উত্তরের উন্নতির আশাও ক্ষীণ। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন, বেকারিত্ব এবং উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দূর করার জন্য কমিশন সময় ভিত্তিক কার্যসূচি গ্রহণের সুপারিশ করে। তাদের নির্দেশমত আশু উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলি হল অর্থ, বাণিজ্য, দ্রব্য সম্ভার, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি বিদ্যা। এই প্রতিবেদন নতুন করে বিশ্ব অর্থনীতির পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং পরস্পর আদান-প্রদানের ভিত্তিতে উত্তর-দক্ষিণের অর্থনীতিকে সংকট মুক্ত করার জন্য কতগুলি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রান্টের দুটি প্রস্তাবই উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কের হেরফের ঘটাতে পারেনি। এই নতুন সংস্কারবাদী চিন্তাধারায় উত্তর প্রভাবিত হয়নি।

৩.৭.৫ কানকুনের শীর্ষ বৈঠক

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি উত্তর-দক্ষিণের বোঝাপড়ার জন্য অনেকগুলি মঞ্চ ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এতসব আলোচনার পরও উত্তরের বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। তার জন্য অবশ্য দুটি কারণ দায়ী। প্রথমত এই সব মঞ্চগুলি সবই প্রায় তৃতীয় বিশ্বের মঞ্চ ছিল, তাই উত্তরের দেশ সেগুলিকে বিশেষ পছন্দ করেনি। দ্বিতীয়ত এই সব আলোচনা কূটনীতির নিচু ধাপে সম্পন্ন হয়েছিল, হয় আমলা নতুবা বিদেশ মন্ত্রীর স্তরে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের স্তরে কখনো আলোচনা হয়নি। ব্রান্টের প্রতিবেদনে তেমনই প্রস্তাব ছিল যাতে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় ও সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকরী উপায় খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ধরনের চিন্তার থেকে ১৯৮১ সালে মেক্সিকোর কানকুনে একটি শীর্ষ বৈঠক বসেছিল, যেখানে বিশ্বের ২২টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের ইচ্ছানুসারে সেখানে কোন নিয়মমাফিক আলোচ্যসূচি রাখা হয়নি। এটা ছিল রাষ্ট্রনীতির শীর্ষ নেতাদের এক অনিয়মিত আলোচনা সভা। সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থজনিত শক্তি যোগান, খাদ্য উৎপাদন, সম্পদ হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়নের ব্যাপারগুলি স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই স্বীকৃতির বাইরে কানকুন সম্মেলন অন্য কোন সাফল্য পায়নি। রাষ্ট্রপতি রেগান বাজারের ঐন্দ্রজালিক শক্তির বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার সমাধানে বাজারে শক্তি ও বেসরকারি মূলধনের উপর জোর দেন। দক্ষিণের নেতারা এই মতের বিরোধিতা করেন। তাদের মতে মুক্ত বাজারের শক্তি উন্নয়নশীল দেশের দুর্বল অর্থনীতির আরও ক্ষতিসাধন করবে। ব্রান্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় সম্পদ হস্তান্তরের প্রশ্নে উন্নত দেশগুলি কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। G-৭৭-এর দেশগুলি আশা করেছিল যে কানকুন শীর্ষসম্মেলন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনের বিশ্বজোড়া আলোচনার দরজা খুলে দেবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। বরং রেগান অর্থ যোগানের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর মতে প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান কাঠামো খুবই ফলপ্রসূ তাই এগুলির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

উত্তর-দক্ষিণের আলোচনার বিষয়ে কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। যদি এর সাফল্য কিছু থাকে তবে সেটা হল উত্তরের ধনী দেশের লোকেরা দক্ষিণের প্রতিনিধিদের কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছিলেন এই মাত্র। কানকুন থেকে বিশ্বজোড়া উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা শুভারম্ভের যে সম্ভাবনা ছিল সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

৩.৮ ☐ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা

উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা ইতিহাসে অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, এর মধ্যে অবশ্য উত্থানের চেয়ে পতনের ভাগই বেশি। বারবার বিপর্যয়ের ফলে দক্ষিণের মনে হতাশা ছেয়ে গিয়েছিল এবং ওরা ক্রমশ বুঝতে পারছিল যে উত্তরের শিল্পোন্নত দেশ থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর থেকে তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। তারা বুঝেছিল যতদিন উত্তরের তুলনায় তাদের দরাদরির শক্তি কম থাকবে, ততদিন উত্তর তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। যতদিন তারা পরনির্ভরশীল থাকবে, ততদিন তাদের ভাগ্যে বিশেষ কিছু জুটবে না। এই বোধ থেকে যে চেতনার জন্ম হল তাকে বলা যায় 'দক্ষিণের সর্বাত্মক আত্মবিশ্বাস'। এই আত্মবিশ্বাস দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে প্রকটিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যার মাধ্যমে এই সহযোগিতা বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা আছে। ব্রান্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল যে, 'আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোটবদ্ধতা অথবা অন্য ধরনের সহযোগিতা উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ করে ছোট ছোট দেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কাঠামোগত রূপান্তরের ব্যাপারে কার্যকরী নীতি হিসাবে সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখে।"

নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ যদি তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে না পারে, তবে উত্তরের কাছ থেকে কোনরকম সুবিধা আদায় করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তৃতীয় বিশ্বের প্রথম সারির দেশ ভারতবর্ষ এই লক্ষ পূরণের জন্য ১৯৮২ সালে নয়াদিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রী পর্যায়ের এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে যা 'নয়া দিল্লী আলোচনা' নামে খ্যাত। এই আলোচনা সভায় দক্ষিণের ৪৩টি রাষ্ট্র সমবেত হয়। "দক্ষিণ-দক্ষিণ" সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের বাণিজ্য বিস্তার, সম্পদ সংগ্রহ, প্রযুক্তি

হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলির পশ্চিম তীরে অনেক উদ্বৃত্ত তেলের মজুত ভাণ্ডার আছে, যা থেকে পশ্চিমের দেশগুলি প্রভূত মুনাফা অর্জন করে থাকে। এই উদ্বৃত তেলের মজুত ভাণ্ডার আছে, যা থেকে পশ্চিমের দেশগুলি প্রভূত মুনাফা অর্জন করে থাকে। এই উদ্বৃত পেট্রো-ডলার পিছিয়ে পড়া দক্ষিণের দেশগুলিতে পুনর্বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এমন কি দক্ষিণের দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে 'তৃতীয় বিশ্ব ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

কিন্তু "দক্ষিণ-দক্ষিণ" সহযোগিতার সমূহ সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল থাকুক না কেন, সেটা কখনো বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কেননা তার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার, উন্নয়নশীল দেশের নেতৃত্বের মধ্যে তা এখনো তেমন দেখা যায়নি। এখনো উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারছে না। এবং দক্ষিণের সঙ্গে নতুন করে সম্বন্ধ গড়ে তুলতেও ভরসা পাচ্ছে না। এই ধরনের চিন্তার গোঁড়ামির জন্য দক্ষিণের অবস্থার পরিবর্তন সুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে, এবং উত্তরের সঙ্গে তাদের দাতা ও গ্রহিতার সম্পর্ক থেকেই যাচ্ছে। দক্ষিণের আর ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না।

৩.৯ ❑ সারাংশ

বর্তমান সমাজে যেমন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে, তেমনি বর্তমান বিশ্বেও ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। উত্তরের দেশগুলি বস্তুতপক্ষে কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা সর্ববিষয়ে উন্নত এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভূত সম্পদের অধিকারী। দক্ষিণের দেশগুলি মূলত দরিদ্র এবং শিক্ষায়, সম্পদে পশ্চাৎপদ। উত্তর ও দক্ষিণের এমন ব্যবধান একদিনে তৈরি হয়নি। তাদের ব্যবধানের প্রাচীর ইতিহাসের সৃষ্টি। উন্নয়নশীল দক্ষিণের দেশসমূহ তাদের হতদরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন করে উত্তরের সঙ্গে সমমর্যাদার অধিকারী হতে চায়। কিন্তু উত্তরের দেশগুলি অতীতে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলে দক্ষিণের দেশগুলির উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেছিল। বর্তমানে যদিও উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে। কিন্তু তার জায়গায় এসেছে এক নতুন ধরনের উপনিবেশবাদ, যেখানে উত্তরে দেশসমূহ দক্ষিণের দেশগুলিকে ঋণ দান ও সাহায্য দানের নাম করে সূক্ষ্মভাবে শোষণ কাজ চালিয়ে যায়।

দক্ষিণের দেশসমূহ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পর তাদের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য উত্তরের দেশের সহযোগিতা যাচ্ঞা করে। এই উদ্দেশ্যে উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার সূত্রপাত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে উত্তর দক্ষিণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়নি। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলি এক নতুন আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়। এই উপলক্ষে উত্তরের দেশগুলির সমর্থন ও সহযোগিতার প্রত্যাশী হয়েও তাঁরা সফলকাম হতে পারেনি। দক্ষিণের উন্নয়নের ব্যাপারে উত্তরে দেশগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থনীতি যখন অনিশ্চিত, উন্নয়নের গতি রুদ্ধ, সেই অবস্থায় বিশ্ব শান্তিও বিঘ্নিত হতে বাধা। সেখানে উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার মধ্যে বর্তমানের সংঘাতময় পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে এক নির্ভরশীল অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়াস ছিল এই উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিশ্বশান্তি ও সার্বজনীন উন্নয়নের স্বার্থে উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হয়েও শিল্পোন্নত দেশগুলি দরিদ্র দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়ে আছে। দক্ষিণের দেশের

পক্ষেও বেশি কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না, কেননা তাদের সাধারণ অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে দক্ষিণের অনেক রাষ্ট্রই এখন পর্যন্ত অপরের সাহায্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

৩.১০ ❑ অনুশীলনী

১। "উত্তর"-"দক্ষিণ" বলতে কী বোঝেন?

২। "উত্তর"-"দক্ষিণের" মেরুকরণের পিছনে ঐতিহাসিক কারণগুলি কী কী?

৩। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রভাব কি বাড়ছে? এ বিষয়ে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৫। "নব সাম্রাজ্যবাদ" বলতে কী বোঝেন?

৬। উত্তরের দেশ কিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বুঝিয়ে বলুন।

৭। "উত্তর"-"দক্ষিণ" আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি কী কী?

৮। "উত্তর"-"দক্ষিণ" সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির ভূমিকার বিষয় বিশ্লেষণ করুন।

৯। ব্রান্ট কমিশনের মূল প্রতিবেদন ও তার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করুন।

১০। কানকুন সম্মেলন 'দক্ষিণের' প্রতি 'উত্তরের' দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল বিবরণ দিন।

১১। কানকুন সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি রেগানের বক্তব্য কি ছিল?

১২। 'দক্ষিণ'-'দক্ষিণ' সহযোগিতার সম্ভাবনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

১৩। 'দক্ষিণের' উন্নয়নের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

৩.১১ ❑ গ্রন্থপঞ্জি

১। Prakash Chander, Prem Arora/International Relations

২। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়/আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস/মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩

৩। গৌরীপদ ভট্টাচার্য/আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩

৪। প্রাণগোবিন্দ দাশ/আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লি., কলকাতা-৯

একক ৪ ❑ ১৯৭৩ সাল থেকে পশ্চিম এশিয়ার অগ্রগতি

প্রথম ভাগ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ পশ্চিম এশিয়ার ধারণা

৪.৪ বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব

৪.৫ পশ্চিম এশিয়ায় বিবাদের কারণ

৪.৬ ঐতিহাসিক পরিক্রমা ও শান্তি প্রয়াস

৪.৭ সারাংশ

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ ❑ উদ্দেশ্য

পশ্চিম এশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যও বলা হয়। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অঞ্চল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মতো তিনটি মহাদেশকে স্থলপথে যোগাযোগ করেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের উপর রাজনৈতিক দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নানাদিক থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই এই অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতা চলে এসেছে। আমরা দেখবো মরু অধ্যুষিত এই অঞ্চল বিশ্বরাজনীতিকে কিভাবে ঘোরালো করে তুলেছিল।

৪.২ ❑ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন পশ্চিম এশিয়ার সংকটের মূলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানকার অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সংকটের দুইটি মূল ধরা। প্রথমটি হল, এই অঞ্চল ঘিরে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার লড়াই, এবং দ্বিতীয়টি হল, এই অঞ্চল সংলগ্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ ইরান ও ইরাকে বাস করে। ইরাকের বসরা ও ইরানের খুররাম শহর ও তৈল শোধনাগার আবাদান এই অঞ্চলেই অবস্থিত। উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করে। বিশ্বের প্রায় সব দেশ কম বেশি তেলের জন্য এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলের অপর গুরুত্ব হল প্রাচীনকাল থেকে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে পারস্য উপসাগর। উনিশ শতক থেকেই এ অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশেরা এই অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে তৎপর হয়, অন্যদিকে অটোমান তুরস্ক ও রাশিয়া এই অঞ্চলের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজর ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪.৩ ❑ পশ্চিম এশিয়ার ধারণা

পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশের মধ্যবর্তী এশিয়া ভূখণ্ডের দেশগুলিকে "পশ্চিম এশিয়া" বলা হয়। এই অঞ্চলকে "মধ্য প্রাচ্যও" বলা হয়। পারস্য উপসাগর ঘিরে এই অঞ্চলে নিম্নলিখিত রাষ্ট্র অবস্থিত, যথা : বাহেরিন, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েত, ওমান ও কোয়েটার। এছাড়া জর্ডন, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইসরায়েল ও মিশরও এর অন্তর্ভুক্ত।

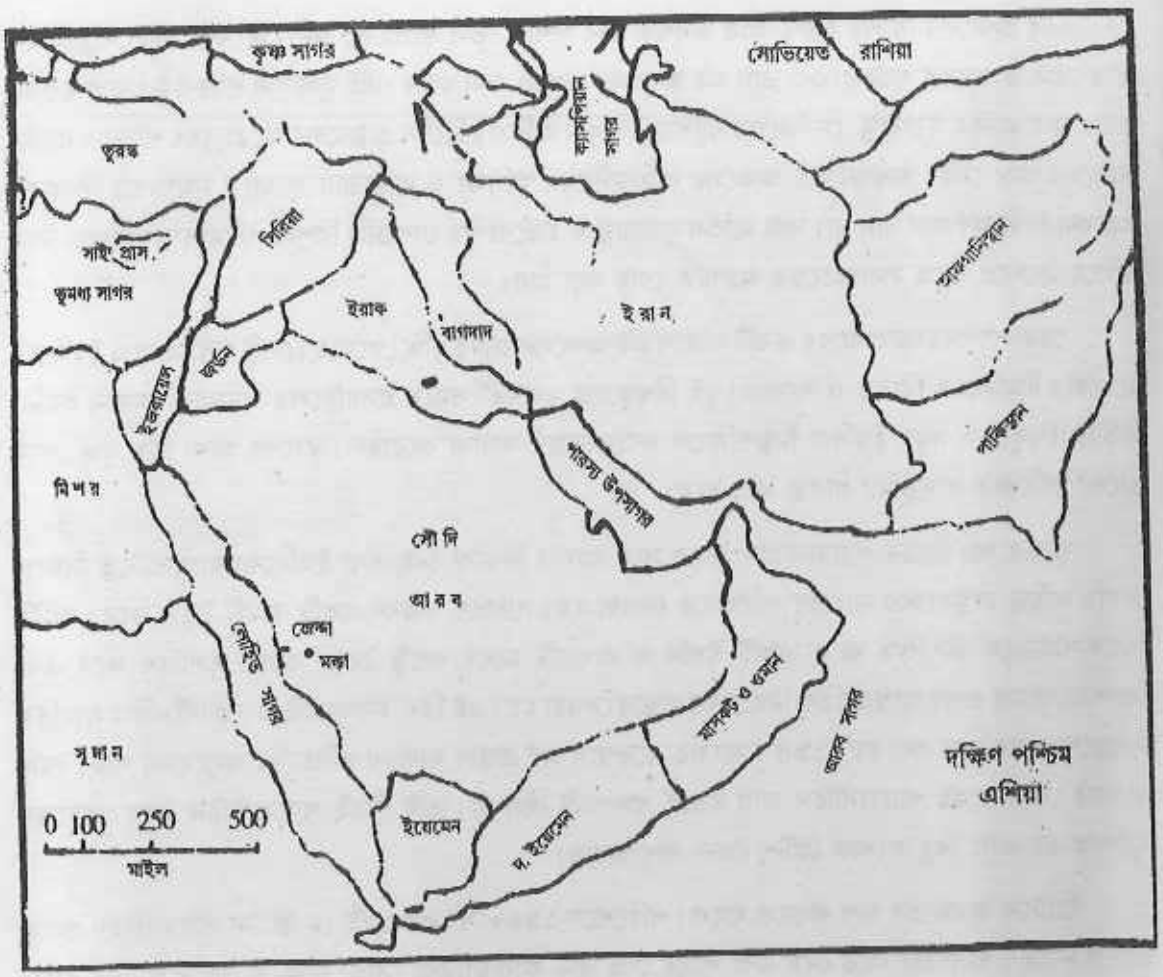

৪.৪ ☐ বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিম এশিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই এই অঞ্চলকে দখলে রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্ত নেই। বিভিন্ন সময় এর জন্য যুদ্ধও হয়েছে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে যাতায়াত আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

এই অঞ্চলের গুরুত্বের আরও একটি কারণ হল এর ভৌগোলিক অবস্থান। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এই তিন মহাদেশের এটি হল স্থলভাগের যোগাযোগ পথ। এই তিন মহাদেশের মধ্যে জলপথ ও আকাশপথের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়েই যায়। পৃথিবীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ, যেমন কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগরক্ষাকারী প্রণালী এবং ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে যোগাযোগকারী সুয়েজখাল এই অঞ্চলেই অবস্থিত। তাই স্পাইজার (Spiser) যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "এই অঞ্চল ভূ-বিশ্বের মাধ্যকর্ষণ কেন্দ্র" (Global centre of gravity)।

এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব অতি অবশ্যই তার বিশাল তেল ভাণ্ডারের জন্য। বিশ্বের মোট পেট্রোলিয়াম জাত তেল ভাণ্ডারের শতকরা ৬০ ভাগ এই অঞ্চলের ভূখণ্ডে জমা আছে। এই মূল্যবান শক্তির উৎসকে হস্তগত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, (অধুনা রাশিয়া) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের আগ্রহের অন্ত নেই। তাছাড়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগে সমাজতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলি বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে যাতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করা যায়।

তেল সম্পদ ছাড়াও আরও একটি কারণে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটি হল আরব ও ইহুদিদের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের বিদ্বেষ ও সংঘাত। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইসরাইলের সমস্যার সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিরা মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। তাদের আশা ছিল যুদ্ধ শেষে তাদের প্রতিশ্রুত বাসভূমির ব্যবস্থা করা হবে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেন প্যালেস্টাইন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইহুদিদের ব্যাপারটিতে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদকে দেওয়া হয়। সাধারণ পরিষদ একটি কমিটি তৈরি করে। কমিটি প্যালেস্টাইনকে দ্বিখণ্ডিত করে একটি ইহুদি ও অপরটি আরব রাষ্ট্র তৈরি করার সুপারিশ করে এবং জেরুজালেমের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই তিন অঞ্চলকেই এক আর্থনৈতিক সংহতির নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলা হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের অনুমোদন পায়। ইহুদি বা আর কোন পক্ষই প্যালেস্টাইন ভাগ করার পক্ষপাতী ছিল না। তাই শীঘ্রই প্যালেস্টাইন নিয়ে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারায়।

ব্রিটেনে জনমতের চাপ বাড়তে থাকে। পরিশেষে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেয় এবং শীঘ্রই সেই স্থান আন্তর্জাতিক "ঠাণ্ডা যুদ্ধে"র ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৪.৫ ☐ পশ্চিম এশিয়ার বিবাদের কারণ

পশ্চিম এশিয়ায় বিরোধের কারণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক।

আভ্যন্তরীণ কারণ : আভ্যন্তরীণ কারণ হল, একই ভূখণ্ডের উপর ইহুদি ও আরবদের অধিকার দাবি। ইহুদিদের কাছে ইসরাইলের প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে জরুরি, আর আরবদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্যারেস্টাইন উদ্ধারের ব্যাপারটি। এই দুই দাবির মধ্যে সমঝোতা সম্ভব ছিল না, তাই সংঘাত ছিল অনিবার্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই বিরোধকে ধর্মীয় রাজনীতি ও আদিবাসী বিরোধ বলে উল্লেখ করতে চান। তাদের মতে, ইহুদিরা ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের সকলে এক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মধ্যে কিছু খ্রীষ্টান ও ইহুদিও আছে। তাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা গৌণ। তারা বলেন, তাদের সংগ্রাম সাধারণভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইহুদিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যা নাকি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক। এখনও অনেক ইহুদি আরবদের দেশে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বাস করে, তাতে কোন সমস্যা নেই।

মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী প্যালেস্টাইন জনগোষ্ঠীর বিন্যাস (১৯৭৩ খ্রী পর্যন্ত)	
জর্ডন	৭,০০,০০০
ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক	৬,৭৫,০০০
ইসরায়েল	৩,৫০,০০০
গাজা অঞ্চল	৩,৭৫,০০০
লেবানন	২,৭৫,০০০
সিরিয়া	১,৭৫,০০০
মিশর	২৫,০০০
ইরাক	১০,০০০
পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল	১,৭০,০০০
	২,৭৫,৫০০

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুরা, যারা আরবভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এই বিবাদের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হল, শুধুমাত্র একটি জাতির লোক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দাবি করছে বলে সেই দেশের সমস্ত অধিবাসীকে জোর করে বিতাড়িত করা যায় কিনা।

আরব জগতের নেতৃত্বের প্রশ্নটিও পশ্চিম এশিয়ার বিবাদে ইন্ধন জুগিয়েছে। হ্যাসমাইট রাষ্ট্র ইরাক ও জর্ডন আরব জগতের নেতৃত্ব নেবার জন্য অ-হ্যাস মাইট মিশর, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও সিরিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রশ্নটি। ইরাক পশ্চিমী সামরিক জোটের সঙ্গী হয়েছিল, অথচ মিশর, সিরিয়া, ইয়েমে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ থেকে সমাজতান্ত্রিক পথে নিজেদের রাষ্ট্রে দ্রুত উন্নতি করার ইচ্ছা পোষণ করে।

বহুসংখ্যক জনজাতি গোষ্ঠীর উপস্থিতি এই বিরোধের ইন্ধন জুগিয়েছে। এই সব বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অনেক সময় ক্ষমতা ও অর্থনীতির সমভাগীদার হবার বাসনায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় ও গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। যেমন, ইরাকে কুর্দিশ-আরব গৃহযুদ্ধ, মাসকেট ও ওমানের শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইয়েমেনের সংস্কারবাদী শাসক সমর্থিত ধৌফার এর গেরিলা যুদ্ধ, ইত্যাদি।

কেউ কেউ মনে করেন আদর্শগত বিরোধও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। সিরিয়া আরবলীগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল বিশেষ করে এই কারণে। কিন্তু আবার অনেকের ধারণা, সিরিয়া ও মিশরের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বই এর মূল কারণ।

---

* ধর্মবিশেষ

বাহ্যিক কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন এই অঞ্চল থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেওয়ার পর পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই স্থান পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসে। অবস্থা আরও ঘোরালো হয় যখন বৃহৎ শক্তিদ্বয় বিভিন্ন প্রতিযোগী রাষ্ট্রকে সমর্থন করতে থাকে। সুতরাং পশ্চিম এশিয়ার বিরোধ আরব রাষ্ট্রদের বকলমে আসলে বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতার লড়াইতে পরিণত হয়। রিচার্ড কক্স যথার্থই বলেছেন, "আরব ইসরায়েলের যুদ্ধ বকলমে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে যুদ্ধ যেখানে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনেক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে যা নাকি পরে ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।" লক্ষণীয় বিষয় হল, বৃহৎ শক্তিদ্বয় এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী হলেও নিজেদের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতেই চেয়েছিল, যা বিশ্বশান্তির পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে পড়তো।

৪.৬ ☐ পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহাসিক পরিক্রমা ও শান্তি প্রয়াস

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরব রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের লোকেরা ইহুদি রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্যালেস্টাইন থেকে বহু সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়। তাদের বিদ্বেষ এত বেশি ছিল যে একদিকে ইসরায়েল ও অপরদিকে এক বা একাধিক আরব রাষ্ট্র পরপর চারবার—১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রতিবার ইসরায়েল বিজয়ী হয় এবং তার ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনেক অঞ্চল, যেমন পশ্চিম তীর, গাজা অঞ্চল, গোলান হাইটস এবং খ্রীস্টানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেম ইসরায়েল দখল করে নেয় এবং ওই সব অঞ্চলের ইহুদি ও মুসলমান অধিবাসীদের নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। শক্তি পরীক্ষার লড়াইতে বারবার জয়লাভ করে ইসরায়েল প্রত্যয়ের সঙ্গে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে গঠিত প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থাকে (Palestine Liberation Organisation বা PLO) পূর্ব গোষ্ঠীর অনেক রাষ্ট্র এবং ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ স্বীকৃতি দেয়। পশ্চিমী দেশগুলি যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত ইসরাইলের পক্ষ পুরোপুরি সমর্থন করে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ইসরাইল ছিল মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তির শক্ত ঘাঁটি, অপর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আরব রাষ্ট্রগুলির সমর্থন ছিল প্যালেস্টাইনের প্রতি।

পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে আমেরিকার উদ্যোগে অবশেষে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের উপস্থিতিতে ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিডে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয়। মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি মানাসেম বেগান উভয় রাষ্ট্রের তরফে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তার আগে আনোয়ার সাদাত এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসরায়েল ঘুরে আসেন। এভাবে দীর্ঘদিনের যুদ্ধকালীন উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়।

ক্যাম্প ডেভিডের চুক্তির পর মিশর ও ইসরায়েল উভয় স্থানেই কিছু কট্টরবাদী নেতা বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯৮১ সালে মিশরে আনোয়ার সাদাত এক চরমপন্থী মিশরীয়র দ্বারা নিহিত হন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হাসনি মোবারকও শান্তি প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। ইসরায়েল যে মিশর ভূখণ্ডের সিনাই দখল করে নিয়েছিল,

সেটি আবার মিশরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিনিময়ে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে ইসরায়েল জাহাজ চলাচলের অনুমতি পায়।

দীর্ঘদিন শত্রুতার পরিবেশ কাটিয়ে ইসরায়েল ও PLO উভয়ই শান্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ১৯৯৩ সালে ইসরায়েল ও PLO পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। প্যালেস্টাইন অধিকৃত সীমিত অঞ্চলে কিছু পরিমাণে স্বায়ত্ব শাসন দেবার জন্য ইসরায়েল সম্মত হয়েছে।

১৯৯৫ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ইসরায়েল ও PLO-র মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে ইসরায়েল অধিকৃত গাজা অঞ্চল ও জর্ডনের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত জেরিকোতে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী বছর এপ্রিলে প্যালেস্টাইন পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন করার শর্ত গৃহীত হয়, এবং আরবের শহরগুলির উপর থেকেও বিগত ১৮ বছরের ইসরায়েলী শাসনের অবসান ঘটানোর কথা উল্লেখিত হয়।

কিন্তু ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইৎঝাক রবিন (Yitzhak Rabin) আততায়ীর হাতে নিহত হন। এক উগ্রপন্থী ইহুদীর হাতে নিহত হবার ঘটনা শান্তি প্রচেষ্টায় কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। অতি সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রীঃ) প্যালেস্টাইনের কিছু উগ্রপন্থী জিহাদ গোষ্ঠী ইসরায়েলের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় আত্মঘাতী মানব বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে এতে কিছু পুলিশকর্মী ও নিরীহ মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়েছে। এসব ঘটনার জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ সরাসরি PLO নেতা ইয়াসের আরাফতকে দায়ী করে পশ্চিমতীরের রামাল্লায় তাঁর সদর দফতরে ট্যাঙ্কের সাহায্যে আক্রমণ চালান এবং পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চল সহ প্যালেস্টাইনের বৃহৎ অংশের উপর ইসরাইলের সৈন্য মোতায়েন করেন। এতে পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রয়াসে নতুন করে কিছু আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

তবে আশার কথা আরব রাষ্ট্রগুলি বুঝতে পেরেছে ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে এবং ইসরায়েলও বুঝেছে আরবদের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে না এলে ওই অঞ্চলে কখনো শান্তিতে বাস করা যাবে না। তাই অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার মধ্যস্থতায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—একথা আশা করা অন্যায় হবে না।

৪.৭ ☐ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে পশ্চিম এশিয়া বলতে কি বোঝায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এই অঞ্চলের গুরুত্ব কতখানি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মতো তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হবার দরুন এমনিতে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব অপরিসীম। তার উপর ভূগর্ভে অবস্থিত অপর্যাপ্ত পেট্রোলিয়ামজাত তৈল ভাণ্ডার এই অঞ্চলের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি অতীত কাল থেকেই এই অঞ্চলের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এসেছে। তারপর আরব রাষ্ট্রগুলি এবং ইহুদি রাষ্ট্র পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় এখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুযোগে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি বিবদমান বিভিন্ন পক্ষকে সমর্থন করায় পরিবেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছিল।

এই এককে পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের কারণগুলি যেমন আলোচিত হয়েছে, সেই সঙ্গে শান্তি প্রয়াসের কথাও আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে আরব ও ইসরায়েল উভয় পক্ষই শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছে, এবং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৪.৮ ☐ অনুশীলনী

১। 'পশ্চিম এশিয়া' বলতে কি বোঝায়?

২। বিশ্বরাজনীতিতে পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব কতখানি?

৩। ক) পশ্চিম এশিয়ার বিরোধের আভ্যন্তরীণ কারণ কী কী?

খ) পশ্চিম এশিয়ার বিরোধের বাহ্যিক কারণ কী?

৪। পশ্চিম এশিয়া বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য কোন ধরনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে?

৪.৯ ☐ গ্রন্থপঞ্জি

১। Parkash Chander & Pream Arora/International Relations/Cosmos Bookhive, New Delhi.

২। Naunihal Sing/Diplomacy For the 21st Century/Mihal Pulications, New Delhi.

৩। Francis Fukuyama/The End of History/New York, Fre Press, 1992.

৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়/আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস/মৌলক লাইব্রেরী, কলকাতা।

১৯৭৩ সালের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার অগ্রগতি
(Development in West Asia Since 1973)

দ্বিতীয় ভাগ

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের শক্তিবর্গের প্রয়াস

৪.৩ অক্টোবর ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ

৪.৪ নিরাপত্তা পরিষদের শান্তি প্রয়াস

৪.৫ ১৯৭৯ সালের শান্তি চুক্তি

৪.৬ ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (ECM) এর শান্তি প্রয়াস

৪.৭ সৌদি রাজপুত্রের আটদফা প্রস্তাব

৪.৮ ইসরাইল কর্তৃক পোলান হাইটস দখল

৪.৯ ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন

৪.১০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রস্তাব

৪.১১ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর চার দফা প্রস্তাব

৪.১২ পি এল ও নেতার প্রস্তাব

৪.১৩ ইরান—ইরাক যুদ্ধ

৪.১৪ উপসাগরীয় যুদ্ধ

৪.১৫ পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির সমীক্ষা

৪.১৬ সারাংশ

৪.১৭ অনুশীলনী

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন

- পশ্চিম এশিয়ার অশান্তি নিরসনে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা
- ১৯৭৩ সালের ইসরাইল ও মিশরের যুদ্ধের বিবরণ
- নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের শান্তি প্রয়াস
- ইরান—ইরাক যুদ্ধের বিবরণ
- উপসাগরীয় যুদ্ধের বিবরণ

৪.১ ❑ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হতে থাকে। মিশরকে ঘিরে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি প্রকাশ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম মিশরের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বার্থগত কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জড়িয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের জটিল পরিস্থির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। বিশ্বের পেট্রোলিয়ামের মোট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ এই অঞ্চল যোগান দিয়ে থাকে। তাই এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ করে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ কোন না কোন ভাবে জড়িত। সেজন্য ইসরাইলের যুদ্ধ অথবা ইরাক-ইরানের যুদ্ধ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অনতিবিলম্বে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

একদিকে আরব রাষ্ট্রগুলির নিজেদের ভেতরে অবিশ্বাস, প্যালেস্টাইনের জনগণের স্বাধীনতার লড়াই, অপরদিকে আত্মশক্তিতে ভরপুর ইসরাইলের অস্তিত্বরক্ষায় অন্তহীন সংঘর্ষে দুর্দমনীয় মনোবল। মধ্যপ্রাচ্যের জটিল পরিস্থিতি শান্ত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলেই বোধ হয়।

৪.২ ❑ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের শক্তিবর্গের প্রয়াস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তি ঘনীভূত হতে শুরু হয় এবং দিনে দিনে তা ঘোরতর আকার ধারণ করে। সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে একে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে কিন্তু ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্র উভয়পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য সেসব প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

৪.৩ ❑ অক্টোবর, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ

আলোচনার মাধ্যমে হারানো জমি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে মিশর বলপ্রয়োগের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে তৎপর হয়। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের কাছে পরাজয়ের কথা মনে রেখে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গে যাবতীয় পূর্বেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। রাশিয়া থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলেন। এসব করার ফাঁকে আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইলের দখল করা

জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালীন নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইসরাইল দখলিকৃত জমি স্বত্ব ছাড়তে রাজি ছিল না।

১৯৭৩ সালে ইসরাইলের মানুষ যখন বাৎসরিক আনন্দ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত, সেই অবসরে ৬ই অক্টোবর মিশর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে সিনাই মরু অঞ্চলের কয়েক মাইল বিস্তৃত এলাকা দখল করে নেয়। একই সময়ে সিরিয়া আক্রমণ চালিয়ে গোলান হাইট ইসরাইলী ঘাঁটি দখল করে নেয়। সেই সঙ্গে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র, যেমন, মরক্কো, সৌদি আরব, টিউনিসিয়া, ইরাক, ইসরাইলের চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন করে। প্রথমবারের জন্য ইসরাইলকে সম্মিলিত আরব শক্তির সম্মুখীন হতে হয়।

মিশরীয় সৈন্যের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসরাইল তৎপরতার সঙ্গে তার সাজোয়া বাহিনীকে সুয়েজ অতিক্রম করে মিশরীয় তৃতীয় বাহিনীর মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং রাজধানী কায়রো আক্রমণের হুমকি দেয়। সিরিয়ার দিকেও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি গোলান হাইটস তাদের দখলে আসে। এভাবে মিশরের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে ইসরাইল তার ক্ষতিপূরণে সমর্থ হয়।

৪.৪ ❑ নিরাপত্তা পরিষদের শান্তি প্রয়াস

১৯৭৩ সালের ২২শে অক্টোবর জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনায় বসে এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে উভয়পক্ষকে অস্ত্রসংবরণ করতে নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে ১৯৬৭ সালে গৃহীত প্রস্তাবও কার্যকরী করার আহ্বান জানায়। কিন্তু বিবদমান কোন পক্ষই সাড়া না দেওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ পরদিন অপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ পুনরায় জারি করার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় এক সংযুক্ত বাহিনী গঠন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেয়। যুদ্ধরত দেশ দুটি অস্ত্র সংবরণ করতে রাজি হয়, যদিও মাঝে মাঝেই গোলাবারুদের শব্দ শোনা যেতে থাকে। ওই অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কুটওয়াইল্ডহাইমের প্রস্তাব মত একটি আপৎকালীন শান্তি বাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ রাজি হয়, এবং অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আয়ার্লান্ড, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পানামা, পেরু, পোল্যান্ড ও কানাডা রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

মূলত আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে উভয় রাষ্ট্র পরস্পর শান্তি বজায় রাখতে ও দখল করা জমি ও যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেবার ব্যাপারে ঐক্যমতে উপস্থিত হয়।

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইল ও মিশরের ৩ বছরের মেয়াদে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রথমত ইসরাইল আবু কুভিসের তৈল ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে সম্মত হয়। শর্ত হল, তার লোকসানের ভর্তুকি আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত গিড্ডির পূর্বপ্রান্ত ও মিটলা গিরিপথ থেকে ইসরাইল তার সৈন্য সরিয়ে নেবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনী এই অঞ্চলের দায়িত্ব নেবে। তৃতীয়ত মিশরীয় সৈন্যদের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখার জন্য একটি সতর্ক ব্যবস্থা (alert system) গড়ে তোলা হবে যার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন আমেরিকার নাগরিকের ওপর।

৪.৫ ❑ ১৯৭৯ সালের শান্তি চুক্তি

ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এই প্রয়াসের ফল পাওয়া গেল যখন হোয়াইট হাউসের অঙ্গনে ঐতিহাসিক চুক্তিটি সাক্ষরিত হয় ১৯৭৯ সালের ২৬শে মার্চ। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন ও মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের উপস্থিতিতে সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল সূত্রগুলি অবশ্য ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যাম্প ডেভিডে স্থির হয়েছিল। ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত চুক্তি যথাসময়ে দুই দেশের মন্ত্রীসভা ও সংসদ অনুমোদন করে।

চুক্তির শর্তগুলি ছিল

১। ইসরাইল সিনাই মরুভূমির বিস্তৃত এলাকা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করেছিল, সেটি মিশরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়।

২। সেই অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া সমস্ত ইহুদি পরিবারকে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে তারা সম্মত হয়।

৩। আগামী সাত মাসের মধ্যে সিনাই-এর তৈলক্ষেত্র মিশরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে স্থির হয়।

৪। দু'মাসের মধ্যে সমুদ্র উপকূলের শহর এল আরিস থেকে ইসরাইল সরে আসবে।

৫। গাজা এবং পশ্চিম উপকূলে বসবাসকারী প্যালেস্টিনীয়দের অধিকতর স্বাধীনতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

পশ্চিম উপকূল ও গোলান হাইটস্ ফিরিয়ে দেবার কোন কথা অবশ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মিশরের বিশ্বাস ছিল, তাদের শান্তি প্রয়াসে ইসরাইলের আস্থা ফিরে এলে ওসব এলাকা থেকে ইসরাইল স্বেচ্ছায় চলে যাবে।

এই চুক্তি অন্যান্য আরব রাষ্ট্র অনুমোদন করেনি। তারা মিশরকে বিশ্বাসভঙ্গকারী বলে মনে করে এবং পৃথক বৈঠক করে ২২ সদস্যের আরব লীগ থেকে মিশরকে বহিষ্কার করে। লীগের সদর দপ্তর কায়রো থেকে টিউনিসে সরিয়ে নেওয়া হয়। মিশরের বিরুদ্ধে কিছু অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কয়েকটি আরব রাষ্ট্র মিশরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। লিবিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, আলজিরিয়া, ইরাক, সিরিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরিন, টিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, জর্ডন প্রভৃতি রাষ্ট্র মিশর থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়।

এত সব বিরোধিতা সত্ত্বেও আনোয়ার সাদাত স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে চুক্তি রূপায়ণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ইসরাইলের ভয় হল পশ্চিম তীর এবং গাজায় যদি স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়, তবে তারা হবে ইসরাইলের ঘোরতর বৈরী এবং ভবিষ্যতে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করবে। তাই প্যালেস্টাইনে সামান্য পৌর অধিকারের বেশি কিছু দিতে ইসরাইল রাজি ছিল না। অপরদিকে মিশর প্যালেস্টাইনের জন্য কার্যকরী স্ব-শাসন ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৪.৬ ❑ European Common Market (E. C. M)-এর শান্তি প্রয়াস

ইউরোপের কমন মার্কেটের দেশগুলি পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেয়। তারা প্রথমেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৪২নং প্রস্তাব সংশোধনের দাবি জানায়। সেই প্রস্তাবে ইসরাইলকে নিজের সীমার মধ্যে পূর্ণ

স্বাধীনতা নিয়ে বাস করার অধিকারের কথা ছিল সেই সঙ্গে অধিকৃত আরব ভূখন্ড থেকে তাদের সরে আসার কথাও ছিল E.C.M. দাবি করে প্যালেস্টাইনকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে এবং শান্তি প্রচেষ্টায় Palestine Liberation Organisation (PLO)-কেও অংশীদার করতে হবে।

৪.৭ সৌদি রাজপুত্রের আটদফা প্রস্তাব

১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে সৌদি আরবের রাজপুত্র ফাহড (Fahd) পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৮ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবগুলি হল

১। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরাইল আরবের যে সব অঞ্চল দখল করেছিল, সেগুলি থেকে এবং জেরুজালেমের আরব অংশ থেকে সরে যেতে হবে।

২। ১৯৬৭ সালে দখল করা জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, গাজা অঞ্চল, গোলান হাইট থেকে ইহুদি দখলদারদের সরিয়ে দিতে হবে।

৩। জেরুজালেম সহ সমস্ত পবিত্র ভূমিতে খ্রীস্টান, ইসলাম ও ইহুদিদের ধর্মীয় অধিকার দিতে হবে।

৪। দুই মিলিয়ন প্যালেস্টাইনের স্থানচ্যুত অধিবাসীকে পুনঃসংস্থাপন করতে হবে অথবা যারা ফিরতে চায়না তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫। প্যালেস্টিনীয় অধিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিম তীর কয়েক মাসের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি পরিষদের এর (trusteeship) অধীনে রাখতে হবে।

৬। জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭। ওই অঞ্চলের সব কয়টি রাজ্যকে শান্তিতে বাস করার অধিকার দিতে হবে।

৮। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অথবা কিছু সদস্যরাষ্ট্রের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে।

সৌদি রাজপুত্র ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার অবাধ সমর্থনের সমালোচনা করেন। প্যালেস্টাইন যে পশ্চিম এশিয়ার মূল সমস্যা সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ইসরাইলের পক্ষে এইসব প্রস্তাব বিপজ্জনক বলে তারা প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করে।

১৯৮১ সালের অক্টোবরে মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাত হোসেন আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর মুবারক হোসনী নতুন রাষ্ট্রপতি হন। তিনি পূর্বসূরির মত ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

আমেরিকার প্রচেষ্টায় অবশেষে ইসরাইল ক্যাম্প ডেভিডের চুক্তির শর্তমত মিশরকে সিনাই অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়। উত্তেজনা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়।

৪.৮ ইসরাইল কর্তৃক গোলান হাইটস দখল

১৯৮১ সালে ইসরাইল গোলান হাইটস দখল করলে পর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন ঘোষণা করেন, শান্তিচুক্তির শর্ত মত পাঁচ বছরের স্বায়ত্তশাসনের সময় শেষ হওয়া

মাত্র তারা পশ্চিম তীর পুনরায় দখল করে নেবে। সিনাই অঞ্চল ছেড়ে আসার দিন যত ঘনিয়ে এলো, লেবানন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকার অস্ত্রে সুসজ্জিত ইসরাইল ১৯৮২ সালের জুন মাসে পশ্চিম বেইরুটে বোমা বর্ষণ করে PLO-কে পর্যুদস্ত করে দেয়।

পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইসরাইলের এই আক্রমণের সমালোচনা করে। কিন্তু ইসরাইলকে নিরস্ত্র করার উদ্যোগ কোন পক্ষেই দেখা যায়নি। আমেরিকার চেষ্টায় ইসরাইল লেবাননের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। উভয়পক্ষই দক্ষিণ লেবাননকে শান্তিক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে সম্মত হয়। এরপর যুদ্ধ না করা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতে না দেবার ব্যাপারে তারা ঐক্যমত হন। কয়েকটি আরব দেশ এই চুক্তির ব্যাপারে সম্মতি দিলেও সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, পি এল ও এবং লিবিয়া প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে। এভাবে মাঝে মাঝেই এই অঞ্চলে অশান্তির ঘটনা ঘটতে থাকে।

৪.৯ ☐ ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন

১৯৬৭ সালের মে মাসে ইসরাইল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চল দখল করার পর থেকেই এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। দখলীকৃত জমিতে প্যালেস্টিনীয়দের মানবিক অধিকার রক্ষা ও চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়। কিন্তু ওই অঞ্চলে বাস করা প্যালেস্টিনীয়দের ওপর ইসরাইলের হামলা চলতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ কাজের নিন্দা করে এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইসরাইলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন জানান হয়। কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকার ভেটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধা পড়ে। ইসরাইল জানিয়ে দেয় তারা কখনো পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চল ছেড়ে দেবে না। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার প্রশ্ন তারা সরাসরি অগ্রাহ্য করে এবং ইসরাইল সেনাবাহিনীর অধীনে সীমিত স্বায়ত্তশাসনই সেখানকার একামাত্র সমাধান বলে তারা দাবি করে। প্যালেস্টিনীয়রা একাধিকবার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে এবং প্রতিবারই ইসরাইল কঠোর হয়ে সেসব বিক্ষোভ দমন করে।

৪.১০ ☐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রস্তাব

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক নতুন পরিকল্পনা পেশ করে। পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলে সাময়িক ভাবে কিভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা যায় সে বিষয়ে ইসরাইল এবং জর্ডন প্যালেস্টাইন একত্রে বসে স্থির করবে। এই ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য কার্যকরী হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তির জন্য সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হবে।

কিন্তু পি এল ও এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কেননা প্যালেস্টাইনকে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব নেই এবং পি এল ও কে শান্তি প্রক্রিয়ার অংশীদার করা হয়নি তাই।

ইসরাইলও এই প্রস্তাব মানতে রাজি ছিল না। প্রধানমন্ত্রী সামির (Shamir) ঘোষণা করেন, প্যালেস্টাইনের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি আলোচনা করতে তারা রাজি নয়। ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং পশ্চিম এশিয়ায় অশান্ত পরিবেশ চলতে থাকে।

৪.১১ ❑ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর চারদফা প্রস্তাব

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী সামির মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চার দফা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। প্রথম দফায়, স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগাম আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য PLO-কে বাদ দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। দ্বিতীয় দফায় ছিল অন্তর্বর্তী সময়ে হবে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রকৃত পরীক্ষা। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতার উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। ইসরাইল সবরকম আলোচনার পথ খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। তৃতীয় দফায় বলা হয় ১৯৭৯ সালের ক্যাম্প ডেভিডে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সকল পক্ষের নতুন করে আস্থা জ্ঞাপন করতে হবে এবং পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলে বসবাসকারী আরবীয় উদ্বাস্তুদের মানবীয় সমস্যার সমাধানে আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। চতুর্থ দফায় ছিল ইসরাইলের ওপর আরব রাষ্ট্রগুলি যাতে কোন রকম হামলা না করে সে বিষয়ে আমেরিকা ও মিশরকে দায়িত্ব নেবার কথা।

আরব রাষ্ট্রগুলির অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তি স্থাপনের আশায় পি এল ও শেষ অবধি ইসরাইলের দেওয়া নির্বাচনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। তবু অবস্থা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

৪.১২ ❑ PLO নেতার প্রস্তাব

১৯৮৮ সালে পি এল ও প্রধান ইয়াসের আরাফত মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি কামনায় তিন দফা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

১। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা।

২। প্যালেস্টাইনের দখল হওয়া জমি সবটুকু সাময়িকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বধানে রেখে সেখানকার অধিবাসীদের রক্ষা করা এবং ইসরাইলি বাহিনীকে সরে যাওয়ার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা।

৩। পি এল ও কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৪২নং এবং ৩৩৮নং প্রস্তাবমত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আওতায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া।

এই সঙ্গে পি এল ও ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার কথা ঘোষণা করে। আমেরিকা এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং ইসরাইলকে মেনে নেবার ফলে এই অঞ্চলে শান্তির প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পায়। পি এল ও-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না করার যে সুদীর্ঘ ১২ বছরের নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেটিও তারা প্রত্যাহার করে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হলে আরাফত পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চল থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে সম্মিলিত বাহিনীর উপস্থিতি মেনে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাইল প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন বলে মানতে রাজি ছিল না। তাই এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। ফলে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এর মধ্যেই ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এবং ইয়াসের আরাফত প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে আবির্ভূত হন। আরব লীগ ব্যাপারটি অনুমোদন করে। মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে এবং আশু শান্তি সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে বোধ হয়।

৪.১৩ ☐ ইরান-ইরাক যুদ্ধ

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরান ও ইরাকের যুদ্ধে পশ্চিম এশিয়ার পরিবেশ নতুন করে অশান্ত হয়। ইরান ও ইরাকের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন বাগদাদে সম্পন্ন 'সমঝোতা চুক্তি' (reconciliation treaty) ইরাক একতরফা ভাবে বাতিল করে দেয়। তখন থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। এই চুক্তির দ্বারা ইরান ও ইরাকের মধ্যেকার পূর্বসীমান্তের বিতর্কিত সাবেক সীমারেখার পরিবর্তে থালওয়েবা রেখাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তি শর্ত ইরাকের নেতাদের মনঃপূত ছিল না। তাই দুই দেশের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ইরানে ইসলামিক বিপ্লব ও ১৯৭৯ সালে নবাব শাহ এর অপসারণে অবস্থার অবনতি হয়। ইরানের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ খুজেস্তানের ক্রমবর্ধমান অশান্তি ইরাককে চুক্তি বাতিল করতে উৎসাহিত করে।

১৯৭৯ সালের ৩১শে অক্টোবর ইরাকের রাষ্ট্রদূত আবদেল হুসেন মোসমের সাহান ইরানের কাছে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন।

প্রথম, ১৯৭৫ সালের সমঝোতা চুক্তি বাতিল করা এবং ইরাককে পূর্বেকার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়, ১৯৭৯ সালে ইরানের দখল করা আবু মুসা এবং হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত থামস দ্বীপগুলি ইরাককে ফিরিয়ে দেওয়া।

তৃতীয়, ইরানের অন্তর্গত বালুচ, কুর্দ ও আরবদের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

এসব দাবিকে ইরান তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে এবং স্বাভাবিকভাবেই নাকচ করে দেয়। সেই সঙ্গে ইরাকের সৈন্যদের ইরানের এলাকায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ তোলা হয়।

১৯৮০-র ৮ই মার্চ ইরান সরকার ইরাকী রাষ্ট্রদূতকে সেদেশ ছাড়তে বলে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ইরাকও পরদিন ইরানের রাষ্ট্রদূতকে সেদেশে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে এবং দেশ ছাড়তে বলে। কয়েকদিনের মধ্যে ইরাকী গেরিলা বাহিনী সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে ইরান আক্রমণে প্রস্তুত হয়। অপর দিকে ইরাকের বিদেশ মন্ত্রী রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কুট ওয়াইল্ডহামের কাছে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ইরান তাদের দেশ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অপরদিকে ইরানও অভিযোগ করে যে তাদের তৈলক্ষেত্র ইরাক দুবার রকেট আক্রমণ করেছে।

১৯৮০ সালের ৭ই এপ্রিল ইরান সীমান্ত বরাবর সৈন্য প্রস্তুত করে। ৮ই এপ্রিল ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা রুহুল্লাহ খোমেইনি ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনকে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু হিসাবে ঘোষণা করে তাকে উৎখাত করার জন্য ইরানের সৈন্যদের প্রতি আবেদন করেন। ইরান-ইরাক সীমান্তের ভয়ংকর ঘটনা সব ঘটতে থাকে এবং সাত হাজার সিয়া মুসলমান ইরাক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ইরান সীমান্ত অতিক্রম করে। ১৬ই এপ্রিল সাদ্দাম হোসেনের নাগপাশ থেকে ইরাককে মুক্ত করার জন্য ইরান এক বৈপ্লবিক সেনাবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করে এবং ইরাকী জনগণকে আমেরিকার তাঁবেদার ইরাক সরকারের প্রতি রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানায়।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে এবং উভয় পক্ষের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যায়। জুলাই মাসে যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায় এবং ইরাকী সৈন্য ইরানের উত্তর পশ্চিমের শহর আক্রমণ করে বসে। ইরানী সেনাও সীমান্ত পেরিয়ে ইরাকের তেল উৎপাদন কেন্দ্র আক্রমণ করে। ২৭শে আগস্ট

ইরাকী আক্রমণ প্রভাবিত করতে ইরান প্রথম ভূমি থেকে ভূমি মিসাইল ব্যবহার করে। ১০ সেপ্টেম্বর ইরাক স্বীকার করে তারা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে রত। ইরাকী রাষ্ট্রপতি বলেন, তারা যুদ্ধ চাননা, তবে তাদের মাটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হলে তারা যে কোন মূল্যে সেটা বাধা দেবেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর সাদ্দাম হোসেন ১৯৭৫ সালের সমঝোতা চুক্তি বাতিল করে দেন এবং শাট-আল-আরব জলাধারের ওপরে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করেন। ২১-শে সেপ্টেম্বর ইরান পুরোদস্তুর যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক সীমান্ত পেরিয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। ইরাকী সৈন্যও খুররম বন্দর দখল করে ও আবাদন শহর ঘিরে ফেলে। উভয় তরফ থেকে বিমান আক্রমণ চালান হয় এবং উভয় পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

পরিশেষে ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৮০) তিনটি শর্তে ইরাক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। শর্ত তিনটি হল, (ক) সীমান্ত এলাকায় ইরানকে ইরাকের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে। (খ) শাট-আল-আরব জলক্ষেত্রের ওপর ইরাকের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে। (গ) উপসাগরীয় অঞ্চলে তিনটি দ্বীপ ইরাককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শর্ত মানার জন্য ইরাক ৬ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু ইরানের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। দুপক্ষের বিমান আক্রমণ ও হতাহত চলতে থাকে। ৫ই অক্টোবর ইরাকী যুদ্ধ পরিষদ সাময়িক যুদ্ধ বিরতি প্রত্যাহার করে যতদিন উদ্দেশ্য সফল না হয় ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে।

ইরাক ইরান যুদ্ধে বেশির ভাগ আরব রাষ্ট্র ইরাককে সমর্থন করে। কেবলমাত্র সিরিয়া ও লিবিয়ার সমর্থন ছিল ইরানের প্রতি। ফলে ইরাক এই দুই দেশের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সৌদি আরবও ইরাকের প্রভাবে লিবিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। জর্ডন ও মরক্কো থেকে ইরান তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে। জর্ডনও ইরান থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে আনে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই যুদ্ধে সম্মানজনক পরিসমাপ্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের কোন প্রয়াসই সফল হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামিক সামিট তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু কোন প্রয়াসই সফল হয়নি।

১৯৯০ সালে আকস্মিক ভাবে ইরাক-ইরানের সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। কুয়েত দখল করার ফলে ইরাকের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে। তারা আর্থনীতিক ও সামরিক চাপের মুখে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা গত ৮ বছরে ইরানের যে সব অঞ্চল দখল করেছিল, সেগুলো ছেড়ে দিতে রাজি হয়। সমস্ত যুদ্ধ বন্দী প্রত্যর্পণ, এবং নজরদারী করার জন্য উভয় রাষ্ট্র যৌথ কমিটি গঠন করবে স্থির হয়। যুদ্ধ অবসানের জন্য ইরানের দেওয়া শর্ত ইরাক মেনে নেওয়ায় অক্টোবরের মাঝামাঝি ৮ বছর জোরা ইরাক-ইরান যুদ্ধের ওপর যবনিকা পতন হয়।

৪.১৪ □ উপসাগরীয় যুদ্ধ (Gulf War)

১৯৯১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা পশ্চিম এশিয়ার অশান্ত অঞ্চলকে অধিকতর উত্তপ্ত করে রেখেছিল। আমেরিকার নেতৃত্বে ২৮টি দেশের এক সম্মিলিত বাহিনী ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট যখন ইরাক জোর করে কুয়েত দখল করে ইরাকের নবম প্রদেশ বলে ঘোষণা করে। কুয়েত তার নির্দিষ্ট কোটার চেয়ে বেশি তেল তুলতে শুরু করলে বাজারে পেট্রোলিয়াম তেলের দাম কমতে থাকে এবং ইরাকের প্রচুর লোকসান

হয়। তাছাড়া ওয়ার্বা ও ববিয়ান দ্বীপ দুটি কুয়েত ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় ইরাক অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাছাড়াও রুমাইলার তৈলক্ষেত্র ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ। কুয়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ইরাক সীমানার অন্তর্গত তৈলক্ষেত্র থেকে কুয়েত অবাধে তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ইরাকের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিভিন্ন আরব দেশ এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে ব্যর্থ হয়। ইরানের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে চরম আর্থিক সংকটে পড়াতে সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন।

কুয়েতের ওপর আকস্মিক হামলায় ইরাক সম্বন্ধে সারা পৃথিবীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ একাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করে ইরাককে কুয়েত থেকে চলে এসে ওদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বলে। সদস্যরাষ্ট্রদের ইরাকের আর্থনীতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইরাকের বাইরে নৌবাহিনীর প্রতিরোধ তৈরি করে যাতে ইরাক কুয়েতের ওপর দখলদারী ছেড়ে দেয়। কিন্তু এসব নিষেধাজ্ঞা আঁটোসাটো না হবার ফলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। ইরাকের অনমনীয় মনোভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাককে সাবধান করে দিয়ে বলে যে ১৯৯১ সালের ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে কুয়েত থেকে সরে না এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরদিকে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত থেকে সেনা প্রত্যাহারের শর্ত হিসাবে জেরুজালেমকে রাজধানী করে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্ধারিত সময়সীমা মানতেও রাজি ছিলেন না। উত্তেজনা কমাতে কয়েকটি রাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধ থামানো সম্ভব হয়নি।

নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ২৮টি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আকাশপথে ইরাককে আক্রমণ করে। যদিও রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল কুয়েতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া, কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আসল লক্ষ হয়ে দাঁড়াল সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইরাককে খণ্ডিত করা যাতে ভবিষ্যতে ইরাক কোনদিন পশ্চিমী দেশের পক্ষে ভীতির কারণ হতে না পারে।

বিশ্বের জনমত এবং আমেরিকার একাংশ জনগণ ইরাক আক্রমণের ব্যাপারটি সমর্থন করেননি। যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হলেও ২৮ রাষ্ট্রের সম্মিলিত আক্রমণ সাদ্দাম হোসেন সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন এবং সেই ফাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাওয়া স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা ইসরাইল ও সৌদি আরবের ওপর আক্রমণ চালান।

অবশেষে ১৯৯১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসান হয়। নিরাপত্তা পরিষদের দেওয়া ১২টি প্রস্তাবের সবকটি ইরাক মেনে নিতে বাধ্য হয়। কুয়েত তার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

৪.১৫ ☐ পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির সমীক্ষা

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের আরব রাষ্ট্রগুলির ভাষা ধর্ম কৃষ্টির মিল থাকলেও তাদের মধ্যে একতার চেয়ে অনৈক্যের ভাগ বেশি। নিজেদের মধ্যে 'ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদের জেরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। বিখ্যাত ইসরাইলী লেখক এববা ইবান (Ebba Eban) এর মতে আরব জগতে ইসরাইলের বিষয়ে তিন রকম মনোভাব দেখা যায়। প্রথম ভাবটি হল মিশরের, যে সবরকম বিরোধ মিটিয়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। লেবাননও তাদের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে ইসরাইলের সঙ্গে

সহাবস্থান চায়। তাদের শর্ত কেবল একটাই। ইসরাইল তাদের যে জায়গা দখল করেছে সেগুলি ফেরত দিতে হবে।

ইসরাইলকে স্থায়ী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার চিরাচরিত আরবীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে এসে টিউনিশিয়া, মরক্কো, সৌদি আরব, সিরিয়া, লিবিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, কুয়েত প্রভৃতি রাষ্ট্র দ্বিতীয় রকম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ইসরাইলকে আর কোন মতে খতম করা সম্ভব হবে না।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হল পি এল ও-র সঙ্গে কিছু দেশের যারা এখনো ইসরাইলকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এদের মধ্যে আবার কিছু অংশ যারা অতি সম্প্রতি বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ইসরাইলের স্থায়িত্বর বিষয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে।

আরব রাষ্ট্রদের অনৈক্যের আরও একটি কারণ হল তাদের আনুগত্যের বহুমুখিতা। কিছু কিছু রাষ্ট্র যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রর সমর্থক, অপর রাষ্ট্রগুলি কম্যুনিস্ট দেশের অনুগামী। মিশর, জর্ডন, লেবানন, টিউনিসিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সুদানের আনুগত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের দিকে। অপরদিকে লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, দক্ষিণ ইয়েমেনের টান হল সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য ভোটের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন আরব রাষ্ট্রগুলি একমত হয়ে ভোট দিতে পারে না। কখনো কখনো তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে থাকে।

আরব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও তাদের ঐক্যের অন্তরায়। তাই সৌদি আরবের মত আরও কয়েকটি দেশ আছে যেখানে সাবেক রাজতন্ত্র ইসলামিক আইনের দ্বারা দেশ শাসন করে। অন্যদিকে সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেনে গণতন্ত্র, ইরাক ও লিবিয়াতে আছে সামরিক স্বৈরতন্ত্র, জর্ডনে পিতৃতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। লেবাননে বহুত্ববাদী সংসদীয় গণতন্ত্র। ওই অঞ্চলে অশান্তি ও বিদ্বেষের পরিবেশ বিরাজ করার এটাও একটি কারণ।

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংকট বাইরের কোন শক্তির পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। আরবের সমস্যা ওখানকার অধিবাসীদেরই সমাধান করতে হবে। তাই আরবীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাদের বাহ্যিক বৈচিত্র সত্ত্বেও ঐক্যমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৪.১৬ ☐ সারাংশ

বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমির দেশ পশ্চিম এশিয়ার আবহাওয়া প্রাকৃতিক কারণেই স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক উত্তাপ বিকিরণ করে। আবার সেই প্রাকৃতিক কারণেই মরু অঞ্চলের নীচে বিশাল তৈলক্ষেত্রের কল্যাণে পশ্চিম এশিয়া বিশ্বের রাজনীতিকে সদা উত্তপ্ত করে রেখেছে। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাষা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে যথেষ্ট মিল থাকলেও ছোট ছোট স্বার্থ ঘটিত কারণে প্রায়ই তাদের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। একে বিপুল পরিমাণে তৈল সম্পদের অধিকারী, তার ওপর অন্তর্কলহ ও যুদ্ধে জর্জরিত এর মধ্যে উত্তেজনার পারদ অধিকমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের মধ্যস্থানে অবস্থিত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল।

আরব রাষ্ট্রগুলি তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ইসরাইলকে কোনদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তাকে উৎখাত করা, এমনকি দমন করা তাদের সাধ্যের বাইরে। ঘোলা জলে মাছ ধরার প্রবাদ বাক্যকে সত্যে পরিণত করে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে অধিক মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের পেট্রোলিয়ামজাত তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাজ্যগুলি, তাই তাদের নিজ নিজ আয়ত্তে রাখার জন্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি সদা তৎপর। সুতরাং দেখা যায় প্রতিটি আরব রাষ্ট্রের পেছনে কোন না কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট ইসরাইল ওই অঞ্চলে অসীম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

কয়েক দশকের মধ্যে আরব-ইসরাইল, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, এবং আমেরিকার নেতৃত্বে ২২টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইরাকের উপসাগরীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া ইসরাইল ও পি এল. ও এর মধ্যে অবিরাম অশান্তি লেগে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, নির্জোট আন্দোলন, বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ পশ্চিম এশিয়ার স্থায়ী শান্তির জন্য নিরন্তর তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪.১৭ ☐ অনুশীলনী

১। ক) ১৯৭৩ সালে মিশর-ইসরাইলের যুদ্ধের কারণ কী?

খ) যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল অল্পকথায় লিখুন।

গ) এই যুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করুন।

২। ক) ১৯৭৯ সালে ২৬শে মার্চ শান্তি চুক্তি কোথায় সাক্ষরিত হয়েছিল?

খ) চুক্তির শর্তগুলি কি ছিল লিখুন।

গ) উক্ত শান্তি চুক্তির ফল কি হয়েছিল বর্ণনা করুন।

৩। ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের (ECM) শান্তি প্রয়াসের শর্তগুলি উল্লেখ করুন।

৪। সৌদি রাজপুত্রের আটদফা শান্তি সূত্রের বিষয় উল্লেখ করুন। এই সূত্রগুলি কতদূর কার্যকরী হয়েছিল বলে আপনার ধারণা।

৫। ১৯৮১ সালে ইসরাইল কর্তৃক গোলান হাইটস্ দখলের ফল কি হয়েছিল বিশ্লেষণ করুন।

৬। ক) মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা করুন।

খ) মার্কিন প্রস্তাব ইসরাইল ও পি এল ওর অগ্রাহ্য কবার কারণ উল্লেখ করুন।

৭। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির জন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর চার দফা প্রস্তাব কি ছিল বর্ণনা করুন।

৮। ক) ১৯৮৮ সালে ইয়াসের আরাফতের তিন দফা শান্তি প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা করুন।

খ) এই প্রস্তাবের ফল কি হয়েছিল উল্লেখ করুন।

৯। ক) ইরাক-ইরানের যুদ্ধের কারণ কি বলে আপনার ধারণা।

খ) এই যুদ্ধের পরিণামের বিষয়ে আলোচনা করুন।।

১০। উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করুন।

১১। পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ সমীক্ষা করুন।

৪.১৮ ❑ গ্রন্থপঞ্জি

১। Parkash Chander & Prem Arora : International Relations.

২। Naunihal Sing : Diplomacy for the 21st Century.

৩। Francis Fukuyama : The End of History.

৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

একক ১ □ বিদেশ নীতির গঠন পদ্ধতি (Making of Foreign Policy)

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ বিদেশ নীতির অর্থ

১.২.১ বিদেশ নীতির কয়েকটি সংজ্ঞা

১.৩ বিদেশ নীতির উদ্দেশ্য

১.৪ বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি

১.৫ এই নীতির বিভিন্ন নির্ধারক

১.৬ বিদেশ নীতির গঠন

১.৬.১ বিদেশ নীতি প্রণয়নে সরকার প্রধান ও বিদেশ মন্ত্রীর ভূমিকা

১.৬.২ বিদেশ নীতি গঠনে আইনসভার ভূমিকা

১.৬.৩ বিদেশ নীতি প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

১.৬.৪ বিদেশ নীতি গঠনে অন্যান্য অধীনস্থ বিভাগ ও উপদেষ্টাদের ভূমিকা

১.৬.৫ বিদেশ নীতিতে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা

১.৭ সারাংশ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ উত্তর সংকেত

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন —

- বিদেশনীতির অর্থ
- বিদেশনীতির কয়েকটি সংজ্ঞা
- বিদেশনীতির উদ্দেশ্য

- বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি
- এই নীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক
- বিদেশনীতির গঠন
- এই নীতি গঠনে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের ভূমিকা

১.১ প্রস্তাবনা

যোশেফ ফ্রাঙ্কেল (Joseph Frankel) তাঁর 'International Relations' বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন বিগত শতাব্দীতে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে যথোপযুক্ত ভাবে বুঝবার জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিষয়টি নবীন হলেও এর নামকরণ বহু আগেই করে ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ ও দার্শনিক জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham)। সমাজ বিজ্ঞানের এই কনিষ্ঠ শাখা একটা নির্দিষ্ট কাঠামো এবং বিধিবিধান অবলম্বন করে জাতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাত-সংশ্লেষ, সহযোগ-প্রতিযোগ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করে চলেছে।

বৈদেশিক নীতি শব্দটিকে যদি বৈদেশিক (foreign) এবং নীতি (Policy) — এইভাবে বিভাজন করা হয় তা হ'লে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়। বৈদেশিক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে আছে সার্বভৌমিকতার (sovereignty) ও ভূখণ্ডের (territoriality) প্রশ্ন। সার্বভৌমিকতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষয়টি প্রযুক্ত হয় কোন দেশের অভ্যন্তরীণ আইনগত ভূখণ্ডের মধ্যে। অভ্যন্তরীণ সীমারেখার বাইরে কোন ভূখণ্ডগত জনগণের সাথে জাতিরাষ্ট্রের আচার আচরণকে বিদেশনীতি বলা হয়।

নীতি হ'ল কতকগুলি সিদ্ধান্ত (decisions) বা রাষ্ট্রের আচরণের পথপ্রদর্শক। এই নীতিগুলিই রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই এই নীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে পছন্দের (Choice) প্রশ্নও। কোনও উদ্দেশ্য সাধন করতে কি ধরনের কাজ বা কার্য প্রণালী গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পছন্দের উপর। সুতরাং বিদেশনীতি হ'ল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সীমারেখার বাইরের জনগণ, ভূখণ্ড ও সরকার সম্পর্কে অনুসৃত পছন্দের নীতি। এই নীতি সবসময়ই পরিবর্তনশীল।

কোন রাষ্ট্র যখন বিদেশনীতি গঠন করে তখন তার মধ্যে থাকে বিশেষভাবে উচ্চারিত কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সমূহ স্বল্পকালীন (short-term) এবং দীর্ঘকালীন (long-term) হয়। কোন দেশের বিদেশ নীতি সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক সামর্থ্য, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (background) ও ঐতিহ্য (tradition) এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। বিদেশনীতি নির্ধারকের সংখ্যাও বহু। সুতরাং বিদেশনীতির গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল বিষয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের এক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়েই বিদেশনীতি প্রণীত হয়।

১.২ বিদেশ নীতির অর্থ

মানুষ যেমন সম্পূর্ণরূপে একাকী বাস করতে পারে না তেমনি কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না। তাই আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আর যে নিয়মনীতি অনুযায়ী এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে আমরা বিদেশনীতি বলি।

দেশের উন্নতি বিধান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে সুসংহত, সুনির্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতি গ্রহণ করে তাকে জাতীয় নীতি (national policy) বলে। এই জাতীয় নীতিকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি প্রকৃতপক্ষে একই জাতীয় নীতি বা national policy-র দুটি বই তাই এই দুটি নীতিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না।

সরকারের দায়িত্ব এই দুটি নীতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা। কেননা এই দুটি নীতির উদ্দেশ্যও অভিন্ন — দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা, দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা। মোট কথা, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় উন্নয়নের বিষয়সমূহের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়। সেই কারণে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সাথে বিদেশনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির বিষয়বস্তু, কিন্তু এই পরিকল্পনার সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের। তেমনি ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫, ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক কালে (১৯৯৯ সালে) কার্গিল সংঘর্ষের জন্য ভারতের সামরিক ব্যয়-বরাদ্দের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তার ফলে অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য রাজস্ব সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে, সুতরাং কোন দেশের বৈদেশিক নীতিকে তার অভ্যন্তরীণ নীতি থেকে পৃথক করা যায় না।

১.২.১ বিদেশ নীতির কয়েকটি সংজ্ঞা

কে. জে. হলস্টির (K. J. Holsti) মতে বৈদেশিক নীতির অর্থ কোন ভাবেই স্বতঃসিদ্ধ নয়। (The meaning of the term foreign policy is itself by no means self-evident - - - - .) বিদেশনীতি সম্পর্কে কয়েকটি বিখ্যাত এবং প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলে হলস্টির এই বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

বিদেশনীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হার্টম্যান (Hartman) বলেছেন বিদেশনীতি হ'ল স্বেচ্ছাকৃতভাবে মনোনীত জাতীয় স্বার্থ বিষয়ে সুসংবদ্ধ বিবৃতি। ("A foreign policy is a systematic statement of deliberately selected national interests") তাঁর মতে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্র সমূহ যে

বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নীতি গ্রহণ করে তাকে বিদেশনীতি বলা হয়। জর্জ মডেলস্কির (George Modelski) সংজ্ঞাতে রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা অন্য রাষ্ট্রের আচরণের পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিজস্ব কাজকর্ম মানিয়ে নেওয়ার উপরই জোর দেওয়া হয়। ("Foreign policy is the systematic activities evolved by communities for changing the behaviour of other states and for adjusting their own activities to the environment.") প্যাডেল ফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln) বলেছেন, বিদেশনীতি বলতে স্রোতের সেই মূল উপাদানকে বোঝায় যার দ্বারা কোন রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও স্বার্থকে বাস্তবায়িত করে। চার্লস বার্টন মার্শাল (Charles Burton Marshall) বলেছেন যে বিদেশনীতি বলতে কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সমষ্টিকে বোঝায় না। কোন রাষ্ট্র যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করছে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা করতে চাইছে তাদের সমষ্টিকেই বিদেশনীতি বলা হয়। সুতরাং বিদেশনীতি হ'ল রাষ্ট্রীয় সীমানার অগ্রবর্তী অঞ্চল, সেখানকার জনগণ ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে গৃহীত কতকগুলি পছন্দের নির্দেশিকা। (Foreign Policy is thus a set of guides to choices being made about people, places, and things beyond the boundaries of the state.)

বিদেশনীতির উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে এই অনুমতিতে পৌছানো যায় যে বিদেশনীতিকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে বিদেশনীতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার সাথে জড়িত। তাই বিদেশনীতি হ'ল রাষ্ট্রের এক্তিয়ার বহির্ভূত মানবিক আচরণকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। সেলেইচার মনে করেন, ব্যাপক অর্থে বিদেশনীতি হ'ল বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকলাপ, অনেক লেখকের মতে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, মতাদর্শগত কিংবা সাংস্কৃতিক লক্ষ্য থাকে এবং সেইকারণে বিদেশনীতি কথাটা ব্যবহার না করে বৈদেশিক নীতিসমূহ (foreign policies) বলা উচিত।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি — কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক — উভয় পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি প্রণীত হয়। উভয় পরিবেশের নির্ধারক উপাদানগুলির গতিশীলতা ও নিরন্তর পুনর্বিন্যাসের দরুন কোন রাষ্ট্রের বিদেশনীতি চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হতে পারে না।

সুতরাং বিদেশনীতি একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের আচার আচরণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। আর সেই চেষ্টা চলে নিরন্তর — কোন বিশেষ দিন ক্ষণে বা কোন সরকারের পতনের সাথে সেই দেশের বিদেশনীতির সমাপ্তি ঘটে না। বিদেশনীতি হ'ল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রেখে এবং অসংখ্য নির্ধারক উপাদানের বহুমুখী ও গতিশীল আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিদেশনীতি নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়।

১.৩ বিদেশ নীতির উদ্দেশ্য

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিদেশনীতির কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য সমূহ স্বল্পকালীন (short-term) ও দীর্ঘকালীন (long-term) হয় এবং উদ্দেশ্যের প্রকারভেদও হয়। বিদেশনীতির লক্ষ্য ব্যক্তি বা বিশেষ কোন স্বার্থগোষ্ঠী (interest group), সমাজ-রাষ্ট্র বা সরকারের কল্যাণ সাধন করা। মার্কিন বিদেশ সচিব শ্রীমতী ম্যাডিলিন অলব্রাইট (Madeleine Albright) বলেছেন মার্কিন বিদেশনীতির স্থায়ী উদ্দেশ্য হ'ল দেশের নাগরিকদের, দেশের ভূখণ্ডকে, জনগণের পেশাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদের সুরক্ষিত করা।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কোন রাষ্ট্র সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে বিদেশনীতি গঠন করতে পারে না। এই 'কল্যাণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। জাতীয় নিরাপত্তা (national security) সংক্রান্ত প্রশ্নটি যেকোন দেশের বিদেশনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়টির চরিত্র বদলে গেছে। এখন নিরাপত্তা বিষয়টিকে সুরক্ষিত করার জন্য তিন ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এই তিন ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বিদেশনীতি স্থির করা হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিটি রাষ্ট্র তার ভাবমূর্তি (Image) গড়ে তোলার বিষয়ে নিরন্তর চেষ্টা করে। অন্য রাষ্ট্রের কাছে নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করেই বিদেশনীতি গঠিত হয়। আরনল্ড উল্‌ফারস (Arnold Wolfers) বিদেশনীতির অধিকৃত লক্ষ্য (Possession goals) এবং পরিবেশগত লক্ষ্য (milien goals)-র কথা বলেছেন। অধিকৃত লক্ষ্য বলতে তিনি সেই সমস্ত লক্ষ্যগুলিকে উল্লেখ করেছেন বা বিদেশনীতি তার অভ্যন্তরীণ অধিকৃত বিষয়সমূহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। যেমন রাষ্ট্রের আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সামাজিক কাঠামো, সরকারি কাঠামো ইত্যাদি। পরিবেশগত লক্ষ্য বলতে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে বুঝিয়েছেন যা কোন রাষ্ট্র তার জাতীয় সীমানার বাইরে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অর্জন করতে চায়। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, বিশ্বরাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশগত লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হলস্‌টি (K. J. Holsti) বিদেশনীতির তিনরকমের উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন— (১) মৌলিক মূল্যবোধ (Core Values), (২) মাঝারি-পাল্লার লক্ষ্য (Middle range goals) এবং (৩) দূর পাল্লার লক্ষ্য (Universal range goals)।

মৌলিক মূল্যবোধ বলতে সেইসব মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যকে বোঝায় যেগুলির জন্য কোন রাষ্ট্র ও তার জনগণ চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। মৌলিক মূল্যবোধ কোন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নের সাথে জড়িত থাকে। যে কোন জাতি-রাষ্ট্রের বিদেশনীতির মৌলিক লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতাকে রক্ষা করা এবং জনগণের মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত ও বর্ণগত ঐক্যকে সুরক্ষিত করা এবং সেই সাথে যুক্ত করা হয় অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মৌলিক লক্ষ্যকে।

মাঝারি পাল্লার লক্ষ্যকে হলস্‌টি প্রধানতঃ তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়েই অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারিত করা হয় এবং বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ল সামরিক শক্তিকে সুরক্ষিত করা এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। তৃতীয় মাঝারি-পাল্লার লক্ষ্য হল উপনিবেশ, অনুগত রাষ্ট্র বা প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা।

বিশ্বব্যাপী দূরপাল্লার লক্ষ্য বলতে বোঝায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা। উদাহরণস্বরূপ অর্থনীতির বিশ্বায়নের (globalisation of economy) কথা বলা যায়।

বিদেশনীতির উদ্দেশ্যগুলি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য যেমন বিদেশনীতির লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে তেমনই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও পরিমণ্ডল বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্থির করতে সাহায্য করে। নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি সম্পর্ককে বদলে দিয়েছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশের বিদেশনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। সুতরাং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে কোন দেশ তার বিদেশনীতিকে গঠিত ও পুনর্গঠিত করে।

১.৪ বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি

কোন দেশের বিদেশনীতি সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক সামর্থ্য, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহ্য, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক মতবাদ ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়। আমরা জানি যে কোন দেশের বিদেশনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও স্বল্পকালীন লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং দলের মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণত যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন তাঁরাই বিদেশনীতি গঠন করেন। তাই নীতি-নির্ধারক-মণ্ডলীর (decision making body) পছন্দের দ্বারাই বিদেশনীতি অনেকাংশে প্রভাবিত হয়।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর শাসনকালে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি অনেকটাই তাঁর নিজস্ব পছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তবে বিদেশনীতি গঠনের বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের পছন্দের অবাধ স্বাধীনতা থাকে না। কোনও সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিশ্বজনীন বাস্তব অবস্থাকে অবহেলা করে বিদেশনীতি গঠন করতে পারে না। নীতি-নির্ধারকরা বিদেশনীতি প্রণয়নে বিশেষ অবস্থায় যা করা

সম্ভব তাই করেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে নীতি-নির্ধারণ করেন। এই কাজটি আদৌ সহজ নয়, কিন্তু বিদেশনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ঐক্যমত তৈরি করতে না পারলে কোন বিদেশনীতি সমস্ত দেশের সমর্থন লাভ করতে পারে না। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ (non-aligned) বিদেশনীতি জওহরলাল নেহেরুর সময়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়। দেশের জনগণের আস্থা, রাজনৈতিক ধারণা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এই নীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তিভূমি আছে।

কোন দেশের বিদেশনীতি (Foreign Policy) ও নিরাপত্তা নীতি (Security Policy) (যা কখনও আলাদা করা যায় না) গঠন করার সময়ে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, আয়তন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ভূখণ্ডগত সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে হিমালয়, ভারত-মহাসাগর, ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-চীন সীমারেখা—এক কথায় ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অগ্রাহ্য করে কোন সরকারই বিদেশনীতি গঠন করতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছে সামরিক সামর্থ্যের প্রশ্ন। নিজের, বন্ধু রাষ্ট্রের ও শত্রুর সামরিক ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করে কোন দেশের বিদেশনীতি স্থির করা হয়। আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক দেশকেই অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। বহু দেশকেই কাঁচামাল, খাদ্য ও যন্ত্রাংশ আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন বিদেশনীতি গঠন করার সময় এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখতেই হয়।

কোন দেশের বিদেশনীতির উপর সেই দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) ও বর্ণবৈষম্যবাদ (apartheid)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির বৈদেশিক নীতির মধ্যে। এর মূল কারণ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস।

বিদেশনীতি গঠনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যখন কোন বিষয়ে দেশের মধ্যে জনগণের অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে তখন সরকার বিদেশনীতির বিষয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে জনগণের মনোযোগ ভিন্নমুখী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পাকিস্তান সরকার তার আব্যন্তরীণ সমস্যা সমূহ যেমন জাতিগত দাঙ্গা (ethnic riots), অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে কিছু পাকিস্তানী জনগণের 'ভারত-বিদ্বেষ' মনোভাবকে মূলধন করে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কার্গিল, বাটালিক ও অন্যান্য সেক্টরে ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে সমস্ত পাকিস্তানী জনগণের মনোযোগ সেইদিকে নিক্ষিপ্ত হয়।

এ সমস্ত কারণ ছাড়াও বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্ত দেশের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে স্নায়ু যুদ্ধ (Cold

war) চলেছিল তা সমস্ত দেশের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। বিদেশনীতি গঠন করার আগে কোনও দেশের সরকারকে বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হয় এবং অন্যান্য দেশের উদ্দেশ্যকে ভাল করে বুঝতে হয়। সেই কারণে প্রত্যেক সরকার প্রকাশ্যে এবং গোয়েন্দা দপ্তরের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। তবে যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা হয় তার ব্যাখ্যা নিয়েও নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাই অনেক সময়ে তথ্যের উপর নির্ভর না করে অন্য দেশের ভাবমূর্তির (image) উপর নির্ভর করে কোনও দেশের বিদেশনীতি স্থিরীকৃত হয়। যেমন পাকিস্তানের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি হল—ভারত একটি শত্রু দেশ। সুতরাং ভারত সরকার যাই করুক না কেন পাকিস্তান সে কাজের বিশ্লেষণ না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে ভারত পাকিস্তান বিরোধী কাজকর্ম করছে। পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মনোভাবও প্রায়শই এই ধরনের। সেই কারণে যোশেফ ফ্র্যাঙ্কেল বলেছেন বিস্তারিত তথ্য নয়, ভাবমূর্তিই দেশের রাজনৈতিক আচরণকে পরিচালিত করে। ("Images, not detailed information, govern political behaviour").

১.৫ বিদেশ নীতির বিভিন্ন নির্ধারক

বিদেশ নীতি নির্ধারণকারীদের বহু বিষয়ে বিচার বিবেচনার পর বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। নানাবিধ উপাদানের দ্বারা-তাঁদের পছন্দ প্রভাবিত হয়। যে সকল উপাদানের দ্বারা বিদেশনীতি প্রভাবিত হয় তাদের বিদেশনীতির নির্ধারক বলা হয় এবং এই নির্ধারকগুলি হয় নানা ধরণের। যেমন— ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান (geographical-strategic location), জনসংখ্যা (population), অর্থনৈতিক উন্নতির পর্যায় (levels of economic development), মতাদর্শ (ideology), সামরিক সামর্থ্য (military capability), ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার (historical inheritance), সরকার (government), জাতীয় নেতৃত্ব (national leadership) ও কূটনীতির গুণমান (quality of diplomacy) এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ।

কোন রাষ্ট্রের বিদেশনীতি গঠনে কোন বিশেষ উপাদান প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। একাধিক উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রধান এবং কোনওটি গৌণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনও উপাদানের গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে। অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে ভৌগোলিক-সামরিক উপাদান বিদেশনীতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূল ইউরোপের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিল। ভৌগোলিক অবস্থান রাশিয়ার বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি তার ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আফগানিস্থানের ভৌগোলিক সামরিক অবস্থিতির দরুন রাশিয়া এবং বর্তমানে পাকিস্তান তালিবানদের সহায়তায় সেই দেশের উপর প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

বিদেশনীতির উপর ভৌগোলিক উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ. জে. পি. টেইলর (A. J. P. Taylor)-এর মতে কোন রাষ্ট্রের বিদেশনীতি তার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণের দ্বারা গঠিত হয়।

কোন রাষ্ট্রের ইতিহাস সেই দেশের বিদেশনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারত বিভাজনের মধ্যে দিয়েই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা ও পারস্পরিক সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। পাক-আফগান সীমান্ত বিরোধ ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের কারণ সেই দেশের উপনিবেশিক ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন দেশের ঐতিহ্য সেই দেশের বিদেশনীতিকে যথেষ্টরূপে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হ'ল সহনশীলতা ও শান্তির প্রতি নিষ্ঠা। ভারত শান্তির পূজারী বলেই ভারতীয় বিদেশনীতির অন্যতম স্তম্ভ হ'ল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষা করা।

অর্থনৈতিক অবস্থা কোন দেশের বিদেশনীতির অন্যতম নির্ধারক। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশ স্বাধীন বিদেশনীতি সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

কোন দেশের জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতি বিদেশনীতি গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। অনেকে মনে করেন হঠকারিতা মার্কিন চরিত্রের এবং সতর্কতা রাশিয়ার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের মিল আছে বলেই উভয় দেশ বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একধরনের সমজাতীয় মনোভাব পোষণ করে। আবার সংস্কৃতিগত মিল থাকা সত্ত্বেও এক অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়।

জাতীয় স্বার্থ (national interest) বিদেশনীতিকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জাতীয় স্বার্থের ধারণা বিদেশনীতির কেন্দ্রীয় ধারণায় পরিণত হয়েছে। বিদেশনীতি গঠনে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে যোশেফ ফ্র্যাঙ্কেল মন্তব্য করেছেন — জাতীয় স্বার্থ বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মুখ্য-ধারণা। জাতীয় স্বার্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। জাতীয় স্বার্থের ধারণা প্রকৃত পক্ষে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এবং এটি একটি আপেক্ষিক ধারণা, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই জাতীয় স্বার্থ গড়ে ওঠে। জাতীয় গৌরব, ক্ষমতা ও জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে উপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বর্তমান শতাব্দীতেও দেখা যাচ্ছে জাতীয় স্বার্থের নামে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের জন্য। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কোটি-কোটি নিরন্ন মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও রোগের বিরুদ্ধে।

জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে মরগেনথাউ (Morgenthau) ফ্র্যাঙ্কেল এবং লারচে ও সৈদের (Larche and Said) দৃষ্টিভঙ্গীগুলি বিশ্লেষণ করলে এই বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্বার্থকে অনেকে জাতীয় মূল্যবোধের সমষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। জাতীয় স্বার্থ বলতে সেইসব সাধারণ ও

নিরবচ্ছিন্ন উদ্দেশ্যকে বোঝায় যেগুলি অর্জনের জন্য রাষ্ট্র সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। জাতীয় স্বার্থ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে; যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। জাতীয় স্বার্থ সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। কোন রাষ্ট্রই নিঃস্বার্থভাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না। জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতেই প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদেশনীতি সেই স্বার্থরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আন্তর্জাতিক পরিবেশে কোন রাষ্ট্র নিজের ভূমিকা সম্পর্কে যে মনোভাব গড়ে তোলে অথবা যে ধরণের ভূমিকা পালনে উৎসাহী, তার উপর নির্ভর করেই তার বিদেশনীতির রূপরেখা গঠিত হয়। জাতীয় ভূমিকার ধারণা এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

মতাদর্শ (ideology)-কে বিদেশনীতির অন্যতম নির্ধারক হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থাই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে অনুসরণ করে চলে। কোন রাষ্ট্রের মূল্যবোধ, নীতি, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঐ মতাদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হয়। মতাদর্শ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি ও মূল্যবোধকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, বিদেশ নীতি ও মতাদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মতাদর্শের পার্থক্যের জন্যই পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। আবার এই দু-দেশের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন-সোভিয়েত বিরোধকে কাজে লাগিয়ে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শের এই সূক্ষ্ম লড়াই চলে নিরন্তর।

জনমত বিদেশনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু জনমত এককভাবে বিদেশনীতি নির্ধারণ করতে পারে না। বিদেশনীতি ও জনমত প্রসঙ্গে মার্কিন গবেষক ব্যারি হিউজেস (Barry Huges) তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে মার্কিন বিদেশনীতি নির্ধারণে জনমতের ভূমিকা যৎসামান্য (minimal)। শতকরা ৩০ জন মার্কিন জনগণ বিদেশনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। শতকরা ৪৫ জন মার্কিন নাগরিক বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খোঁজ খবর রাখেন, কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিশদ কিছু জানেন না। ২৫ শতাংশ মার্কিন ভোটার বিদেশনীতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন। এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা এক থেকে দুজন নাগরিক জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বিশ্বজনমতও বিদেশনীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করে। কিছুটা বিশ্বজনমতের চাপেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া আণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এবং পরবর্তীকালে আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখন জনমনত গড়ে তুলতে চাইছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে।

প্রতিবেশী দেশের নীতি কোন রাষ্ট্রের বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ভারতের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

জেমস রোজনো (James Rosenau) বিদেশনীতির নির্ধারকগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তনশীল বিষয়ের কথা বলেছেন। যেমন —

(১) মেজাজি বিষয় (idiosyncratic variables)

(২) ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয় (role variables)

(৩) আমলাতান্ত্রিক বিষয় (bureaucratic variables) ও

(৪) ব্যবস্থাপক বিষয় (systemic variables)

মেজাজি বিষয়ের মধ্যে তিনি বিদেশনীতি প্রণয়নকারীদের সতর্কতা বনাম হঠকারিতা, ক্রোধ বনাম বিচক্ষণতা, অহংকার বনাম সুবিধাবাদিতা প্রভৃতির কথা বলেছেন।

ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্যদের ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে।

আমলাতান্ত্রিক বিষয়ের মধ্যে সরকারের কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি এবং বিদেশনীতির উপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপক বিষয়ের মধ্যে রোজ্না ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক ও আন্তর্জাতিক নির্ধারকের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক কাঠামো, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিভিন্ন রাষ্ট্রজোট এবং অন্যান্য দেশের কার্যকলাপ। সুতরাং প্রত্যেক দেশের বিদেশনীতি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

১.৬ বিদেশ নীতির গঠন

বিদেশনীতি কি ভাবে গঠিত হয়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। বিদেশনীতির গঠন প্রক্রিয়া অতীব জটিল। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের এক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়েই বিদেশনীতি প্রণীত হয়। অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক পরিবেশ এককভাবে বিদেশনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। বিদেশনীতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে নিরন্তর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই কারণেই বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দেশের অভ্যন্তরীণ দাবি, চাপ, জাতীয় স্বার্থ এবং লক্ষ্যের বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তন আন্তর্জাতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে প্রভাবিত করে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হবার পর বেনজির ভুট্টো প্রাক্তন জেনারেল জিয়া-উল-হকের অভ্যন্তরীণ নীতির কিছু পরিবর্তন করেন, তিনি ভারতের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের নীতি ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৮৮ সালে দুদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় তিনটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তার ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে জমা বরফ গলতে শুরু করেছিল।

একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিদেশনীতি গঠনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ধরণকে সহজে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বিদেশ নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা
(The Foreign Policy System)

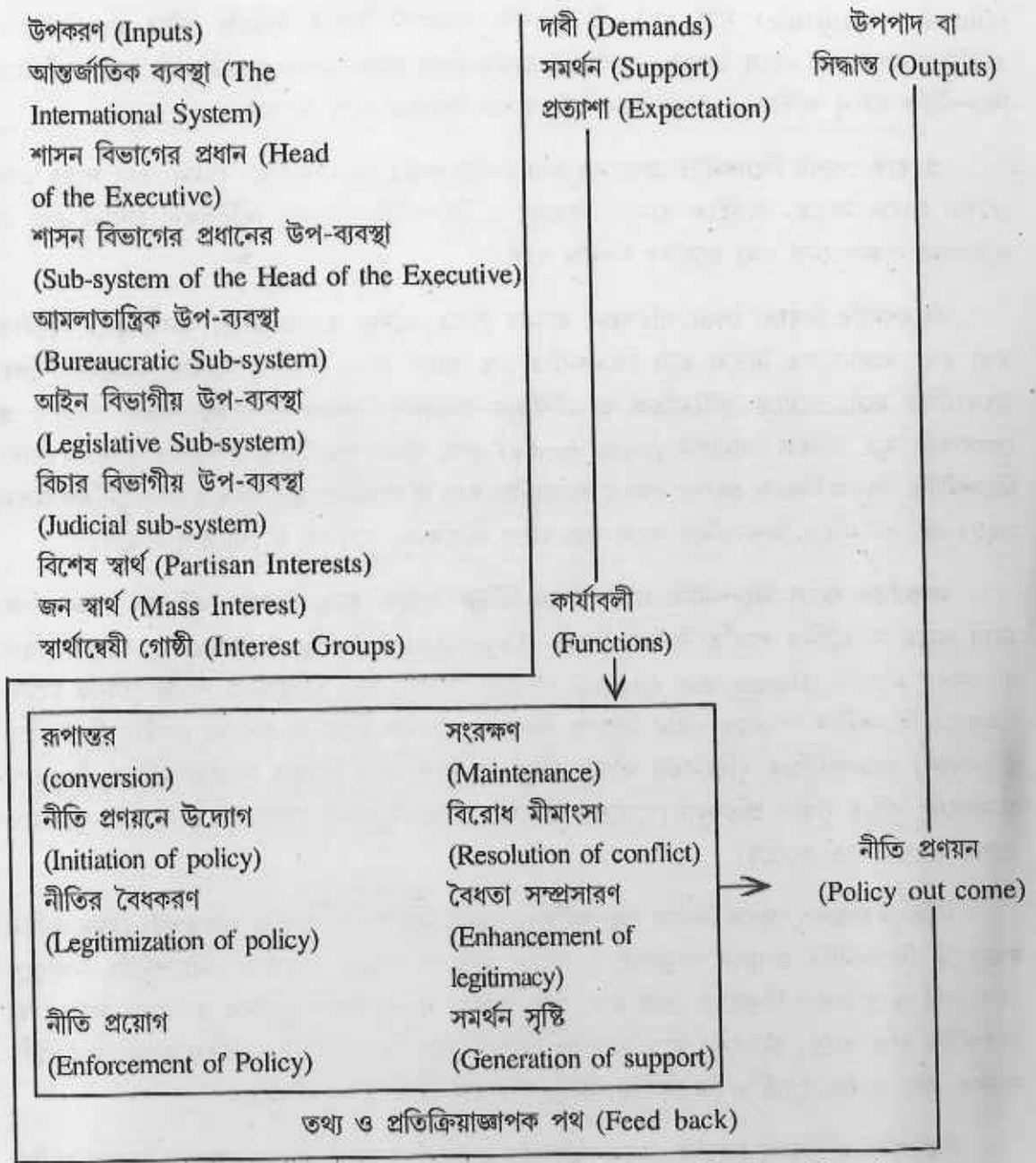

রেখাচিত্রের সূত্র : নির্মলকান্তি ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পৃঃ ১৬৯ শ্রীভূমি পাবলিশার্স।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, শাসন বিভাগের প্রধান, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের উপব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক উপব্যবস্থা, বিশেষ স্বার্থ ও জনস্বার্থ নিয়ে বিদেশনীতির উপকরণ কাঠামো (Input - stucture) তৈরি হয়। পাশাপাশি সমর্থন ও প্রত্যাশার সাথে রূপান্তর, নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ, নীতির ব্যাখ্যা, বৈধকরণ, সংরক্ষণ, বিরোধ মীমাংসা এবং সমর্থন বিষয়ক কর্মকাণ্ড নিয়ে উপপাদ-কাঠামো (Output - structure) সৃষ্টি হয়। এই উপপাদ কাঠামোর মধ্যেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তথ্য ও প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপক পথ বেয়ে উপপদ - কাঠামো আবার ফিরে আসে উপকরণ কাঠামোর মধ্যে। এইভাবে বিদেশনীতি গঠনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া চলে নিরন্তর।

প্রত্যেক দেশেই বিদেশনীতি প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যেমন, তথ্য সংগ্রহ এবং গোপন সংবাদ সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিদেশনীতি বিষয়ক কোন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের প্রযোজনীয়তা অনস্বীকার্য। সংগৃহীত তথ্য এবং সংবাদ যত নির্ভুল হবে বিদেশনীতি তত সফল হবে। তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি, গোয়েন্দা সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সূত্র, বিভিন্ন গণমাধ্যম (mass media) এবং কূটনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত রচনা ইত্যাদি। বিদেশনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদের মূল উৎস হ'ল কূটনৈতিক মিশন সমূহ। এই কূটনৈতিক মিশনগুলির সাথে যুক্ত থাকে বাণিজ্যিক, সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগ।

সাম্প্রতিক কালে বিদেশনীতি গঠন বিষয়ে বিভিন্ন 'মডেল' গড়ে উঠেছে। এই সব মডেলগুলির মধ্যে আছে সাংগঠনিক পদ্ধতি বিষয়ক মডেল (Organisational-process Model), আমলাতান্ত্রিক যুক্তিনির্ভর মডেলই (Bureacratic rational Model) উল্লেখযোগ্য। সাংগঠনিক পদ্ধতি বিষয়ক মডেল অনুসারে বিদেশনীতি সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মিথস্ক্রিয়ার প্রতিফলন। আমলাতান্ত্রিক যুক্তিনির্ভর মডেল অনুসারে বিদেশনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আমলাদের বুদ্ধিও যুক্তির প্রতিফলন। যোশেফ ফ্রাংকেল বলেছেন এই দু-ধরনের মডেলই সারা পৃথিবীতে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশনীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রপতি ও বিদেশ সচিবের ক্ষমতা অসামান্য। বিদেশনীতি নির্ধারণে বেসরকারি স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলে, কিন্তু শুধুমাত্র সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। অনেকের মতে আণবিক বিজ্ঞানী, সামরিক বাহিনী, অর্থনৈতিক সংস্থা, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত এবং জাতীয় গোষ্ঠীও বিদেশনীতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান, বিদেশমন্ত্রী, বিদেশ দপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর, আইন সভা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৬.১ বিদেশ নীতি প্রণয়নে সরকার প্রধান ও বিদেশ মন্ত্রীর ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের প্রধানের অন্যতম গুরুদায়িত্ব হ'ল বিদেশনীতি গঠন করা ও প্রয়োগ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের শাসনতন্ত্র প্রচলিত এবং সেই কারণেই বিদেশনীতির গঠন পদ্ধতি সব দেশে একরকম নয়। কিন্তু সমস্ত দেশেই শাসন বিভাগই বিদেশনীতির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকারের প্রধান। সেই কারণে তিনিই বিদেশনীতির প্রধান স্তম্ভ। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কথা বলা যায়। বিদেশনীতি প্রণয়নে ও রূপায়ণে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের উপর বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে বিদেশ সচিব বা Secretary of State বলা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন কোন রাষ্ট্রপতি বিদেশ সচিবের উপর বিশেষ নির্ভর না করে নিজেই বিদেশনীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট (১৯৩৩ - ১৯৪৫) বিদেশ সচিব কর্ডেল হালের সাথে পরামর্শ না করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। আবার এর বিপরীত ছবি দেখা যায় আমেরিকার ৩৪তম রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ারের কার্যকালে (১৯৫৩ - ১৯৬১)। বিদেশনীতি নির্ধারণের বিষয়ে তিনি গভীরভাবে নির্ভর করতেন বিদেশ সচিব জন ফস্টার ডালেস-এর উপর।

ব্রিটেনে রাণী বা ভারতে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও দুটি দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বদেশে এবং বিদেশে বৈদেশিক নীতির মুখ্য প্রবক্তা হিসাবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার গঠন করেন এবং সেই মন্ত্রীসভায় বিদেশনীতি পরিচালনার জন্য একজন বিদেশমন্ত্রী থাকেন। ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে ক্যাবিনেট বিদেশনীতি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশিকা দেয়। ক্যাবিনেটের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটিই মূল কাজটি করে। অনেক সময় ক্যাবিনেটের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী বিদেশনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি ইডেন মন্ত্রীসভার সাথে পরামর্শ না করেই ইজিপ্টের বিরুদ্ধে সুয়েজ অভিযান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন একত্র হয়ে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে তখন সরকার প্রধানের ক্ষমতা ও ভূমিকা অনেকটাই হ্রাস পায়। সরকারের সাথে জড়িত দল বা দলসমূহের মতামত নিয়েই সরকার প্রধানকে কাজ করতে হয়। সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে এরকম একটা ঝোঁক বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের একটি বিশেষ কমিটি আছে যার নাম Political Affairs কমিটি। মন্ত্রীসভার সকল সদস্য বিদেশনীতি গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না

করলেও প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে চলতে হয়।

১.৬.২ বিদেশনীতি গঠনে আইনসভার ভূমিকা

বিদেশনীতি গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য থাকে। আইনসভার ভূমিকা অনেকটাই নির্ভর করে একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রের উপর। আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ শুধু সাংবিধানিক ক্ষমতার উপরও নির্ভর করে না। আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সদস্যদের উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিত্বের উপরও আইনসভার ভূমিকা অনেকটা নির্ভর করে।

ব্রিটেনে বা ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিদেশনীতি নির্ধারণে সংসদকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ব্রিটেনে রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিয়োগ, চুক্তি-স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে সব ক্ষমতা থাকে শাসনবিভাগের হাতে। সংসদ কোন নিয়োগ বা চুক্তিকে বাতিল করতে পারে না। তবে সংসদ বিতর্কের মাধ্যমে সরকারি নীতির সমালোচনা করতে পারে বা কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কমন্স সভার স্থায়ী কমিটির ভূমিকা পরামর্শদাতার।

ভারতে সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যদের নিয়ে বিদেশনীতি বিষয়ক যে পরামর্শদাতা কমিটি আছে সেই কমিটি শুধু সুপারিশ করতে পারে। সেই সুপারিশ সরকার গ্রহণ করতেও পারে। কিংবা বর্জন করতেও পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতি অনুসারে মার্কিন কংগ্রেস (সংসদ) বিদেশনীতি নিরূপণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটের বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেনেটের অনুমোদন ছাড়া শাসনবিভাগ দ্বারা স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি, রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিয়োগ বা যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিদেশে যে রাষ্ট্রদূত বা কন্সাল নিয়োগ করেন তাতে সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সেনেটের বিদেশনীতি বিষয়ক কমিটি এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী। এই কমিটির সভাপতি তুলনামূলকভাবে কখনও কখনও বিদেশ সচিবের তুলনায় বেশি প্রভাব বিস্তার করেন। সেনেটের সদস্যদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেই মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বিদেশনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

বিভিন্ন কমিটিগুলির মধ্য দিয়ে মার্কিন কংগ্রেস বিদেশনীতি নিরূপণে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটিগুলির অর্ধেকই আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। তার মধ্যে কয়েকটি কমিটি, যেমন — বিদেশ সংক্রান্ত কমিটি, সেনাবাহিনী সংক্রান্ত কমিটি বা বিশেষ কর্মে নিয়োজন সংক্রান্ত কমিটি (Appropriations Committee) বিদেশনীতি বিষয়ের সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার বিদেশনীতি বিষয়ে যে ক্ষমতা ভোগ করে অন্য কোন দেশের আইনসভা তা পারে না।

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকা যতটা তাত্ত্বিক, ততটা বাস্তব নয়। আইনসভার আয়তন বড় ও অধিবেশনের সময় সীমিত বলেই অনেক ক্ষেত্রে আইনসভা বিদেশনীতির মত জটিল বিষয়ে কোন বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

১.৬.৩ বিদেশ নীতি প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

বিদেশনীতি প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের, বিশেষ করে বিদেশ দপ্তরে নিযুক্ত আমলাদের প্রভাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশমন্ত্রী বা বিদেশ সচিবের নেতৃত্বে বিদেশ দপ্তর পরিচালিত হয়। তত্ত্বগতভাবে সরকারের প্রধান, বিদেশমন্ত্রী বা বিদেশ সচিব বিদেশনীতি গঠন করেন এবং আমলারা সেই নীতি বাস্তবে রূপায়িত করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিদেশনীতি নিরূপণ ও প্রয়োগের মধ্যে সীমারেখা বজায় রাখা কঠিন। বিদেশমন্ত্রী বৈদেশিক বিষয়ে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি নন। বৈদেশিক বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ নাও হতে পারেন। তাই তিনি অভিজ্ঞ আমলাদের উপর নির্ভর করেন। বিদেশ মন্ত্রী তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে উপেক্ষা করে বিভাগীয় নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে পারেন না। তবে বিদেশনীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আমলাদের পারস্পরিক ভূমিকা কি তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। যেখানে বিদেশমন্ত্রী ও আমলাদের মধ্যে কোন নীতিগত বা দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকে না সেখানে বিদেশনীতি সফলভাবে গঠিত ও রূপায়িত হতে পারে। ফ্র্যাঙ্কেলের মতে সামগ্রিকতাবাদী (totalitarian) দেশেই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সংকটের সময় একটি দেশের বৈদেশিক নীতিতে আমলাতন্ত্রের প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেই সময় আমলারাই জার্মানির বিদেশনীতিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একই কারণে ফ্রান্সে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বিদেশনীতির সাথে অভ্যন্তরীণ নীতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী — এঁদের সকলের সাথেই বিদেশনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত বিভাগের আমলারাও বিদেশনীতি নির্ধারণে কমবেশি অংশগ্রহণ করেন। বিদেশনীতি গঠনের বিষয়ে এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা একটি বড় সমস্যা। ফ্র্যাঙ্কেলের মতে এই সমস্ত কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রাচীর ভেঙে পড়ছে।

বর্তমানে বিদেশনীতির প্রয়োগ কাঠামো কিছুটা বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের ফলে এই বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। আজকাল এই মিশনগুলি কর্মস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-পর্ব শেষ করে স্বদেশের বৈদেশিক দপ্তরকে ঐ তথ্য রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়, এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিদেশ দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আধুনিক পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা যত বাড়ছে, কূটনৈতিক মিশন ও প্রতিনিধি এবং বিদেশ দপ্তরের আমলাদের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৬.৪ বিদেশ নীতি গঠনে অন্যান্য অধীনস্থ বিভাগ ও উপদেষ্টাদের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদেশনীতি গঠন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিদেশনীতি প্রণয়নের জটিল কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে সামরিক বিভাগ, আণবিক বিজ্ঞান দপ্তর, বিজ্ঞান দপ্তর, অর্থদপ্তর, গোয়েন্দা দপ্তর ও প্রচার দপ্তর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন মনে করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটেনে প্রতিরক্ষা দপ্তর বিদেশ দপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কোন দেশের বিদেশনীতি যদি আক্রমণাত্মক হয় তবে সামরিক বিভাগের গুরুত্ব খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় বিদেশ দপ্তর সামরিক বিভাগের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কিন্তু শান্তির সময়ে সামরিক দপ্তরের সাথে অসামরিক বিদেশ দপ্তরের সম্পর্ক কিরকম হবে তা নির্ভর করে সময়, স্থান ও ব্যক্তির উপর।

বর্তমানে বিজ্ঞানীগণের বিশেষ করে আণবিক বিজ্ঞানীদের দক্ষতা, সামরিকীকরণ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা বিদেশনীতির উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করছে। আণবিক বিজ্ঞানীরা বিদেশ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তাঁরা এই দপ্তরের প্রয়োজনমত চাপ ও প্রভাব বিস্তার করেন। বর্তমানে অনেক দেশেই সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবে আণবিক বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্বে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সামরিক পরামর্শদাতাদের সুপারিশ অনুসারে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বড় বড় দেশগুলি নয়, বিশ্বের অনেক দেশই আজ আণবিক শক্তিধর। ঐ সব দেশের বিদেশনীতিতে আণবিক বিজ্ঞানীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অর্থদপ্তরও বিদেশনীতি এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যত বাড়ছে, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান যত সম্প্রচারিত হচ্ছে, বিদেশনীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক ঋণ ও অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের এবং অর্থনৈতিক সংস্থার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Bureau of Budget, Trade - Commission, Tariff Commission বিদেশ দপ্তরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ দান করে।

বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিদেশ দপ্তরের সাথে গোয়েন্দা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কোন কোন দেশের বিদেশনীতিতে তাদের প্রভাব অপরিসীম। গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা। কিন্তু বর্তমানে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব এই কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশে সরকারের পতন ঘটাতে সাহায্য করা, নাশকতামূলক কাজকর্ম করা, প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে সাহায্য করা, বিদেশে তাঁবেদার সরকার গঠন করা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী

কার্যকলাপে মদত দেওয়া ইত্যাদি গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত দেশেই সামরিক ও অসামরিক গোয়েন্দা একই সাথে কাজ করতে পারে।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার Central Intelligence Agency (CIA) সাথে সামরিক বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা আছে। এই সংস্থা এতই ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী যে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র বিদেশনীতি প্রণয়নের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা Inter-Services Intelligence (ISI)-এর সাথে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং পাকিস্তানী বিদেশনীতি গঠনে (ISI) এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন ও পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকাণ্ড সরকারি নীতিও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সি. আই. এর কর্মকাণ্ডের জন্য মার্কিন সরকারের প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার খরচ হয়।

বিদেশনীতি প্রণয়ন ও পরিচালনার বিষয়ে প্রচার দপ্তরের গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সংযোগ ব্যবস্থা যত দ্রুত উন্নত হচ্ছে, প্রচারকার্যের প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত দেশের বিদেশ দপ্তর নিজ নীতির সপক্ষে মতামত সংগ্রহের জন্য বিদেশে প্রচার চালায়। প্রত্যেক দেশই প্রচারকে বিদেশনীতি রূপায়ণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার সম্পর্কিত দায়িত্ব থাকে American Information Resource Center-এর উপর। এই সংস্থা সারা বিশ্বে বহু গ্রন্থাগার-তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র পরিচালনা করে। অনুরূপভাবে British Council ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার জন্য বিদেশে প্রচারকার্য চালায়।

১.৬.৫ বিদেশ নীতিতে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা

বিদেশনীতি নির্ধারণে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলি বিদেশনীতি বিষয়ে নিজ দলের বক্তব্য পেশ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করলে তারা কি ধরনের বিদেশনীতি গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। কোন রাজনৈতিক দলের বাস্তবসম্মত বিদেশনীতি নির্বাচনে সেই দলের জয়লাভের পথকে প্রশস্ত করে। অনেক সময় বিদেশনীতির কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনে বিদেশনীতির মূল প্রশ্নে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও নিরস্ত্রীকরণ, জোট-নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়।

বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। আইনসভায় বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। তবে এ ব্যাপারে শাসকদলের মতামতের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কেননা

শাসকদল তাদের মতামতকে সরকারি নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে। অনেক সময় শাসকদল বিরোধী দলগুলির সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দলের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতির মত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিভিন্নভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি যেমন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি বিদেশনীতিকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করতে পারে এই গোষ্ঠীগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ বিদেশনীতির সাথে যুক্ত তারা মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন লবির মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শাসন বিভাগীয় স্তরেও স্বার্থগোষ্ঠী তাদের কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়। তারা বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বহুজাতিগত গোষ্ঠীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে রাসেল ওয়ারেন হাওই (Howe)র লেখা 'U.S. Pressure Groups' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ওয়াশিংটনের শক্তিশালী Zionist Lobby ইজরায়েল সম্পর্কে মার্কিন নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ভারতবর্ষ, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির বিদেশনীতিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষণীয়। বিদেশনীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, কোন দেশের বিদেশনীতি নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় না। তবে তার অর্থ এই নয় যে বিদেশনীতি অপরিবর্তনীয়। বিদেশনীতির মৌলিক কাঠামো ও নীতির কোন পরিবর্তন না ঘটলেও বিষয়গত পরিবর্তন সবসময় ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই নির্জোট নীতি অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু ভারতীয় বিদেশনীতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশক অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন, তৃতীয়বিশ্বে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করা, সামরিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতের বিদেশনীতিতে, বর্তমানে ভারতের বিদেশনীতিতে কাশ্মীর সমস্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে Vision - 2000 চুক্তি সম্পাদন করে ভারত মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে তাল রেখে নিজের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা — ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য হ'ল ক্রমাগত ভারত-বিরোধী মনোভাবকে পাকিস্তানের জনসমক্ষে তুলে ধরা, কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ ও ঊর্ধ্বগামী সমরসজ্জা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা।

কোন দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যেমন তার বিদেশনীতিকে বদলে দেয়, তেমনি আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলে প্রতিটি দেশকেই তার বিদেশনীতির পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হয়। স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বি-মেরুপ্রবণতাকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন দেশের বিদেশনীতির যে পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯৯১ সালের পর তার অবসান ঘটেছে।

পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রতিটি দেশের বিদেশনীতিই পরিবর্তনশীল। কখনও কোন বিশেষ লক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করে এবং বিদেশনীতির প্রান্তিক পরিবর্তন ঘটে। আবার কখনও বা বিদেশনীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বিদেশনীতি প্রণয়ন একটি জটিল পদ্ধতি। এই নীতি-প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণকারীদের প্রভাব, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মূল্যবোধের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ উপাদান বেশি গুরুত্ব লাভ করবে — তা নিশ্চয় করে বলা খুব কঠিন।

১.৭ সারাংশ

বিদেশনীতির গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল বিষয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের এক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিদেশনীতি প্রণীত হয়। কোনও রাষ্ট্র যখন এই নীতি গঠন করে তখন তার মধ্যে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলি স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন হয়। কোনও দেশের বিদেশনীতি সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক সামর্থ্য, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

বিদেশনীতির প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে এই অনুমিতিতে পৌঁছানো যায় যে বিদেশনীতিকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে বিভক্ত করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে বিদেশনীতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার সাথে জড়িত। ব্যাপক অর্থে বিদেশনীতি হ'ল রাষ্ট্রের এক্তিয়ার বহির্ভূত মানবিক আচরণকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। সুতরাং বিদেশনীতি একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। তাই বিদেশনীতি হ'ল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া — বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি।

বিদেশনীতির উদ্দেশ্যগুলি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য যেমন বিদেশনীতির লক্ষকে প্রভাবিত করে, তেমনই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ বিদেশনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির করতে সাহায্য করে।

আমরা জানি যে কোনও দেশের বিদেশনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও স্বল্পকালীন লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বিদেশনীতির সাথে জড়িত থাকে নিরাপত্তার নীতি বা গঠন করার সময় মনে রাখতে হয় সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, আয়তন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ভূখণ্ডগত সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়। ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে সামরিক সামর্থ্যের প্রশ্ন। নিজের, বন্ধু

রাষ্ট্রের ও শত্রুর সামরিক ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করে কোন দেশের বিদেশনীতি স্থির করা হয়। সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন বিদেশনীতি গঠন করার সময় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হয়। এই সমস্ত কারণ ছাড়াও বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্ত দেশের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে।

যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা বিদেশনীতি প্রভাবিত হয় তাকে বিদেশনীতির নির্ধারক বলা হয়। এই নির্ধারকসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হয় যেমন — ভৌগোলিক - সামরিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নতির পর্যায়, মতাদর্শ, সামরিক সামর্থ্য, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, সরকার, জাতীয় নেতৃত্বও কূটনীতির গুণমান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ, এই একাধিক নির্ধারকগুলির মধ্যে কোনওটি প্রধান এবং কোনওটি গৌণ উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে। জেমস রোজনো বিদেশনীতির নির্ধারণগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তনশীল বিষয়ের কথা বলেছেন, যেমন — মেজাজি বিষয়, ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়, আমলাতান্ত্রিক বিষয় এবং ব্যবস্থাপক বিষয়।

আমরা জানি যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের এক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিদেশনীতি প্রণীত হয়। কোন পরিবেশেই এককভাবে বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে না। প্রত্যেক দেশেই বিদেশনীতি প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যেমন — তথ্যসংগ্রহ, গোপন সংবাদ সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিদেশনীতির গঠন বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক পদ্ধতি বিষয়ক 'মডেল' ও আমলাতান্ত্রিক যুক্তিনির্ভর 'মডেল'-এর প্রচলন দেখা যায়।

বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের মতে আণবিক বিজ্ঞানী, সামরিক বাহিনী অর্থনৈতিক সংস্থা, জাতীয় গোষ্ঠী ও জনমত বিদেশনীতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান, বিদেশমন্ত্রী, বিদেশ দপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর, আইনসভা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত ইত্যাদি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বিদেশনীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহেই জটিল। এই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণকারীদের প্রভাব, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মূল্যবোধের নিবিড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ উপাদান বেশী প্রাধান্য লাভ করবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

১.৮ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ১। বিদেশনীতি কাকে বলে? জাতীয় নীতির সঙ্গে বিদেশনীতির সম্পর্ক কী? ১/১

২। জাতীয় স্বার্থ কাকে বলে? ৪/২

৩। বিদেশনীতি গঠনের বিষয়ে প্রধান মডেলগুলি কি কি? ৫/২

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার কোন্ কক্ষ বিদেশনীতি নির্ধারণে বেশি সক্রিয়?

৫। ভারতে মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রচার সংস্থাগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৬। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির দ্বারা বিদেশনীতি প্রভাবিত হয় কী?

(খ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ ১। বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২। বিদেশনীতি মূল ভিত্তিগুলি কী কী?

৩। বিদেশনীতি নির্ধারকগুলি কী কী? এদের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। বিদেশনীতির গঠনপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। বিদেশনীতি প্রণয়নে সরকার প্রধান ও বিদেশমন্ত্রীর ভূমিকা সম্যক ব্যাখ্যা করুন।

৬। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিদেশনীতি নির্ধারণে আইনসভার ভূমিকা কী?

৭। আধুনিক কালে বিদেশনীতি প্রণয়নের আমলাদের বিশেষ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় কেন?

৮। বিদেশনীতি গঠনে সমর ও গোয়েন্দা বিভাগ কি ধরনের কাজ করে থাকে?

৯। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

১.১৯ উত্তর সংকেত

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ ১। বিদেশনীতি শব্দটির মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ — (ক) বিদেশ (foreign) এবং (খ) নীতি (Policy)। প্রথম অংশটির সঙ্গে জড়িত আছে সার্বভৌমিকতা ও ভূখণ্ডের প্রশ্ন। দ্বিতীয় অংশটির সঙ্গে যুক্ত আছে কতকগুলি সিদ্ধান্ত যা অনেকাংশে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর পছন্দের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিদেশনীতি হ'ল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সীমারেখার বাইরে জনগণ, ভূখণ্ডও সরকার সম্পর্কে অনুসৃত পছন্দের নীতি যা সতত পরিবর্তনশীল। একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে নিয়মনীতি অনুযায়ী স্থাপিত হয় তাকেই আমরা বিদেশনীতি বলি। এই বিদেশনীতিকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যায়।

দেশের উন্নতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য সরকার যে সুসংহত, সুনির্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতি গ্রহণ করে তাকে আমরা জাতীয় নীতি বলি। জাতীয় নীতি আবার দুভাগে বিভক্ত — (১) অভ্যন্তরীণ নীতি ও (২) বৈদেশিক নীতি। জাতীয় নীতির দুটি বাহু হ'ল অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি। তাই এই দুটি নীতিকে কখনও পৃথক করা যায় না।

২। উত্তরের জন্য ৮৯.৫ অংশ দেখুন।

৩। উত্তরের জন্য ৮৯.৬ অংশের শেষের অনুচ্ছেদগুলি দেখুন।

৪। উত্তরের জন্য ৮৯.৬.২ - এর শেষের অংশ দেখুন।

৫। উত্তরের জন্য ৮৯.৬.৪ - এর শেষের অংশ দেখুন।

৬। উত্তরের জন্য ৮৯.৬.৫ - এর অংশের শেষের দিকে উত্তর পাবেন।

(খ) রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর ঃ ১। ৮৯.৩ অংশে পাবেন।

২। ৮৯.৪ অংশ দেখুন।

৩। ৮৯.৫ অংশে পাবেন।

৪। ৮৯.৬ অংশ দেখুন।

৫। ৮৯.৬.১ অংশে পাবেন।

৬। ৮৯.৬.২ অংশ দেখুন।

৭। ৮৯.৬.৩ অংশে পাবেন।

৮। ৮৯.৬.৪ অংশে পাবেন।

৯। ৮৯.৬.৫ অংশে দেখুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ড. গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৬।

(২) ড. রাধারমণ চক্রবর্তী (সম্পা.) *সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯৯।

(৩) নির্মল কান্তি ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৯৬।

(৪) প্রাণগোবিন্দ দাশ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৫।

(৫) শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা, ১৯৯২।

(৬) Joseph Frankel, *International Relations*, O.U.P. London, 1971।

(৭) Bruce Russett and Harvey Starr, *World Poitics*, Vakils, Feffer and Simons Ltd., Bombay, 1985।

একক ২ □ ভারতের বিদেশনীতি (Indian Foreign Policy)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ ভারতের বিদেশ নীতির গঠন

২.৩ ভারতীয় বিদেশ নীতির মূল লক্ষ্য সমূহ

২.৪ ভারতের বৈদেশিক নীতি নির্ধারক সমূহ

২.৫ ভারত-মার্কিন সম্পর্ক

২.৬ ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক

২.৭ ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

২.৭.১ ভারত - চীন সম্পর্ক

২.৭.২ ভারত - পাকিস্তান সম্পর্ক

২.৭.৩ ভারত - বাংলাদেশ সম্পর্ক

২.৭.৪ ভারত - শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক

২.৮ সারাংশ

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ উত্তর-সংকেত

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম কোনও দেশের বিদেশনীতির গঠন কতকগুলি তত্ত্বগত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে কি ভাবে সেইসকল তত্ত্বগত দিকগুলি কোন্ দেশের বিদেশনীতিতে প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষের বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করলে এই বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা যায়। এই এককটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন —

- ভারতের বিদেশনীতির গঠন

- ভারতীয় বিদেশনীতির লক্ষ্য
- ভারতের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারক সমূহ
- ভারত - মার্কিন সম্পর্ক
- ভারত - রাশিয়া সম্পর্ক
- ভারত - চীন সম্পর্ক
- ভারত - পাকিস্তান সম্পর্ক
- ভারত - বাংলাদেশ সম্পর্ক
- ভারত - শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক

২.১ প্রস্তাবনা

ভারতের বিদেশনীতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিদেশনীতির সাথে তার তুলনা চলে না। ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির আবহ, জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধের সংশ্লেষ সংমিশ্রণ (Synthesis) এবং পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের ভৌগোলিক-সামরিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব — এই সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে ভারতবর্ষের বিদেশনীতির মৌলিক কাঠামো তৈরি হযেছে। প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকলেও ভারতের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে এবং এই ঐতিহ্যের প্রধান ভিত্তিভূমি হ'ল অহিংসা ও নিরপেক্ষতা। তাই স্বাধীনতা অর্জনের কিছুকাল আগেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীন ভারতের সাথে বহির্বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের এক রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিল। তাই স্বাধীন ভারতের শাসকগোষ্ঠী ভারতের সেই সুমহান ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে বিদেশনীতি রূপায়িত করতে চান নি।

২.২ ভারতের বিদেশ নীতির গঠন

ভারতবর্ষের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের ভিত্তিতেই ভারতের বিদেশনীতির চরিত্র অনুধাবন করা যায়। ভারতের বিদেশনীতির গঠন কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। নিজের জাতীয় স্বার্থের সাথে অন্যান্য দেশের স্বার্থের সমন্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ভারতের বিদেশনীতির উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারত তার অনন্য বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অবিসংবাদিত শক্তি হিসাবে ভারত আজ

সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিদেশনীতির প্রধান ভিত্তি হ'ল জোট নিরপেক্ষতা (non-alignment)। ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠাও মানব কল্যাণের মহান আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীলের নীতি বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শের প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে সামরিক জোটের মাধ্যমে কখনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সামরিক জোট যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করে এবং পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য ফল একটাই — মানবজাতির ধ্বংস। তাই সমস্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানই ছিল জওহরলালের নীতি। তাঁর এই জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতি পাঁচটি মৌলিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই পাঁচটি মূল আদর্শ পঞ্চশীল নামেই বেশি পরিচিত। এই আদর্শগুলি হ'ল —

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার উপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা (Mutual respect for territorial integrity and sovereignty),

(২) অনাক্রমণ (Non-aggression),

(৩) অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা (Non-intervention),

(৪) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য (Equality and mutual assistance) এবং

(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existence)।

আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পঞ্চশীলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার ফলেই ভারত আজ বিশ্বের দরবারে নিজেকে শান্তির পূজারী বলে দাবি করতে পারে। নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদের অবসান, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগুলি তুলে ধরা এবং তা সমাধানের পথ খোঁজার ক্ষেত্রে ভারত এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা (উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশসমূহের মধ্যে আলোচনা), দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (উন্নয়নকামী দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা) এবং শান্তির জন্য আণবিক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের আগ্রহী ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২.৩ ভারতীয় বিদেশ নীতির মূল লক্ষ্য সমূহ

ভি. পি. দত্ত তাঁর India's Foreign Policy গ্রন্থে ভারতের বিদেশনীতির লক্ষ্যগুলি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বিদেশনীতির মূল লক্ষ্যগুলি হ'ল — জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংহতি ও সুরক্ষা, অন্য দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার, জাতীয় মর্যাদা রক্ষা, বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক সামর্থ্য অর্জন, বিশ্বশান্তি রক্ষা,

আণবিক যুদ্ধের প্রসার রোধ, শান্তির জন্য আণবিক শক্তির ব্যবহার, নিরস্ত্রীকরণ, জোট নিরপেক্ষ নীতিকে অবলম্বন করা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা, অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সমস্যার সমাধান।

যে কোন দেশের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — (১) মূল লক্ষ্য, (২) মধ্যবর্তী লক্ষ্য এবং (৩) দূরবর্তী লক্ষ্য। ভারতের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য হ'ল জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা; মধ্যবর্তী লক্ষ্য হ'ল অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দূরবর্তী লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভারতের আদর্শ ও স্বপ্ন অনুসারে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

ভারতের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করা। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'ল জাতীয় নিরাপত্তা। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অর্থ ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা, সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা এবং জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। জাতীয় স্বার্থের সাথে জড়িয়ে আছে জাতীয় উন্নয়নের বিষয়। এই জাতীয় উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে। জাতীয় স্বার্থের ধারণার সাথে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিষয়টিও জড়িত। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ যদি সমস্যা সঙ্কুল হয় তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বিঘ্নিত হতে পারে। সেই কারণে ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য এমন এক অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যাতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ণের কর্মসূচিও অব্যাহত থাকে।

ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, বিশ্বশান্তি বজায় রাখা ও নিরস্ত্রীকরণের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। এই উদ্দেশ্যে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামরিক জোটের নিন্দা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধিতা করা ভারতীয় বিদেশনীতির একটি বিশেষ লক্ষ্য। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির রিরোধিতা করা ভারতীয় বিদেশনীতির একটি বিশেষ লক্ষ্য। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটমান সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান ভারতীয় বিদেশনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত নীতি ও আদর্শের প্রতি ভারত পূর্ণ আস্থাশীল এবং ভারত মনে করে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের নিরপেক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া সম্ভব। এই উপমহাদেশের অগ্রণী এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত আজ তাই জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাশী।

জোট নিরপেক্ষতা ভারতের বিদেশনীতির স্তম্ভ স্বরূপ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই নীতিকে অনুসরণ করেছে। জোট নিরপেক্ষতা কোন নেতিবাচক ধারণা নয়। এটি একটি গতিশীল ও বিবর্তনশীল ধারণা। এই জোট নিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ বিশ্বের কোন শক্তি জোটের সাথে যুক্ত না থাকা। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিজোট থেকে দূরে থেকে প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিষয়কে যুক্তিনিষ্ঠভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করা। জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন যে জোট-নিরপেক্ষতা হ'ল চিন্তা বা আচরণের স্বাধীনতা বা বৃহত্তর স্বাধীনতারই অঙ্গ। (Non-alignment is freedom of action which is part of independence)।

বিভিন্ন কারণে ভারত জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে অনুসরণ করেছে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ভারতীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি কারণেই ভারত এই নীতিকে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ভারতের এই জোট-নিরপেক্ষ ভূমিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্জোট আন্দোলনে যোগদান করেছে। নির্জোট-আন্দোলন (Non-aligned Movement বা NAM) পরিচালনায় ভারতের বিশেষ অবদানের কথা স্মরণীয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নির্জোট আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের (এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার বিকাশশীল দেশসমূহ) ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

অনেক বিশ্লেষকের মতে নির্জোট আন্দোলন বা ন্যাম (NAM) আবির্ভূত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের মুখোমুখি হ'ল বিশ্বরাজনীতির নেতৃত্বের বিষয়কে কেন্দ্র করে। উভয় দেশের মধ্যে শুরু হ'ল স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক জোট ও সমাজতান্ত্রিক জোট এই দুই মেরুতে বিভক্ত হ'ল গোটা বিশ্ব। এই স্নায়ুযুদ্ধ এবং দ্বিমেরুপ্রবণতার প্রেক্ষাপটে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির উদ্ভব। সুতরাং আজ যখন স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বিমেরুপ্রবণতার অবসান ঘটেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই নির্জোট-আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ১০ই এপ্রিল ২০০০ সালে কার্টিহেনাতে (Cartagena) একটি সম্মেলনে স্বীকার করেছেন যে বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নির্জোট আন্দোলনের গুরুত্ব কমেছে। তবে এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে জোট-নিরপেক্ষতা ভারতের বিদেশনীতিকে কখনও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে নি। পূর্বতন সোভিয়েত জোট ও মার্কিন জোট—উভয়ের সাথে সমদূরত্ব বজায় রেখে ভারতের জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি গড়ে ওঠে নি। বরং বলা যায় যে জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ভারত যে কোন জোটের কাছাকাছি আসতে দ্বিধাবোধ করে নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিবেশী পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের দ্বারা ভারতের

বিদেশনীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভারতের নীতি — এই উপমহাদেশকে স্নায়ুযুদ্ধের বাতাবরণ থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সামরিক জোটের সদস্য হয়ে এই অঞ্চলে অবিরত যুদ্ধের ভীতির এক পরিমণ্ডল তৈরি করে। পাকিস্তানের এই 'না যুদ্ধ না শান্তি'র নীতির জন্য ভারতকে চীন ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছাকাছি আসতে হয়।

কমনওয়েলথ (Commonwealth) সংস্থার মধ্যে থাকাও ভারতীয় বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয় নি। কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে ভারত ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ তাদের মতামত প্রকাশ করার এবং কিছুটা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিদেশনীতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটলেও এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়।

২.৪ ভারতের বৈদেশিক নীতি নির্ধারক সমূহ

ভারতের বিদেশনীতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সমস্ত উপাদানগুলিকে ভারতের বিদেশনীতির নির্ধারকরূপে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতের বিদেশনীতির প্রধান প্রধান নির্ধারকগুলি হ'ল — ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্পদ, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সরকারি ব্যবস্থা, জনগণের নৈতিকতা এবং সর্বোপরি ভারতের বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সামরিক কৌশলগত অবস্থান তার বিদেশনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রক্ষা করছে। ভারত পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ই ভারতকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে।

অধ্যাপক ভি. পি. দত্ত ভারতের বিদেশনীতি গঠনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, ভৌগোলিক উপাদান ও অতীতের অভিজ্ঞতার অবদানের গুরুত্বের কথা বলেছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম নির্ধারক হ'ল অর্থনৈতিক স্বার্থসহ জাতীয় স্বার্থের প্রসার।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল যথাযথ পরিকল্পনার। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য ছাড়া শিল্পায়নের কর্মসূচি কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ভারত মিশ্র অর্থনীতির (Mixed economy) ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি কাজ করে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে আশানুরূপ বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়ায় ভারতকে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে

হয়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভারতের নেতারা বুঝেছিলেন যে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারত এককভাবে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে সক্ষম নয়। সেইজন্য ভারত, এশিয়া ও আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে ৭৭টি রাষ্ট্রের জোটগঠনে ভারতের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতের উদ্দেশ্য আরো বেশি সংখ্যক দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। যুদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভারতের বিদেশনীতির অন্য এক বৈশিষ্ট্য হ'ল যুদ্ধ বর্জন করা এবং শান্তি বজায় রাখা।

অর্থনৈতিক ও সামরিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষমতার আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্যস্থের ভূমিকা পালনের উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়গুলি ভারতের বিদেশনীতি গঠনে প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে।

সবশেষে একথা বলা যায় যে উপরোক্ত নির্ধারকগুলির কোন একটি উপাদান একক ভাবে ভারতের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে নি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, অতীতের অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ভারতের বিদেশনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ভারতের বিদেশনীতির সঠিক রূপরেখা বুঝতে পারা যায়। এখন আমরা জানার চেষ্টা করি কয়েকটি বৃহৎ শক্তির সাথে ভারতের সম্পর্ক এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক কেমন।

২.৫ ভারত - মার্কিন সম্পর্ক (Indo-American Relation)

ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ মিল আছে। দুটি দেশই গণতন্ত্রের সমর্থক। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ইতিবাচক ভূমিকা ভারত-মার্কিন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ মার্কিন সংবিধান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক কখনও একটি ধারায় প্রবাহিত হয় নি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯৫ সাল — এই সময়ের মধ্যে ভারত - মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ এবং নীতির সংঘাত দেখা গেছে। তার ফলে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক কখনও উষ্ণ বন্ধুত্বে আবার কখনও চরম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সমস্ত দেশের বৈদেশিক নীতির মধ্যে ঘটেছে কিছু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনই সূচিত হয়েছে ভারত-মার্কিন ভিসান ২০০০ চুক্তির মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সামরিক জোট স্থাপনের নীতিকে ভারত সমর্থন করতে পারে নি। সেই সময় রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে গভীর মনোমালিন্য দেখা দেয়। সেই সময়কার মার্কিন বিদেশনীতির লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজমকে রোধ করা (Containment of Communism)। বিশ্বব্যাপী সামরিক জোট ও ঘাঁটি স্থাপিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল ভারত পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটে যোগদান করবে। কিন্তু সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কোন শিবিরেই যোগদান করেন নি। ভারতের এই সিদ্ধান্তে মার্কিন হতাশা দেখা যায়।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্ধারকের কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। তাছাড়াও ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা, ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধতা, নয়া উপনিবেশিক যুদ্ধ, আগ্রাসনের বিরোধী মনোভাব, সামরিক জোট ও ঘাঁটি গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধ মনোভাব উভয় দেশের সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আজ সর্বাপেক্ষা শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, সামরিক সামর্থ্য, প্রযুক্তির প্রসার - ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করলে ভারত নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের মহাশক্তি। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই উপমহাদেশ সামরিক কৌশলের দিক থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে যে শক্তি তার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করবে সেই দেশ চীন, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্থান, ইরান ও রাশিয়াকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সেই কারণেই এই উপমহাদেশে হয় ভারত না হয় পাকিস্থানের উপর মার্কিন আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। মতাদর্শগত কারণেও এই অঞ্চলে, মার্কিন প্রভাবের প্রয়োজন ছিল। এই অঞ্চলটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদ বিরোধী প্রচারের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল চীন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বামপন্থী আন্দোলনকে বিরামবিহীন প্রচারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা।

ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি মার্কিন অসন্তোষ তাকে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে। মার্কিন বিদেশনীতির রচয়িতারা ভাল করে জানতেন পাক-ভারত-সম্পর্কের দুর্বলতার জায়গাটা। অন্যদিকে ভারতের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ স্পৃহাই পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোট-গঠনে সাহায্য করেছে। অতএব পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তাই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সবসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

যে সকল বিষয়গুলি ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল সেগুলির

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্ট চীনকে ভারতের স্বীকৃতি দান, কোরিয়াতে মার্কিন কার্যকলাপের প্রতি ভারতের অসন্তোষ। কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করার যে প্রস্তাব জাতিপুঞ্জে আনা হয় ভারত তাকে সমর্থন করে নি। ১৯৫৪ সালে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, কাশ্মীর, গোয়া, বাংলাদেশ যুদ্ধের প্রতি মার্কিন নীতি এবং সর্বোপরি ভিয়েতনাম সম্পর্কে মার্কিন নীতির বিরোধিতা।

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন সরকারি নীতিকে ভারত বন্ধুসুলভ বলে মনে করতে পারে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ কখনও স্বীকার করে নি যে পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে। গোয়াতে ভারতের সামরিক অভিযানকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ সমর্থন করলেও মার্কিন সরকার ভারতের এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেছিল।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ পাক-মার্কিন পারস্পরিক নিরাপত্তামূলক সামরিক চুক্তি। ভারত - পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা এই চুক্তিরই ফলশ্রুতি। মার্কিন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

১৯৫০ - এর দশকে ভারতের সঙ্গে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং দুদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি মার্কিন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় নির্জোট দেশগুলিতে নিজ দেশের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঢালাও অর্থনৈতিক সাহায্যের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে দু দেশের মধ্যে Indo American Technical Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য Public Law 480 (P.L. - 480) অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে প্রচুর মার্কিন সাহায্য লাভ করেছিল। এই সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির কাছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য চেয়েছিল। সেই সময় ভারত প্রচুর পরিমাণে মার্কিন সাহায্য পেয়েছিল।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল, কেননা সেই সময় মার্কিন উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-এশিয়াতে চীনের প্রাধান্য খর্ব করা। কিন্তু তারপর রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর ফলে মার্কিন বিদেশনীতিতে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ কিছুটা কমে।

ষাটের দশকে মার্কিন ঋণ ও সাহায্যের মধ্যে দিয়ে দুটি দেশ পরস্পরের কাছাকাছি আসে। ভারতকে খাদ্যসমস্যা মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মার্কিন সাহায্য নিতে হয়েছে। এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিদেশনীতিকে সোভিয়েত ও চীন বিমুখ করে তোলার চেষ্টা

করেছে এবং পাকিস্তানের সাথে সমঝোতা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

সত্তরের দশকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে মন্দা দেখা যায়। ষাটের দশকের শেষ ভাগে ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন নীতিকে ভারত গ্রহণ করে নি। হ্যানয়ে রাষ্ট্রদূত পাঠানো, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। পাকিস্তানকে বি - ৫৭ বোমারু বিমান এবং আরো মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের কথা ঘোষণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইতিপূর্বে তুরস্কের মাধ্যমে পাকিস্তান ১০০ প্যাটিন ট্যাঙ্ক পেয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিনা-প্ররোচনায় ভারতের উপর আক্রমণ করে। শুরু হয় পাক-ভারতের যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর সামরিক চাপ ও পাকিস্তানের মনোবল বৃদ্ধি করা। ডিসেম্বরে পাক বাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ভারত-মার্কিন সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারত আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনার ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আবার ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি বিধানের চেষ্টা চলে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে। আশির দশকেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য। নব্বই-এর দশকে জাতীয় বিদেশনীতিতে অভিজ্ঞতা নির্ভর পরিবর্তন ঘটে।

১৯৯৮ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। এই প্রথম ভারতীয় জনতা দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে কেন্দ্রে সরকার তৈরি করে। শুরু থেকেই এই সরকার আত্মবিশ্বাসের সাথে এক সুদৃঢ় বিদেশনীতি গ্রহণ করে। এই সরকারের নেতৃত্বে ভারত দ্বিতীয়বার পোখরানে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ ভারতের এই কাজের সমালোচনা করে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে ভারত আজ একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ভয় দেখালেও বিগত পাঁচ-ছবছরের ব্যবধানে আমেরিকা তার বিদেশনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের রাজনৈতিক-সামরিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছে। ভারত তার আণবিক সামর্থ্যকে সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছে শুধু পাকিস্তানকে ভয় দেখাবার জন্য নয়, চীনের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্যও বটে।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাবার আগ্রহ দেখা যায় দু-দেশের মধ্যে। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ও ভারতের

প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে ভিসন - ২০০০ চুক্তি।

ভারত - মার্কিন সম্পর্কের বিষয়গত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আশির দশকের শেষভাগে বিশেষ করে ১৯৮৯ সালের পর থেকেই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। অতি সম্প্রতি এই দুটি দেশ বিরোধ থেকে বন্ধুত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা স্নায়ুযুদ্ধ এবং দ্বিমেরুপ্রবণতার অবসানের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ-এশিয়া সম্পর্কে তার নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভারত দক্ষিণ-এশিয়ার প্রধান শক্তি। তাই এই অঞ্চলটিকে মার্কিন প্রভাবাধীনে রাখাই তাদের বিদেশনীতির লক্ষ্য। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবীকে মার্কিন সরকার সমর্থন করে না। চীনের সাথে ভারতের বন্ধুত্বের পুনরুদ্ধার সম্পর্কে মার্কিন সরকার চিন্তিত, কেননা চীন-ভারত মৈত্রী পুনরায় স্থাপিত হলে এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব কমবে। তাই ভারতকে সন্তুষ্ট করে চীনের কাছ থেকে তাকে দূরত্বে রাখাই মার্কিন বিদেশনীতির লক্ষ্য।

কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সমস্যা, ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা, আণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ বিরোধী চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে ভারত-মার্কিন মতভেদ রয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধক চুক্তিতে (NPT) ভারত সাক্ষর করে নি এবং সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিরোধক চুক্তিতে (CTBT) স্বাক্ষর করতেও ভারত অসম্মতি জানায়। কারণ ভারত চায় পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ। ভারত CTBT তে সাক্ষর করবে কিনা তা নিয়ে এখনও চিন্তা-ভাবনা চলছে। কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও (আগস্ট ২০০০) গ্রহণ করা হয় নি। সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিরোধক চুক্তি (CTBT) নিয়ে ক্লিন্টন সরকার নিজের দেশেই অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছে, কেননা এই সরকার মার্কিন সেনেটে CTBT কে পাশ করাতে পারে নি। আগামী নভেম্বর ২০০০ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তাই ২০০১ সালে মার্কিন বিদেশনীতির বিশেষ করে দক্ষিণ-এশিয়া নীতির কোন পরিবর্তন ঘটবে কিনা তা মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে হবে।

২.৬ ভারত - রাশিয়া সম্পর্ক (India-Russia Relations)

পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন স্বাধীন ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি কারণ তিনি মনে করেছিলেন ভারত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটের অনুগামী রাষ্ট্র। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সেই সময়কার সোভিয়েত নেতাদের ভারত সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিবর্তনে সাহায্য করে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত বিদেশ নীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। স্ট্যালিনোত্তর সময়ে প্রায় চার দশক ধরে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক বিকশিত হয়। দেশের বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত রাশিয়ার বিদেশনীতিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নেহেরু এবং ক্রুশ্চভের ব্যক্তিগত কূটনীতির ফলে ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছিল। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া ষাট, সত্তর ও

আশির দশকে এশিয়াতে চীনের আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য ভারতের সাথে দৃঢ় এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। দুটি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯৫৩ সালে সুপ্রীম সোভিয়েতে ম্যালেঙ্কভের (Malenkov) বক্তৃতার মধ্যে ভারতের প্রতি তদানীন্তন সোভিয়েত নীতির একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফর ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের ভিত তৈরি করে। ঐ সফরের শেষে উভয় দেশের নেতারা যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, ইন্দোচীন বিষয়ে জেনিভা চুক্তি, তাইওয়ানের উপর চীনের অধিকার ও জাতিপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। নেহেরুর আমন্ত্রণে ঐ বছরেই ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিন ভারতে আসেন। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ভারতের শান্তিপূর্ণ বিদেশ নীতি ও জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের নীতিকে সমর্থন করেন এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পাক-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তেল অনুসন্ধান, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য ভারতকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য দান ও দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৫৮ সালে নিকিতা ক্রুশ্চভ সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার হয়। ১৯৫৯ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ চীন-রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততার সৃষ্টি করে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণকে সোভিয়েত রাশিয়া নিন্দা করে।

ক্রুশ্চভের পর সোভিয়েত রাশিয়া চীনের মাও-জে-ডংয়ের সরকারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালালেও তা সফল হয় নি। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বের প্রসঙ্গে চীন-রাশিয়া দ্বন্দ্বের জন্য রাশিয়া পাকিস্তান সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রাশিয়া ঐ সংঘর্ষের সমাধান ও বিরোধের মীমাংসার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। তার ফলে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হয়। এই চুক্তি রাশিয়ার কূটনীতির জয় সূচিত করলেও ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূল জায়গাগুলি থেকেই যায়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের অনুরোধে রাশিয়া পাকিস্তানের সাথে অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত এক চুক্তি করে। ভারত স্বভাবতই এতে ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু রাশিয়া ভারত ও পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে দক্ষিণ এশিয়ার চীনের প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়।

১৯৭১ সালে নিক্সন প্রশাসনের ভারত-বিরোধী মনোভাব, চীন-পাকিস্তানের মধ্যে গোপন সমঝোতা ও পাকিস্তানের সাথে পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় ভারত রাশিয়ার সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাশিয়া প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র স্থাপনে

সোভিয়েত সাহায্য উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতে ভারী এঞ্জিনিযারিং ও বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম ও তৈল-শোধনাগার উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য দান করে। রাঁচীর ভারী এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ভিলাই ইস্পাত প্রকল্প, ভাকরা জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারতের সাথে রাশিয়ার বাণিজ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রাশিয়া ভারতকে প্রচুর প্রচুর সামরিক সাহায্য দান করেছে। রুশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতা পশ্চিমী শক্তিগুলির উপর ভারতের নির্ভরশীলতাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়েছে। ১৯৭১ সালে Soviet Academy of Science ও A\India's Space Research Organization-এর মধ্যে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহার করার জন্য এক চুক্তি হয়। ভারতের প্রথম রকেট 'আর্যভট্ট' রাশিয়া থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে প্রতম অকংগ্রেসী (জনতাদল) সরকার স্থাপিত হওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন যে এই নতুন অবস্থায় ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিতে পারে। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও বিদেশমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কমিউনিস্ট বিরোধী হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং অতীতে উভয় নেতাই সোভিয়েত নীতির সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, মতাদর্শের উপর নয়।

আশির দশকে আফগানিস্থানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ১৯৮২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্পষ্টভাবে জানান যে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সেনাদের অপসারণ করতে হবে। কারণ আফগান বিদ্রোহীদের সাহায্যের ছলে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে, যা এই উপমহাদেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল। পরবর্তীকালে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের পর উত্তেজনা কমে। রাশিয়ায় মিখাইল গর্বাচভের ক্ষমতা গ্রহণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয় ভারত তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে। গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের নীতি রাশিয়ায় আনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ফলে রাশিয়ার বিদেশনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৫০ সাল থেকেই রাশিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ভারতকে সমর্থন করেছে। বস্তুতঃ কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে রাশিয়ার সহানুভূতি, বাংলাদেশ যুদ্ধে রাশিয়ার কূটনৈতিক সমর্থন ভারতকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের ভূমিকাকে রাশিয়া স্বাগত জানিয়েছে। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি কর্তৃক উত্থাপিত নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি রাশিয়া সহানুভূতিশীল। সাম্প্রতিককালে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতের দাবির প্রতিও রাশিয়ার সমর্থন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

১৯৮৯ সালের রাশিয়ার খণ্ডীকরণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বি-মেরুকরণ প্রবণতার অবসানের ফলে রাশিয়াসহ সমস্ত দেশের বিদেশ নীতিতেই বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। এই

নতুন বাস্তবের প্রেক্ষাপটে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বি-মেরু প্রবণতার অবসান, অর্থনীতির বিশ্বায়ন (globalization of economy) ও জগৎজোড়া জালের (World wide website-WWW) যুগে ভারত রাশিয়া বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় না। বর্তমান রাশিয়ার বিদেশনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার কাছে চীন একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দেশ। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার বাধ্যবাধকতার জন্য তাকে এখন পশ্চিমী দেশ ও চীনের মধ্যে বাস্তব ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্র ভারত নিঃসন্দেহে রাশিয়ার কাছে 'বন্ধু রাষ্ট্র', কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়ার বিদেশনীতিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাষ্ট্রের তালিকায় ভারতের স্থান পশ্চিমী দেশ ও চীনের নীচে।

বিদেশনীতি গঠনের বর্তমান রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য হ'ল নির্মোহভাবে অভীষ্ট জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্যপূরণ। তাই তাঁরা শান্তিরক্ষণের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার ভূমিকার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চাইছেন। বাস্তব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে প্রতিরোধ করতে রাশিয়া ও চীন পরস্পরের সাথে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারী ক্ষেত্রে এই দুটি দেশই পশ্চিমী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। তাই অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রকল্পে রাশিয়া ও চীন ঐ দেশগুলির সাথে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী। এই একই যুক্তি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাশিয়া, চীন ও পশ্চিমী রাষ্ট্রের পরে ভারত চতুর্থ খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অবস্থায় যদি বহুকেন্দ্রিক ক্ষমতার ভারসাম্য গঠিত হয় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যদি স্বতন্ত্র সামরিক জোট তৈরি না হয়, তাহলে ভারত একটু সুবিধা পাবে। এই অবস্থায় ভারত তার কূটনীতির সুদক্ষ ও সুকৌশলী পরিচালনার মাধ্যমে সর্বাধিক জাতীয় ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বার্থ অর্জন করতে পারে।

ভারত ও চীনের কাছে রাশিয়া এখনও একটি প্রধান সামরিক যন্ত্রাংশ রপ্তানিকারী দেশ। তাই রাশিয়া এখন এই অঞ্চলে একটি ত্রি-দলীয় সহযোগিতার বেষ্টনী Moscow-Beijing – New Delhi triangle গড়ে তুলতে চাইছে। উদ্দেশ্য একটাই — পশ্চিমী প্রাধান্যকে নিয়ন্ত্রণ করা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারত, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে কতকগুলি সমস্বার্থের বিষয় রয়েছে যেমন, বহুকেন্দ্রিক দুনিয়া গঠন করা, আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করা, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনও জাতিপুঞ্জের যথাযথ নির্দেশ ছাড়াই ন্যাটোর (NATO) একতরফা সামরিক রাজনৈতিক আচরণের বিরোধিতা করা। এই তিনটি রাষ্ট্রই চায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষার কাজে জাতিপুঞ্জ নিয়মনিষ্ঠভাবে তার ভূমিকা পালন করুক।

চীন ও পাকিস্তানকে সামরিক অস্ত্র সরবরাহের বিষয় নিয়ে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের মধ্যে কিছু অস্বস্তির জায়গা রয়েছে। কিছু কিছু রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়া কাজাকস্থান, কিরঘিজস্থান ও তাজিকিস্থানের মাধ্যমে পাকিস্থানকে সাবেকী সমরাস্ত্র ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করছে। ভারতের নিরাপত্তার

প্রশ্নে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আধুনিক রাশিয়ান অস্ত্রদ্বারা চীনের সমর সজ্জা ভারতের কাছে অশনিসংকেত।

বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিষয়ে ভারত-রাশিয়ার যে চুক্তি জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মেয়াদ ২০১০ সাল পর্যন্ত। 'বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-রুশ-সম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে ভারতের বিদেশ দপ্তরের তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী আর. এল. ভাটিয়া মন্তব্য করেছিলেন যে ভারত-রুশ সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখন শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়েছে এবং "এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে উভয় দেশের পক্ষ থেকেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে" বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলিতে এই সম্পর্ক মজবুত করতে ভারত আগ্রহী। দুটি দেশই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সাথে তা নিশ্চয়ই সঙ্গতিপূর্ণ।

উভয়পক্ষের পারস্পরিক স্বার্থের জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে হবে, সমস্যা-সমাধানের বিষয়গুলি উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। কোন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে রাশিয়ান অস্ত্র সরবরাহ ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত না করে। একমাত্র সদর্থক কূটনীতিক মাধ্যমেই ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২.৭ ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ (India and Her Neighbours)

ভারতের বিদেশনীতির প্রধান ভিত্তি পঞ্চশীল নীতি। এই নীতি অনুসারে ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পাকিস্তান, চীন, পূর্বতন ব্রহ্মদেশ (বর্তমানে মায়ানমার) ও শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের সম্পর্ক সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ থাকে নি। ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পাকিস্তান ও তার অবন্ধুপূর্ণ মনোভাব। পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছে। ক্রমাগত ভারতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। তাই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘকালীন তিক্ততা। চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক সবসময় ভাল ছিল না। বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার জল-বণ্টন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় তামিল ভাষাভাষীদের সমস্যা নিয়ে ভারতের সাথে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক অনেক সময় মতভেদ ও তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। মায়ানমারের সামরিক সরকারের সাথে ভারতের সম্পর্ক উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সাম্প্রতিক কালে নেপালের সাথে ভারতের কিছু মতপার্থক্য ঘটেছে। সুতরাং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। সুখের বিষয় পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশীর সাথে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে ধীরে ধীরে। এবং আশা করা যায় ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

২.৭.১ ভারত-চীন সম্পর্ক (India-China Relations)

ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। হিউয়েন সাঙ ও ফা-হিয়েনের সময় থেকেই ভারত-চীন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর ভারত তাকে স্বীকৃতি জানায়।

প্রথম দিকে ভারত-চীন সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই দু-দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 'পঞ্চশীল' নীতিকে ভিত্তি করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে চীন ভারত সম্পর্কে চিড় ধরে। ঐ বছরের জুন মাসে চীন ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত লাদাখের বারাহোটিতে ভারতীয় সেনার উপস্থিতির বিরোধিতা করে এবং ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে চীন বারাহোটি দখল করে। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের শেষে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারত সফরে আসেন। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি বারাহোটি-বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং চীন ওই অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে, কিন্তু অসামরিক ব্যক্তিরা সেখানে থেকেই যায়।

১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীন-বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হয়। দলাইলামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত সম্পর্ক মন্দা দেখা দেয়। এই বছরই ভারত অভিযোগ করেছিল যে চীনা মানচিত্রে ভারতের এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত আরো অভিযোগ করে ১৯৫৯ সালে চীন লাদাখের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেছে এবং সেখানে রাস্তাঘাট ও বিমান অবতরণের ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে। ১৯৬২ সালে ২৪ মে অক্টোবর নেফা ও লাদাখ অঞ্চলে চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ২১শে নভেম্বর চীন এক তরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে।

চীন-ভারত বিবাদের সুযোগে পাকিস্তান চীনের সাথে চুক্তি করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু অংশ চীনকে সমর্পণ করে। চীন-ভারত যুদ্ধের ফলে উভয় দেশ নিজ নিজ রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। ষাটের দশকের প্রথম দিকে রুশ চীন বিরোধ ঘনীভূত হয়। এই সময়ে ভারতে রুশ প্রতিরক্ষা সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চীন-ভারত বিরোধ আরো তীব্র হয়। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়। এর আগে ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে চীনের আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ভারতের প্রতিরক্ষা বাতাবরণকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে। ভারতবর্ষে প্রথম পোখরাণ আণবিক বিস্ফোরণের (১৯৭৪) অন্যতম প্রধান হেতু হিসেবে এই দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হয়েছিল।

সত্তরের দশকে চীন-ভারত সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। ১৯৭৮-এর মার্চে চীনের একটি শুভেচ্ছা-মিশন ভারতে আসে। ভারতের পক্ষ থেকে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চীন সফরে যান। দু-দেশের বিদেশমন্ত্রীরা সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু সেই সময় চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা ছেদ পড়ে।

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে চীন-ভারত সম্পর্কের মধ্যে সংকট দেখা দেয়। ষাটের দশকে দু-দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তা শত্রুতায় পরিণত হয়। সত্তরের দশকে দু-দেশের সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই সময় ঘটেনি। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি দেখা যায় আশির দশক থেকে এবং নব্বই-এর দশকে তা একটি ইতিবাচক রূপ নেয়। প্রধানমন্ত্রী, রাজীব গান্ধী ও পরে রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণের শুভেচ্ছাসফর এরই ইঙ্গিত বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে আশির দশকের শেষভাগ থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা বদলাতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন। পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রের ভাঙন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়, স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বি-মেরুকরণের অবসান আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃশ্যপটকে পাল্টে দিয়েছে। এই নতুন বাস্তবের প্রেক্ষিতে ভারত-চীন-সম্পর্কের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সীমান্ত সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সফর বিনিময় এবং বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন দু-দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও বেশ কিছু অস্বস্তির জায়গা আছে। ভারতের সাথে চীনের দুহাজার মাইল বিস্তৃত সীমান্ত রয়েছে। বিশেষ করে লাদাখের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত নিয়ে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা থেকেই গেছে। লাদাখের সিয়াচিন গ্লেসিয়ার অঞ্চল নিয়ে চীন-পাকিস্তান বোঝাপড়া ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাধা। তাছাড়া আণবিক অস্ত্র উৎপাদনে পাকিস্তানকে সাহায্য করা এবং অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে চীনের পরোক্ষ সাহায্য দান ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে কারাকোরাম হাইওয়ে নিয়ে ভারত-চীন মত পার্থক্য। চীন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে চীনের সিনজিয়াঙ অঞ্চলের সাথে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সংযোগের জন্য ৪,৬২০ মিটার উঁচু খুনজেরার গিরিবর্ত্ম দিয়ে কারাকোরাম হাইওয়ে তৈরি করা হয়। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এখানে চীন-পাকিস্তান যৌথ তদারকির ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বছরের ১লা মে এই হাইওয়ের উদ্বোধন হয়। ভারত এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু চীন ও পাকিস্তান তা অগ্রাহ্য করে।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের নৌ-বাহিনীর উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার পরিপন্থী। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে কোকো দ্বীপে চীন একটি পরিদর্শন কেন্দ্র গঠন করেছে। মায়ানমারের পশ্চিম উপকূলে এই ধরণের আরো দুটি কেন্দ্র আছে। ভারতের আশঙ্কা — ঐ কেন্দ্র থেকে ভারতের ইস্টার্ন ন্যাভাল ফ্লিটের উপর নজরদারী করছে চীন।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারত-চীন সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব এশিয়া তথা এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের আধিপত্য এবং এশিয়ার বৃহত্তম দেশ হিসাবে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক সঙ্গতি তাকে এই অঞ্চলের বৃহত্তম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অপর পক্ষে

দক্ষিণ-এশিয়ার প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে চায় এক আশঙ্কা-বিহীন পরিবেশ, যে পরিবেশের সাহায্যে সে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবেই ভারত বহুমুখী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমূহের সমাধান করতে পারবে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলি চীন নিজের অনুকূলে আনতে পারবে। চীন তার বিদেশনীতিতে অর্থনীতির উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারত চীনের সাথে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক স্থাপন করার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ এবং যথাযথ সামরিক প্রস্তুতির বিষয়কেও গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ ভারত-চীন সীমান্তে চীন যেন হঠাৎ করে কোন দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত না হয়। তাছাড়াও রাশিয়া কর্তৃক চীনে সমরাস্ত্র সরবরাহের বিষয়টিকেও ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু আশার কথা এই যে কতকগুলি ক্ষেত্রে রাশিয়া, চীন ও ভারতের মধ্যে এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। যেমন, সীমান্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করা, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান বন্ধ করা, ইসলামিক উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করা। কিন্তু ইউরোপীয় (Eurasian) এই দেশগুলি একই ঝুড়িতে তাদের ডিমগুলি রাখতে পারবে কি?

অধ্যাপক গ্যারী বার্কার মন্তব্য করেছেন যে সমকালীন বিশ্বরাজনীতির অভূতপূর্ব পরিবর্তন আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে। তাকে অভিশাপে পরিণত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। এশিয়ার শান্তি, সুস্থিতি এবং প্রগতির ক্ষেত্রে ভারত-চীন মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়াকে বাদ দিয়ে যেমন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার কথা ভাবা যায় না, তেমনি চীন-ভারতকে বাদ দিয়ে এশিয়ার শান্তি ও সুস্থিতির কল্পনা করা যায় না। ভবিষ্যতে এশিয়ার চীনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। মার্কিন প্রশাসনের কাছে চীনকে প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হ'ল ভারত-মার্কিন সুসম্পর্ক। তবে দক্ষিণ-এশিয়ায় চীনের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ ভারতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বলে অনেকের ধারণা। কারণ ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জনমত ও ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আজ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৭৯ সালে চীন যে অর্থনৈতিক উদারনীতি গ্রহণ করেছিল তার সুফল আজ সে পাচ্ছে। বর্তমানে চীনে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার ১২.৮ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতে চীনের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এক বিরল নজির। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে বাধা পড়ুক এমন কোন কাজ চীন নিশ্চয়ই করবে না। তবে চকমপ্রদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যদি চীনের সামরিক উচ্চাভিলাষ যুক্ত হয় তবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। তবে নিরাশ হওয়ার মত এখনও তেমনি কিছু ঘটে নি।

২.৭.২ ভারত - পাকিস্তান সম্পর্ক (India-Pakistan Relations)

১৯৪৭ সালে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের মূল সমস্যা ছিল তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখা। পাকিস্তান প্রথম থেকেই নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। অপরপক্ষে ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত এই অঞ্চলে বিদেশী প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য বৈদেশিক শক্তির প্রভাব ও হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল। পাকিস্তান পশ্চিমী সামরিক জোটে যোগদান করে। কিন্তু ভারত শুরু থেকেই জোট নিরপেক্ষতার নীতিকে গ্রহণ করে। সুতরাং দু-দেশের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যই দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আশঙ্কা ও উদ্বেগের প্রাচীর রচনা করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও ভারত ও পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য সংকট, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম, কাম্পুচিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তানের সমস্যা, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ, ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকেই অনুসরণ করেছে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ভারত - পাকিস্তান সম্পর্ক বিদ্বেষ, বিবাদ ও সন্দেহের বাতাবরণে আচ্ছন্ন। সেই কারণে দুদেশের সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘকালীন মন্দাভাব লক্ষণীয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কাশ্মীর সমস্যা, বিরতি বিহীন ভারত-বিরোধী প্রচার, সীমান্ত বিরোধ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সিয়াচেন হিমবাহ, পাকিস্তানের বিরামবিহীন সমর সজ্জা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসহযোগিতা ও তিক্ততার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। তার ফলে দু-দেশের রাষ্ট্রনেতা ও জনগণ এই মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

মূলতঃ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সূচনা হয়। ভারত বিভাজনের সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মহারাজা ভারত কিংবা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের সাথেই যোগ দেন নি। কিন্তু সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা চালিয়েছে। সীমান্তবর্তী উপজাতিভুক্ত হানাদারদের ছদ্মবেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরে প্রবেশ করায়। সেই সময় কাশ্মীর রাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগাদান করার সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে ভারতের সেনাবাহিনী কাশ্মীর প্রবেশ করে। ভারতীয় সেনাদের সাথে পাক হানাদার ও সেনাবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি হয়। তার ফলে জম্মু-কাশ্মীরের এক অংশ পাক সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। বর্তমানে সেই অংশ পাকিস্তানের দখলেই রয়েছে যা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (POK) নামে পরিচিত।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেই যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল কিন্তু তাসখন্দ চুক্তির ফলে যুদ্ধবিরতির পর সীমারেখার ওপারে চলে যায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তান আবার কাশ্মীরের উপর আক্রমণ চালায়। ১৯৭১-৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলেও কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোন সূত্র এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোটের দাবি করেছে, কিন্তু ভারত সেই দাবি অগ্রাহ্য করে বলেছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে ন্যাম (NAM) সম্মেলনে কিংবা জাতিপুঞ্জের সভায় কাশ্মীর সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভারতকে বিব্রত করার চেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় পাকিস্তান তার ভারত-বিরোধী ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এমন কি চীনের সাথে একটি চুক্তি করে পাক অধিকৃত কিছু ভারতীয় অঞ্চল চীনকে সমর্পণ করে। চীনও কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছে।

১৯৮২ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া-উল-হক্ ঘোষণা করেছিলেন যে কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার ২০০০ সালেও বর্তমান সামরিক শাসক জেনারেল পরভেজ মুশারফ হোসেন ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে বিবৃতি দিয়েছেন যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলেও ভারতের সাথে পাকিস্তানের শত্রুতা বজায় থাকবে।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের পরও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বৈরীভাবের অবসান ঘটে নি। উপরন্তু দুদেশের আণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা এই ঐতিহ্যগত বৈরিতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারত - পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা কম। বিগত তিন দশকের খতিয়ান প্রমাণ করে যে দুদেশের সম্পর্কের মধ্যে মন্দা চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৯৪ - এর পর দুটি দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় মালদ্বীপে সাক্ষাতের পর দুদেশের সম্পর্কের কিছু উন্নতি ঘটে। দুদেশের মধ্যে বন্দী বিনিময়, শাসক প্রধানদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি ও একান্ত যোগাযোগ স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধানের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু সম্পর্কের উন্নতির এই প্রচেষ্টা অচিরে বাধা পায় যখন নিয়ন্ত্রণরেখা (Line of Control-LoC) বরাবর আবার গোলাগুলি বিনিময় শুরু হয়। দুদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ সচিবরা বিভিন্ন জায়গায় মিলিত হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু পাকিস্তানের তরফে কাশ্মীর বিষয়টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে আলোচনা বেশিদূর এগোয় না।

১৯৯৮ সালের মে মাস ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মর্মান্তিক মাস। ১১ই ও ১৩ই মে ভারত পোখরানে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটালো। ২৮শে ও ৩০শে মে চাঘাইতে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকিস্তান তার প্রত্যুত্তর দিল। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়াকে আণবিক সংঘর্ষের এলাকা বলে চিহ্নিত করতে চাইল। দুদেশের মধ্যে তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পেল। ১৯৯৮ - এর সেপ্টেম্বরে দুই প্রধানমন্ত্রী — অটল বিহারী বাজপেয়ী ও নওয়াজ শরিফের সাক্ষাত ঘটলো নিউ ইয়র্কে। স্থির হ'ল সচিব পর্যায়ে ভারত - পাকিস্তান আলোচনা আবার শুরু হবে। দিল্লী-লাহোর সরাসরি বাস-সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব হ'ল। প্রকৃতপক্ষে ২০-২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ দিল্লী-লাহোর বাস যাত্রাকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল। সেই সময় দুদেশের মধ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হ'ল। কিন্তু বাস-যাত্রার কূটনীতির সাফল্য কর্পূরের মত উবে গেল ফেব্রুয়ারির শেষে কার্গিলের পার্বত্য অঞ্চলে। কার্গিলে হারকাতুল মজাহিদীন হানাদারের ছদ্মবেশে পাকিস্তান সেনা শুরু করল কাশ্মীর দখলের চতুর্থ লড়াই। পাকিস্তানের কাশ্মীর দখলের প্রথম লড়াই শুরু হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে, দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৬৫ সাল, তৃতীয় যুদ্ধ ১৯৭১ এবং চতুর্থবার পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে। এই সমস্ত পাকিস্তানি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তান বলতে শুরু করে কাশ্মীরকে দখল করতে তারা আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতেও পিছপা হবে না।

এরপর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হারকাতুল মুজাহিদীন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আই. সি. - ৮১৪ বিমান ছিনতাই করে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যায়। ভারতে বন্দী কয়েকজন কট্টর মুসলিম মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের মুক্তির বিনিময়ে তারা বিমানযাত্রীদের মুক্তি দেয়। ঐ ঘটনায় ভারতের দৈর্ঘ্য আরো একবার পরীক্ষিত হয়।

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বহুবার আলোচনার সূত্রপাত ঘটলেও তা কোনসময় বেশি দূর এগোতে পারে নি। কেননা পাক সেনারা বার বার নিয়ন্ত্রণ রেখা (LoC) ভঙ্গ করে সিমলা চুক্তির অবমাননা ঘটিয়েছে। সিমলা চুক্তির সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা হয়েছিল যে কালক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ রেখাকেই আন্তর্জাতিক সীমানায় রূপান্তরিত করা হবে। সিমলা চুক্তিতে আরো বলা ছিল যে দুটি দেশ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে দুদেশের পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু পাকিস্তান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সিমলা চুক্তি ভঙ্গ করে প্রায় দু-দশক ধরে কাশ্মীরে ছায়া যুদ্ধ চালাচ্ছে, যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৮৯ সালে 'অপারেশন টোপ্যাক' এর মাধ্যমে।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তান তার কৌশল পাল্টায়। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে সেখানকার মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলতে চায় এবং এই উপত্যকাকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে প্রক্সি যুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরে ৫,৮৪৫ জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়, ১,৪০১ জন নিরাপত্তারক্ষী মারা যায়। অসংখ্য এ.

কে. ৪৭ রাইফেল এবং হাল্কা মেশিন গান ব্যবহৃত হয় এই অঞ্চলে। ১৯৯৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মজফ্ফরাবাদ সফর কালে জেনারেল মুশারফ বলেন যে পাকিস্তান এবং কাশ্মীর এক। তাই বর্তমানে কাশ্মীরে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হয়েছে উগ্রপন্থী ইসলামী সংগঠনের দ্বারা হামলা। প্রতিদিন কাশ্মীরে বহু সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তা কর্মী নিহত হচ্ছে পাকিস্তানি উগ্রপন্থীদের দ্বারা। প্রকাশ্যে হিজবুল মুজাহিদীন, লস্কর-ই-তৈবা ও হারকাতুল মুজাহিদীন বাহিনীর নেতারা আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কাশ্মীরে নারকীয় হত্যালীলা চালাচ্ছে।

বর্তমান পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসক কাশ্মীর প্রশ্নর সাথে যুক্ত করেছেন আণবিক বিস্ফোরণের বিষয়টি। ভারতের বিরুদ্ধে এটাও একটা নতুন ধরনের হুমকি। CTBT তে ভারতের স্বাক্ষরের বিষয়েও পাকিস্তান চাপ সৃষ্টি করছে। সুতরাং এই অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২.৭.৩ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (India-Bangladesh Relations)

ভারতের বিদেশনীতির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ সবসময়ে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কেননা এই উপমহাদেশে ভারতের সাথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানের স্থল সীমান্ত রয়েছে। আবার সমুদ্র পথে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ আছে। এই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে সড়কপথে ও রেলপথে সংযোগ স্থাপিত হয় ভারতের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে করাচী বন্দর থেকে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব এই উপমহাদেশের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতের থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে বাংলাদেশের অবস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের আবির্ভাবে ভারত সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল এবং আশা করেছিল — ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হবে এবং ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে এই-উপমহাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হন। ঐ বছরেই ১৯শে নভেম্বর দুদেশের মধ্যে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুটি দেশ ভারত মহাসাগরকে বৃহৎশক্তির প্রতিযোগিতার হাত থেকে মুক্ত রাখার আবেদন জানান। দুদেশের প্রধানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নদীর জল বণ্টন বিষয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য যৌথ নদী কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

১৯৭২ সালের ২৮শে মার্চ একবছর মেয়াদী এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ বছরের ১লা

নভেম্বর উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য এক বাণিজ্যিক চুক্তি হয়। সর্বোপরি, ১৯৭২ সালের ১৯শে নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশ শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্বের এই রমরমা (euphoria) বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। মুজিব সরকারকে অচিরেই দেশের বামপন্থী ও দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক দলের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিকে তারা ভাল চোখে দেখেন নি। বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী, পাকিস্তান সমর্থক, চীন সমর্থক ও মুজিব বিরোধী দল ক্রমশ জোট বাঁধতে শুরু করে। ভারত বাংলাদেশকে শোষণ করছে এবং নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ভারত-বিরোধী প্রচার চালায়। ফলে মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আওয়ামী লিগের ভারত সমর্থক সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সেই বছরই নভেম্বরে শুরুতে মুজিব সমর্থ্য সৈন্যবাহিনী হঠাৎ খোন্দকার মুস্তাক আহমেদকে বন্দী করে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু শত্রুপক্ষ মুজিব সমর্থকদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যা করে। জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন।

মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে ক্রমেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে মন্দা দেখা দেয়। ১৯৭৬ সালে ২০শে এপ্রিল বাংলাদেশ সীমান্ত বাহিনী ভারতের মেঘালয়ে সীমান্ত বাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। ভারত এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায় ফারাক্কা থেকে জল সরবরাহের বিষয়টি বাংলাদেশ জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় উত্থাপন করে। ভারত সরকার ঐ বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব করে। শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশের প্রধানদ্বয় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করতে স্বীকৃত হন।

বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক জনগণ বেআইনিভাবে আসামে ঢুকতে থাকে। ফলে আসামে গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ভারত সরকার অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বলা হয় যে এতে উভয় দেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক নষ্ট হবে। বঙ্গোপসাগরের উপর ছোট্ট নিউ মূর দ্বীপের উপর অধিকার নিয়েও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুজিব পরবর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দুদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী প্রয়োজন মত ভারত-বিরোধী প্রচার করে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান (coup) ঘটে। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। সেই সময়ে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতির প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল এরশাদ নতুন দিল্লী সফরে আসেন এবং দু-দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সার্ক (SAARC - South Asian Association for Regional Cooperatioan) এক বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষিণ-এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য এই সংগঠন কিভাবে গড়ে উঠল তা একটু দেখা দরকার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশই প্রথম এই অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর উদ্যোগেই সার্ক নামে আঞ্চলিক সহযোগিতার সংগঠনের ধারণা দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির রাজধানীতে পৌঁছে যায়। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে আলোচনা চলে এই সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্কের চার্টারে বলা হয়েছে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হবে দক্ষিণ-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কল্যাণ (welfare), অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা, পারস্পরিক আত্মনির্ভরশীলতাকে বৃদ্ধি করা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

এই সংগঠনে যোগদানের বিষয়ে ভারতের কিছু প্রাথমিক সংশয় ছিল। ভারতের মনে হয়েছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের এই প্রস্তাবের পিছনে পশ্চিমী শক্তির পরোক্ষ মদত থাকতে পারে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে যে রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে — দক্ষিণ-এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার সংগঠন বা সার্কের প্রস্তাব করা হয়েছে। কেননা এই অঞ্চলে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাধান্যকে ঠেকাতেই এই ধরণের একটি সংগঠন তৈরি করার প্রস্তাব মার্কিন চিন্তাপ্রসূত হতে পারে বলে ভারতের তরফে মনে করা হয়েছিল। এই অঞ্চলে দুই বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতা গড়ে উঠুক ভারত তা চায়নি। ভারত এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে নি, কিন্তু এই সংগঠনে যোগদানের বিষয়ে দুটি নীতির প্রস্তাব করে — (১) দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলি এই সংগঠন আলোচনা করবে না, দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাসমূহ যেন আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি না করে;

(২) এই সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমূহ যেন সর্ববাদীসম্মত হয়। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয় দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা উচিত। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অস্বস্তি যেন আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে অন্তরায় না হয়।

ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশীরা সার্ককে একটি কার্যকরী মঞ্চ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে, যেখানে তারা যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে ভারতের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারে। যাইহোক, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে একাধিক প্রতিবেশীর সাথে ভারতের সম্পর্ক মধুর নয়। দ্বি-পাক্ষিক অনেক সমস্যাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সার্ক একটি কার্যকরী মঞ্চ হিসাবে কাজ করতে পারে। কেননা দ্বিপাক্ষিক সমস্যা থাকলেও সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিয়মিতভাবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে। সরকারি ভাবে দুদেশের আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিলেও সার্কের মঞ্চে সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেতে পারে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটে। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য পর্যালোচনা শুরু হয় এবং ঐ আলোচনায় দুদেশের মধ্যে মতৈক্য হয় যে বনগাঁ (ভারত) এবং যশোর (বাংলাদেশ)-এর মধ্যে ব্রডগেজ লাইন (যা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে বন্ধ হয়ে যায়) চালু করা। এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কারণ দু-দেশের মধ্যে রেল-সংযোগ স্থাপিত হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা বাড়বে। দুদেশের মধ্যে স্থলপথের যোগাযোগও বহুদিন বন্ধ ছিল। ৩৫ নং জাতীয় সড়কপথে বাংলাদেশের বরিশাল ভারতের বনগাঁ/পেট্রাপোল সীমান্তের সাথে যুক্ত। ৪০ নং জাতীয় সড়ক ভারতের শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটির সাথে যুক্ত করেছে চট্টগ্রাম ও ঢাকা (ভায়া কুমিল্লা)। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি জাতীয় সড়কপথ মুর্শিদাবাদ, বালুরঘাট এবং হলদিঘাটের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তার পুনরুজ্জীবন বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য। কেননা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই দুদেশের সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশকে ভারত ও তার উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে 'অর্থনৈতিক সেতু' বলে মনে করা হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্থক্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট তৈরি প্রচুর খরচসাপেক্ষ (কিলোমিটার প্রতি দু-কোটি টাকা) ও কষ্টসাধ্য। সেই কারণে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের জলপথ, স্থলপথ এবং রেলপথে ট্রানজিটের সুযোগ সুবিধা চেয়েছে ভারত।

১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গাজল বণ্টন সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছে। এই একই সময়ে বর্তমান বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ এই অভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবহারের সুবিধার ফলে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ

ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দরে ট্রানজিটের সুযোগ দেওয়ার কথা বলেন। এর ফলে আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় থেকে জিনিষপত্র চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ভারতে আসতে পারবে।

স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নতি ছাড়া দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে পারে না। সেই কারণে পেট্রাপোল, হিলি এবং চ্যাংরাবান্দা সীমান্ত সড়কপথের উন্নয়নের বিষয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। বিশেষ করে পেট্রাপোল সীমান্তের চেকপোস্টে শত শত মালবাহী লরি দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন, ফলে জিনিষপত্রের ক্ষতি হয়। উভয় দেশের সীমান্ত এলাকায় কোন পণ্যগুদাম নেই, লরি পার্কিং করার জায়গা নেই এবং সর্বোপরি, পেট্রাপোলের সাত কিলোমিটার সংকীর্ণ রাস্তা পণ্য-পরিবহণের পক্ষে অনুপযুক্ত। সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে সড়কপথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিকাঠামোর উন্নতি অত্যন্ত জরুরী। রেল-সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে যাত্রী এবং পণ্য-পরিহনে সড়কপথে চাপ কিছুটা কমবে। সেই কারণে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার এবং বাজপেয়ী সরকার বনগাঁ-যশোর রেলপথ পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দল (বি. এন. পি.) এবং জামাত-ই-ইসলামী — এই দুই বিরোধী রাজনৈতিক দল ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য ট্রানজিটের সুযোগ দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ। তারা মনে করে এর ফলে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে। বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত আওয়ামী লীগ সরকারকে সমালোচনা করে চলেছে। তাদের অভিযোগ বর্তমান সরকার ভারতের প্রতি নরম মনোভাব গ্রহণ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে সুদৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এশিয়ান হাইওয়ে এবং রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে বদ্ধপরিকর। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির রেশ স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে পৌঁছে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যে South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে এই অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে বলে মনে হয়।

২.৪.৭ ভারত - শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক (India-Srilanka Relations)

ভৌগোলিক নৈকট্য ও ঐতিহাসিক কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের সম্পর্ক বহুকালের। এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উপকথা, পুরাণ-কাহিনী ও ইতিহাসের মাধ্যমে। তবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক সংকট এবং সমস্যায় আকীর্ণ।

ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নাগরিকতা ও অন্যান্য সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে কাজ করেছে। ইংরেজ শাসকগণ

সিংহলে বাগিচা শিল্পে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। সিংহল স্বাধীন হওয়ার পর তারা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীলঙ্কার নাগরিকত্ব পায় নি। কিন্তু একথাও সত্যি যে সিংহলে বসবাসকারী তামিলদের মধ্যে অনেকেই শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাদের সাথে সিংহলীদের বিবাদ ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকে ও শ্রীলঙ্কায় তামিল বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে।

পঞ্চাশের দশকে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের কেন্দ্র করে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দু-দেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বহু আলোচনার পর ১৯৬৪ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে এক চুক্তি হয় যা সিরিমাভো-শাস্ত্রী চুক্তি নামে খ্যাত। ঐ চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে ৫,৫০,০০০ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলকে ভারতে ফিরে আসতে হবে। ৩,০০,০০০ তামিলকে সিংহলের নাগরিকত্ব দান করা হবে। বাকি ১,৫০,০০০ রাষ্ট্রহীন তামিলদের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। চুক্তির মেয়াদ হয় ১৫ বছরের। ১৯৬৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলম্বো সফর করেন এবং সফরশেষে উভয়দেশের যৌথ বিবৃতিতে চুক্তির শর্ত রূপায়িত হবে বলে ঘোষিত হয়।

ষাটের দশকে জাফনার সমুদ্র উপকূলের কাছে পক-প্রণালীতে অবস্থিত এক বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট জনবসতিহীন কচ্চতিভূ দ্বীপ নিয়ে দুদেশের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে উভয়দেশে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা করতে সম্মত হয়। দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা থাকা সত্ত্বেও ষাট ও সত্তরের দশকে ভারত শ্রীলঙ্কার সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছে। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ভারত শ্রীলঙ্কাকে ৭ কোটি টাকা ঋণ দেয় ভারত থেকে খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানী করার জন্য। ১৯৬৮ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথ টি কলসরটিয়াম (সংঘ) গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে যৌথ কমিটি গঠিত হয়। ড্যাডলে সেনানায়েকের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে উভয় দেশের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে।

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে চরম বামপন্থীদের বিদ্রোহ দমনে ভারত শ্রীলঙ্কা সরকারকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। ভারত ঐ সময় শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করে। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সিরিমাভো বন্দরনায়েকের সরকার ভারতকে সমর্থন করেনি। এমন কি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবের পক্ষে শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি ভোট দেন।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরের ফলে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। দুদেশের প্রধানমন্ত্রীগণ অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ, ভূখণ্ডগত বিরোধ এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৭৫ সালে দিল্লীতে দুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে একটি চুক্তি হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত শ্রীলঙ্কার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে

বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক সীমানা ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এইভাবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের উন্নতির প্রচেষ্টা চলতে থাকলেও সত্তরের দশকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী সিংহলী তামিলদের সাথে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের জাতিগত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। সিংহলী তামিলরা শ্রীলঙ্কার উত্তরে জাফনা এবং পূর্ব উপকূলে বসাবাস করে। অন্যদিকে ভারতীয় তামিলরা কলম্বো, কান্ডি এবং ত্রিঙ্কোমালী জেলায় বসবাস করে। তারা প্রধানত চা-বাগান সহ অন্যান্য বাগিচায় কর্মরত। ১৯৫৮ - ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে অসংখ্য সংঘর্ষ চলে।

১৯৭৭ সালে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (TULF) নামে তামিলদের মধ্যে একটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় এবং তারা তামিলদের জন্য পৃথক স্বাধীন বাসভূমি (তামিল ইলম) দাবি করে।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিংহলীরা তামিলদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও সন্ত্রাস চালাতে থাকে। সেই জাতিগত দাঙ্গায় (ethnic conflict) কলম্বোয় ৫০,০০০ তামিল আশ্রয়হীন হয়। ভারত এই ঘটনাবলীতে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারতের তামিলনাড়ুতে বাস্তুচ্যুত বহু শ্রীলঙ্কার তামিল মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কা ত্রাণতহবিল গঠন করেন। ১৯৮৫ সালে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী উত্তরাঞ্চলে তামিলদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বহু তামিল নিহত হয়। ১৯৮৫ সালে শ্রীলঙ্কার বিশেষ দূত ভারতে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে আলোচনার পর যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতার কাঠামোর মধ্যেই তামিল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিঙ্কোমালী পোতাশ্রয়ে নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। শ্রীলঙ্কার সৈন্যবাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য ইজরায়েলের প্রশিক্ষক নিযুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালের অগাস্ট এবং ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত জি. পার্থসারথি তিনবার শ্রীলঙ্কায় যান। তিনি টি. ইউ. এল. এফ. নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

১৯৮৬-৮৭ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বেশ কয়েকদফা আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৭ সালের ২৯শে জুলাই ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে কলম্বো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৭শে জুলাই LTTE (Liberation Tiger for Tamil Eelam)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে কোন চুক্তি তারা মানবে না। শ্রীলঙ্কার ভিতরেও চুক্তি-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাসা এই চুক্তির বিরোধিতা করেন। TULF ও অন্যান্য তামিল সংগঠনগুলি ঐ চুক্তি সমর্থন করলেও LTTE ঐ চুক্তিকে সমর্থন করে নি।

১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই শ্রীলঙ্কা সরকারকে সাহায্যের জন্য ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো হয়। কিন্তু জাফনায় LTTE-এর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তার ফলে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইতিমধ্যে ত্রিঙ্কোমালীতে তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর গুলি চালাতে শুরু করে। LTTE - এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভারত তামিলদের সাথে বিশ্বাঘাতকতা করেছে এবং LTTE তামিলদের স্বার্থসংরক্ষণের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। LTTE-এর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্রতা বাড়তে থাকে ফলে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রণসিঙ্গে প্রেমদাসা শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ভারতকে শ্রীলঙ্কা থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনীকে প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেন। সেই অনুসারে ভারত সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবে অন্যান্য তামিল গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি প্রেমদাসা LTTE-এর সাথে এককভাবে আলোচনা শুরু করেন। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির অনমনীয় মনোভাবের ফলে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে পৌছায়। ১৯৯০ সালে ২৪শে মার্চের মধ্যে শ্রীলঙ্কা থেকে অবশিষ্ট সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতির ফলে শ্রীলঙ্কায় ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। শ্রীলঙ্কায় ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কার 'আভ্যন্তরীণ' জাতিগত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের অবনতি ঘটে ১৯৮৭-৯০ সালের মধ্যে। চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। তিনিই প্রথম শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি যিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে তামিলদের অসন্তোষের পিছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে এবং এই সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই হওয়া উচিত।

বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের সাথে সিংহলীদের সংঘর্ষের বিষয় নিয়ে ভয়ঙ্কর বিব্রত। এবং তারা বুঝতে পেরেছেন যে সামরিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সুতরাং বর্তমান সরকার একদিকে তাদের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিমত গড়ে তুলতে চাইছে, অন্যদিকে সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ক্ষমতা প্রদান করে তারা শ্রীলঙ্কার তামিলদের আস্থা অর্জন করতে চাইছে।

শ্রীলঙ্কা জাতিগত সংঘর্ষের সমস্যার ক্ষেত্রে জাফনা উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বর্তমানে LTTE এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতীকরূপে, দেখা দিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় কলম্বোর পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হ'ল জাফনা। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি শ্রীলঙ্কার উত্তরে এই জাফনা শহরটি LTTE দখল করে নেয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে কুমারাতুঙ্গা সরকার তিনটি বিশাল সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে

জাফনাকে পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু এপ্রিল ২০০০ সালে জাফনা উপদ্বীপে শ্রীলঙ্কার সরকার বাহিনী আবার বিপদের মুখোমুখি হয় এবং তখন 'বন্ধু দেশ' গুলির কাছে সাহায্য চান বর্তমান সরকার ও একই সাথে নরওয়ের মধ্যস্থতায় LTTE -এর সাথে শান্তি আলোচনার দরজা খোলা রাখেন।

শ্রীলঙ্কার যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ১৯৮৭-৯০ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতা করেছিল তারাই বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকারকে অনুরোধ করছে ভারতের সামরিক সাহায্য গ্রহণ করার জন্য। অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারত প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্যদানের অক্ষমতা জানালেও পরোক্ষভাবে তারা শ্রীলঙ্কা সরকারকে সাহায্য করছে। ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনী ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার কাজের সাথে নজর রাখছে যাতে এই অঞ্চলের সমুদ্রপথে কোন সাহায্য LTTE -এর কাছে না পৌঁছায়। ভারত শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্বকে অটুট রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু শ্রীলঙ্কার এই 'অভ্যন্তরীণ' জাতিগত সমস্যা সমাধানের সাহায্যের ক্ষেত্রে ভারত কিছু সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করেছে। যেমন (১) ভারত শ্রীলঙ্কায় প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে এবং (২) শ্রীলঙ্কার তামিল জনগণের অনুভূতিকে ভারত আঘাত করতে চায় নি। পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে বলা হয়েছে যে শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনের বিষয়ে কুমারাতুঙ্গা সরকার এবং LTTE গোষ্ঠী যদি ভারতকে মধ্যস্থের ভূমিকায় চায় তবেই ভারত সেই ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে নরওয়ের বিদেশমন্ত্রী ন্যুট ফলব্যাক (Knut Vollcback) -এর নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলছে। যুদ্ধরত দুপক্ষ (শ্রীলঙ্কা সরকার এবং LTTE)-এর মধ্যে কি আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাতিগত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বতন্ত্র তামিল ইলাম (বাসভূমি) গঠন করা বা না করা উভয় বিষয়ই ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তরঙ্গায়িত হতে পারে। শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ সমস্যার বিষয়ে প্রতিবেশী বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা যে ইতিবাচক — এই বাস্তবটি এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ভারত ও নরওয়ের প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৯৩ সালে নরওয়ে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপনে সফল ভূমিকা পালন করেছিল।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে শ্রীলঙ্কা সরকার ও LTTE-এর মধ্যে ভারত এককভাবে মধ্যস্থতা করতে চাইছে না বলে একাধিক পক্ষের মধ্যস্থতার আবির্ভাব ঘটতে পারে শ্রীলঙ্কায়, ভারতের পক্ষে তা মোটেই সুখকর হবে না।

ভারত শ্রীলঙ্কাকে প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্য না দিলেও অন্যান্য দিক থেকে শ্রীলঙ্কা ভারতের সাহায্য পাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত গোপন সংবাদ ভারত শ্রীলঙ্কাকে সরবরাহ করছে। অপারেশান পাশা ('Opcratioan Pasha') প্রকল্পে ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনী জলপথে বিশেষ করে তামিলনাড়ু উপকূলে তাদের নজরদারী জোরদার করছে যাতে শ্রীলঙ্কার কোন চরমপন্থী তামিলগোষ্ঠীর

ব্যক্তি উদ্বাস্তুর ছদ্মবেশে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। একটি যৌথ নজরদারী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে উপকূল সংলগ্ন গ্রাম রমানাথপুরণ থেকে পেট্রলজাত দ্রব্য, ওষুধপত্র ও জীবনদায়ী ওষুধ তামিল টাইগারদের হাতে না পৌঁছায়।

মানবিক সাহায্যের (humanitarian assistance) বিষয়েও ভারত শ্রীলঙ্কার সাথে সহযোগিতা করছে। এ পর্যন্ত লক্ষাধিক শ্রীলঙ্কা উদ্বাস্তুদের ভারত আশ্রয় দিয়েছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কিছু উদ্বাস্তুদের শ্রীলঙ্কায় ফেরত পাঠানো গেলেও সংঘর্ষমূলক অবস্থা চলার জন্য বর্তমানে এই ব্যবস্থাটি স্থগিত আছে।

বর্তমান ভারতের বিদেশনীতির সূত্র ধরে বলা যায় যে ভারত ঐক্যবদ্ধ ও বহুজাতিবিশিষ্ট শ্রীলঙ্কার অখণ্ড সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। ভারত তার নিজের জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে LTTE-এর স্বতন্ত্র স্বাধীন তামিল বাসভূমির দাবিকে সমর্থন করে না। বরং শ্রীলঙ্কায় সংখ্যালঘু তামিলরা যাতে নির্ভয়ে ও সম্মানের সাথে জাতীয় মূল স্রোতধারার সাথে মিশে যেতে পারে ভারত সেরকমই চায়। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গী একই রকম। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার জাতিগত সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবে হোক — একথা ভারত আশির দশকেও বলেছে এবং এখনও বলে। সুতরাং শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে ভারতের অনুসৃত বিদেশ নীতির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে ভারতের বর্তমান অতি-সাবধানী নীতি তার বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করবে কিনা সে সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োজন আছে। শ্রীলঙ্কার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত তার সামরিক বাহিনীকে সেখানে পাঠায় নি। এর ফলে শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যদি শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ করে তবে তা ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে। কিছু রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেছে যে শ্রীলঙ্কা সরকার ইতিমধ্যেই বিদেশী অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ লাভ করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান, ইজরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর কোরিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সৈন্যবাহিনী বহু অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। এটা ভারতের পক্ষে চিন্তার বিষয়। সুখের কথা এই যে চীন শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে আবেদন জানিয়েছে।

সবশেষে একথা বলা যায় যে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ সমস্যা অত্যন্ত জটিল কেননা এ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ৮০ দশক থেকে শ্রীলঙ্কার সৈন্যবাহিনী এই অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। ১৯৯৫ সাল থেকে শ্রীলঙ্কা শান্তির জন্য যুদ্ধ (war for peace) চালাচ্ছে। তার ফলে শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছে অত্যন্ত দ্রুত হারে — ১০.২০ বিলিয়ান থেকে ৮৭ বিলিয়ানে দাঁড়ায় ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৭ সালে শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ৫৩ বিলিয়ান টাকা। এই অবস্থায় শ্রীলঙ্কায় তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে বিবাদের অবসানে নরওয়ের প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তবে তা হবে এই প্রজাতান্ত্রিক দ্বীপপুঞ্জে এক ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বভাবতই এই নতুন প্রেক্ষাপটে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের উন্নয়নের অগ্রগতি আরো দ্রুততর হবে।

২.৮ সারাংশ

ভারতের বিদেশনীতি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সংস্কৃতির আবহ, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মূল্যবোধের সংশ্লেষ — সংমিশ্রণ এবং পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের ভৌগোলিক - সামরিক - রাজনৈতিক গুরুত্ব - এই সকল উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে ভারতের বিদেশনীতির মৌলিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। ভারতের বিদেশনীতির প্রধান ভিত্তি হ'ল জোট-নিরপেক্ষতা। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণের মহান আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীল নীতি তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয়েছে ভারতের বিদেশনীতিতে।

অধ্যাপক ভি.পি.দত্তের মতে ভারতের বিদেশনীতির লক্ষ্যগুলি হ'ল — জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সংহতি ও সুরক্ষা, অন্যদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার, জাতীয় মর্যাদা রক্ষা, বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক সামর্থ্য অর্জন, বিশ্বশান্তি রক্ষা, আণবিক যুদ্ধের প্রসাররোধ, শান্তির জন্য আণবিক শক্তির ব্যবহার, নিরস্ত্রীকরণ, জোট-নিরপেক্ষ নীতিকে গ্রহণ করা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা, অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করা। এই লক্ষ্যগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায় — (১) মূল লক্ষ্য, (২) মধ্যবর্তী লক্ষ্য এবং (৩) দূরবর্তী লক্ষ্য।

ভারতের বিদেশনীতির প্রধান প্রধান নির্ধারকগুলি হ'ল — ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্পদ, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সরকারি ব্যবস্থা, জনগণের নৈতিকতা এবং সর্বোপরি ভারতের বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। অর্থনৈতিক স্বার্থসহ জাতীয় স্বার্থের প্রসার—ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম নির্ধারক।

আমরা জানি যে ভারতের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ভারতের বিদেশনীতির সঠিক চরিত্র অনুধাবন করা যায়।

ভারত - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ এবং নীতির সংঘাত দেখা গেছে। তার ফলে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক কখনও উষ্ণ বন্ধুত্বে, আবার কখনও বা চরম তিক্ততার মধ্যে দোলায়িত হয়েছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্ধারকের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। তাছাড়াও ভারত-পাকিস্তান বৈধতা, ভারতের নির্জোট নীতি, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধতা, নয়া-উপনিবেশিক যুদ্ধ, আগ্রাসনের বিরোধী মনোভাব, সামরিক জোট ও সামরিক ঘাঁটি গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধ মনোভাব উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে কাজ করেছে।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক কৌশলের দিক থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে যে শক্তি তার প্রভাব বিস্তার করবে সেই দেশ চীন, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান, ইরাণ ও রাশিয়াকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সেই কারণে এই উপমহাদেশে হয় ভারত না হয় পাকিস্তানের উপর মার্কিন আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি মার্কিন অসন্তোষ তাকে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে। অপরপক্ষে, ভারতের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহাই পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোট গঠনে সাহায্য করেছে। তাই ভারত - মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সবসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

ভারত - মার্কিন সম্পর্কের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ পাক-মার্কিন পারস্পরিক নিরাপত্তামূলক সামরিক চুক্তি। সত্তরের দশকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে মন্দা দেখা দেয়। এই দশকের প্রথমে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ভারত-মার্কিন সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে। একথা ঠিক যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়। ১৯৭৪ সালে ভারত রাজস্থানের পোখরানে প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বিমেরুপ্রবণতার অবসান এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার আগ্রহ দেখা যায় দুদেশের মধ্যে। তার ফলে উভয় দেশের মধ্যে 'ভিসন - ২০০০' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধক চুক্তি (NPT) এবং সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিরোধক চুক্তির (CTBT) বিষয়ে দুদেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফর ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের ভিত তৈরি করে। নেহেরুর আমন্ত্রণে ঐ বছরই ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিন ভারতে আসেন। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ভারতের শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতি ও জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের নীতিকে সমর্থন করেন এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পাক-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালে নিকিতা ক্রুশ্চভ সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণকে সোভিয়েত রাশিয়া নিন্দা করে।

১৯৭১ সালে নিক্সন প্রশাসনের ভারত-বিরোধী মনোভাব, চীন-পাকিস্তানের মধ্যে গোপন সমঝোতা ও পাকিস্তানের সাথে পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় ভারত রাশিয়ার সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে।

আশির দশকে আফগানিস্থানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের মধ্যে মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ভারত সন্তোষ

প্রকাশ করে। মিখাইল গর্বাচভের ক্ষমতা গ্রহণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাথে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের নীতি রাশিয়ায় আনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ফলে রাশিয়ার বিদেশনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটে।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৫০ সাল থেকেই রাশিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ভারতকে সমর্থন করেছে। বস্তুতঃ কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে রাশিয়ার সহানুভূতি, বাংলাদেশ যুদ্ধে রাশিয়ার কূটনৈতিক সমর্থন ভারতকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি কর্তৃক উত্থাপিত নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি রাশিয়া সহানুভূতিশীল। সাম্প্রতিক কালে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতের দাবির প্রতি রাশিয়ার সমর্থন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

১৯৮৯ সালে রাশিয়ার খণ্ডিকরণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধ ও দ্বি-মেরুকরণ প্রবণতার অবসানের ফলে রাশিয়া সহ সমস্ত দেশের বিদেশনীতিতেই বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন, জগৎজোড়া জালের (WWW) যুগে ভারত রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় না। বর্তমান রাশিয়ার বিদেশনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার কাছে চীন একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দেশ। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার বাধ্যবাধকতার জন্য এখন তাকে পশ্চিমী দেশ ও চীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে। এই নতুন বাস্তবের প্রেক্ষাপটে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ভারতের বিদেশনীতির প্রধান ভিত্তি পঞ্চশীল নীতি। এই নীতি অনুযায়ী ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতালাভের পর থেকে পাকিস্তান, চীন, পূর্বতন ব্রহ্মাদেশ (বর্তমানে মায়ানমার) ও শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের সম্পর্ক সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ থাকে নি। ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পাকিস্তান ও তার অ-বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব। পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছে। ক্রমাগত ভারতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। তাই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘকালীন তিক্ততা। চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক সবসময় ভাল ছিল না। বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার জল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় তামিল ভাষাভাষীদের সমস্যা নিয়ে ভারতের সাথে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক অনেক সময় মতভেদ ও তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। মায়ানমারের সামরিক সরকারের সাথে ভারতের সম্পর্ক উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সাম্প্রতিক কালে নেপালের সাথে ভারতের কিছু মতপার্থক্য ঘটেছে। সুতরাং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। সুখের বিষয় পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে ধীরে ধীরে। আশা করা যায় ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

এশিয়ার শান্তি, সুস্থিতি এবং প্রগতির ক্ষেত্রে ভারত-চীন মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়াকে বাদ দিয়ে যেমন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার কথা ভাবা যায় না। তেমনি চীন-ভারতকে বাদ দিয়ে এশিয়ার শান্তি ও সুস্থিতির কল্পনা করা যায় না। ভবিষ্যতে এশিয়ায় চীনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। মার্কিন প্রশাসনের কাছে চীনকে প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হ'ল ভারত-মার্কিন সুসম্পর্ক। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ ভারতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বলে অনেকের ধারণা।

২.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কোন্ কোন্ উপাদানের ভিত্তিতে ভারতের বিদেশনীতির মৌলিক কাঠামো তৈরি হয়েছে?

২। পঞ্চশীল নীতি কোন্ কোন্ আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

৩। 'স্নায়ুযুদ্ধ' এবং 'দ্বিমেরুকরণ' কাকে বলে? এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?

৪। 'সার্ক' (SAARC) এর অর্থ কী? কিভাবে এর উৎপত্তি হল?

৫। বাংলাদেশের দুই বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভারত সম্বন্ধে কি মনোভাব?

৬। শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ সংকটের সাহায্যার্থে ভারত কি উদ্যোগ নিয়েছিল?

(খ) রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। ভারতীয় বিদেশনীতির লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। কোন্ কোন্ নির্ধারক ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়?

৩। ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে যে ওঠাপড়া লক্ষ্য করা যায় তার আনুপূর্বিক আলোচনা করুন।

৪। ১৯৮৯ সালের পর থেকে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের পর্যালোচনা করুন।

৫। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ভারত-চীন সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৬। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন বৈরিতার কারণগুলি উল্লেখ করুন। এ ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারত কী কী উদ্যোগ নিয়েছে?

৭। সাম্প্রতিক কালে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নের বিষয়টি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৮। গত দুই দশকে ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে কী কী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়?

২.১০ উত্তর সংকেত

(ক)

১। পাঠ্যবস্তুর ৯০.১ অংশ দেখুন

২। পাঠ্যবস্তুর ৯০.২ অংশ দেখুন

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো তাকে এককথায় স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold war) বলে। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেলের মতে স্নায়ুযুদ্ধ বলতে সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তাদের প্রবক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের সাথে যুক্ত সমস্ত ঘটনাকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুযুদ্ধ হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে উত্তেজনা ও বিরোধের এক চরম পরিস্থিতি। স্নায়ুযুদ্ধ বস্তুত 'যুদ্ধহীন যুদ্ধ' বা 'না যুদ্ধ না শান্তি'র অবস্থাকে বোঝায়।

দ্বিমেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক বিশেষ প্রবণতা ও অধ্যায়কে বোঝায় যেখানে দুই মহাশক্তির রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। দ্বিমেরু প্রবণতা (Bipolarism) প্রকৃতপক্ষে দুটি শিবিরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝায়। বস্তুতঃ দ্বিমেরুকরণ প্রবণতা এবং স্নায়ুযুদ্ধ পরস্পরের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

৪। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.৩ অংশ দেখুন

৫। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.৩ অংশ দেখুন

৬। পাঠাবস্তুর ৯০.৭.৪ অংশ দেখুন

(খ)

১। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৩ অংশ দেখুন

২। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৪ অংশ দেখুন

৩। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৫ অংশ দেখুন

৪। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৬ অংশ দেখুন

৫। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.১ অংশ দেখুন

৬। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.২ অংশের মাঝামাঝি জায়গার থেকে লক্ষ্য করুন

৭। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.৩ অংশে উত্তর আছে।

৮। পাঠ্যবস্তুর ৯০.৭.৪ অংশে উত্তর আছে।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. রাধারমন চক্রবর্তী (সম্পা.) সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৯৯।

২। নির্মলকান্তি ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৬।

৩। শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি, দি ওয়ার্ড প্রেস, কলকাতা, ১৯৯২

৪। M. G. Gupta *Indian Foreign Policy : Theory and Practice*, Y. K. Publishers, Agra, India, 1985.

সাময়িক পত্রিকা (Journal)

Strategic Analysis, Monthly Journal of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

একক ৩ □ বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশ নীতি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন/বর্তমান রাশিয়া)।

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ মার্কিন বিদেশনীতি ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

৩.২.১ মার্কিন বিদেশ নীতি প্রণয়ন

৩.২.২ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য

৩.৩ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে মার্কিন বিদেশ নীতি

৩.৩.১ ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা

৩.৩.২ ইউরোপের বাইরে মার্কিন বিদেশ নীতি

৩.৩.৩ দ্যতাঁত (Detente) ও মার্কিন বিদেশ নীতি

৩.৪ তৃতীয় বিশ্ব, জোট নিরপেক্ষতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩.৫ সোভিয়েত বিদেশ নীতি ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

৩.৫.১ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে সোভিয়েত বিদেশ নীতি

৩.৫.২ ইউরোপ ও সোভিয়েত নীতি

৩.৫.৩ ক্রুশ্চেভ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি

৩.৫.৪ তৃতীয় বিশ্ব ও সোভিয়েত নীতি

৩.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের চীন নীতি

৩.৫.৬ গর্বাচভের বিদেশ নীতি ঃ ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবস্থান

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল সাম্প্রতিক কালের বৃহৎ শক্তিগুলির যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন/বর্তমান রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি পর্যালোচনা করা। এই এককটি পাঠ করে আপনি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন —

- মার্কিন বৈদেশিক নীতির বিবর্তন প্রণয়ন ও উদ্দেশ্য
- ঠাণ্ডা লড়াই এর প্রকৃতি ও উৎপত্তির কারণ
- মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ও সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক
- তৃতীয় বিশ্ব ও মার্কিন বিদেশনীতি
- সোভিয়েত বিদেশ নীতির ক্রমবিকাশ ও মূল উদ্দেশ্য
- সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও ঠাণ্ডা লড়াই এর অবস্থান
- ভারতের সাথে এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক।

৩.১ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি বুঝতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই দুই মহাশক্তিধর দেশকে কেন্দ্র করেই ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) ও দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনীতি (Bipolar Politics)-র সৃষ্টি হয়। গত কয়েক দশক ধরে এই দুই রাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মতাদর্শগত ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনা হয়। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসী একাধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়।

৩.২ মার্কিন বৈদেশিক নীতি ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

বর্তমান বিশ্বের একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অনেকের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর আমেরিকা এখন পৃথিবীর একমাত্র 'Super power'। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে এখানে ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ, উর্বর কৃষিজমি, শিল্প, প্রযুক্তি ও অন্যান্য নানা প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দিক থেকে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত।

ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকায় দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতির জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহ থেকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি অবলম্বন করে। অধ্যাপক যোশেফ ফ্র্যাঙ্কেল (Joseph Frankel) ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মার্কিন নীতিকে 'Splendid isolation' এর নীতি বলে বর্ণনা করেছেন।

মনরো নীতি ঃ ইউরোপের ঘটনাবলী থেকে এই বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি আনুষ্ঠানিক রূপ পায় Monroe Doctrine-এ। রাষ্ট্রপতি মনরো ছিলেন এই নীতির প্রধান প্রবক্তা; তাই তাঁর নাম অনুসারে এই নীতির নাম মনরো নীতি। রাষ্ট্রপতি মনরো আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলির অনুপ্রবেশ, বাণিজ্য অথবা হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ সালে ঘোষিত এই মনরো নীতিতে বলা হয় যে আমেরিকাকে কোন ইউরোপীয় জাতির ভবিষ্যৎ উপনিবেশে পরিণত করা চলবে না। (The American Continents . . . hence forth [should] not be considered as subjects of future conlonization by any European Powers)। মনরো নীতির মূল কথা ছিল 'America for the Americans'। মনরো আরও ঘোষণা করলেন যে আমেরিকাও ইউরোপের কোন ব্যাপারে জড়িত থাকতে চায় না। ইউরোপে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকলেও দূরপ্রাচ্যে (Far East)-র ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখায়। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি চীনে যে সফল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত আমেরিকাও সেই সফল সুযোগ সুবিধা দাবি করে এবং জাপানী সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য চীন সম্পর্কে মুক্ত দ্বার নীতি (Open Door Policy) ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শবাদী প্রেসিডেন্ট উড্রো ইউলসন (Woodrow Wison) জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের বিরোধিতার জন্য আমেরিকা লীগে যোগদান করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে মার্কিন বিদেশ নীতি রচনা প্রণালীটি বুঝে নেওয়া দরকার।

৩.২.১ মার্কিন বিদেশ নীতি প্রণয়ন

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান একদা বলেছিলেন, "The President makes foreign policy"। ফ্র্যাঙ্কেল বলেছেন, একথা অতিশয়োক্তি হলেও মূলত সত্য। মার্কিন রাষ্ট্রপতিই হলেন সে দেশের বিদেশনীতির প্রধান রূপকার। তবে তিনি এককভাবে বিদেশনীতি নির্ধারণ করেন না। মার্কিন আইনসভা, বিশেষ করে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট; আমলাতন্ত্র, বিদেশ বিভাগ (State Department), গুপ্তচর বিভাগ যথা CIA, সামরিক সংগঠন Pentagon, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী যেমন ইহুদী লবি, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা, রাজনৈতিক দল, জনমত ও গণসংযোগ মাধ্যম মার্কিন বিদেশ নীতি রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি হল (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি (Federalism) এবং (২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Principles of Separation of Powers

and Checks and Balances)। এই দ্বিতীয় নীতিটি অনুযায়ী সিনেটের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতির সম্পাদিত কোন চুক্তি কার্যকর করা যায় না।

৩.২.২ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য

যে কোন দেশের বিদেশ নীতিই তার জাতীয় স্বার্থ (National Interest) দ্বারা প্রধানত নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার নেতা। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিকাশ সুনিশ্চিত করা ও কমিউনিজম্ প্রতিরোধ করা। ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war)-এর যুগে এই নীতি Containment Policy নামে পরিচিত ছিল। এই নীতি কার্যকর করতেই আমেরিকা ইউরোপে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO), মধ্যপ্রাচ্যে CENTO, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় SEATO, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ANZUS pact গড়ে তোলে। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য (hegemony) বজায় রেখে নিজের super power মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা মার্কিন বিদেশনীতির প্রধান লক্ষ্য। এর আর একটি উদ্দেশ্য হল মার্কিন ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে মার্কিন অর্থনৈতিক উন্নতি বজায় রাখা।

৩.৩ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে মার্কিন বিদেশ নীতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে দুটি অতি বৃহৎ শক্তি রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিগুলি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ক্ষমতার শূন্যতার (Power Vacuum) সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি super power রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কমিউনিস্ট শিবিরের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা (ideological) and (power struggle) ঠাণ্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিত। এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনীতি বা Bipolar politics এর উদ্ভব হয়। ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ রোধ করা। এই Containment নীতির অন্যতম রূপকার ছিলেন মার্কিন কূটনীতিবিদ George F. Kennan। Kennan ছিলেন সোভিয়েত রাজধানী মস্কোয় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তিনি ওয়াশিংটনে প্রেরিত এক গোপন বার্তায় রাশিয়ার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। তাছাড়া 'Mr X' ছদ্মনামে Foreign Affairs ম্যাগাজিনে লিখিত একটি প্রবন্ধে Kennan এই Containment নীতির মূল বক্তব্য বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন।

৩.৩.১ ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে বিশ্বের যেসব

স্বাধীনতাকামী মানুষ দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের ও বহিঃশক্তির চাপ প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম করবে মার্কিন সরকার তাদের সাহায্য করবে। ("I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or the outside pressures".) এই নীতি ট্রুম্যান নীতি বা Truman Doctrine নামে পরিচিত। এই নীতি অনুযায়ী আমেরিকা গ্রীস ও তুরস্কে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরণ করে। ট্রুম্যান নীতি এটা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছিল যে আমেরিকা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ প্রভাব সম্প্রসারিত করে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প।

ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার তিন মাসের মধ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুভব করেছিল যে ইউরোপে কমিউনিজম্ এর প্রভাব প্রতিরোধের জন্য পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সঞ্জীবন শীঘ্র প্রয়োজন। Peter Calvocoressi বলেছেন, "- - - the United States inaugurated the Marshall Plan to avert an conomic collapse of Europe which could, it was feared, leave the whole continent helplessly exposed to Russian power and communist lures." মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি. মার্শাল এই নীতি ঘোষণা করেছিলেন বলে তাঁর নাম অনুসারে এই নীতি Marshall Plan নামে খ্যাত। পশ্চিম ইউরোপে রুশ সম্প্রসারণ প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে North Atlantic Treaty Organization (NATO) বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা গঠিত হয়। এটি ছিল মূলত একটি সামরিক জোট। এই চুক্তির দ্বারা উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের ১২টি দেশ ঘোষণা করল যে এই দেশগুলির কোন একটি আক্রান্ত হলে সকলে মিলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে ("An armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on them all . . .")।

৩.৩.২ ইউরোপের বাইরে মার্কিন বিদেশ নীতি

ইউরোপের বাইরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় একই ধরনের সোভিয়েত ও কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ প্রতিরোধকল্পে বাগদাদ চুক্তি (Baghdad Pact), মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংগঠন (Middle East Defence Organization বা MEDO) এবং পরে এরই পরিবর্তিত রূপ Central Treaty Organization বা CENTO গড়ে তোলা হয়। আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষে আমেরিকা ইস্রায়েলকে সমর্থন করে। মার্কিন ইহুদী লবির ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। চীনে কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিন-তাং এর মধ্যে গৃহযুদ্ধে আমেরিকা চিয়াং কাইশেক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কুয়ো-মিন-তাংকেই সর্বতোভাবে সহায়তা করে। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চেয়ারম্যান মাও-জে-ডঙ-এর নেতৃত্ব চীনে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে চিয়াং কাইশেক চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে তাইওয়ান বা ফর্মোজা দ্বীপে সরকার গঠন করতে বাধ্য হন। মার্কিন সরকার কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দেয় না।

রাষ্ট্রসংঘে কমিউনিস্ট চীনের সদস্য লাভের পথে মার্কিন ভেটো (Veto) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় আমেরিকার উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় চীনকে 'আক্রমণকারী' বলে চিহ্নিত করা হয়। Calvocoressi বলেছেন যে, The Korean war "Converted containment from a European to a more nearly global policy." তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সামরিক সাহায্য দান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রভাব প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেছিল। (পরবর্তীকালে আমরা দেখব ১৯৭১ সালে চীন সম্পর্কে মার্কিন নীতির পরিবর্তন হয়।) দূরপ্রাচ্যে ভিয়েতনামেও মার্কিন Containment নীতি অনুসৃত হতে থাকে এবং ১৯৬৫ সালে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষ নিয়ে উত্তরের ডঃ হো-চি-মিনের জনপ্রিয় কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকা ANZUS চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার (Eisenhower) এর সময় Containment নীতি অব্যাহত থাকে। তাঁর বিদেশ সচিব জন ফস্টার ডালেস (John Foster Dulles) আরও কঠোর নীতি 'Policy of Massive Retaliation' অনুসরণ করার কথা বললেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না।

৩.৩.৩ দ্যতাঁত (Detente) ও মার্কিন বিদেশ নীতি

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক যোশেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু হয় এবং কিছুদিন পরেই রাশিয়ায় de-stalinization প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্ট্যালিন-পরবর্তী যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন পথ অবলম্বন করে। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণে রেখে রাশিয়ার নতুন নেতা ক্রুশ্চেভ (Khruschev) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (Peaceful Co-existence) ডাক দেন। এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (Cuban Missile Crisis)। আমেরিকার পার্শ্ববর্তী দেশ কিউবায় রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি (John F. Kennedy) কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করেন এবং ১৯৬২ সালে ঠাণ্ডা লড়াই প্রায় গরম যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ হবার সম্ভাবনাকে 'Brink manship' বলা হয়। কেনেডি এবং ক্রুশ্চেভ উভয়েই সময়োচিত বাস্তববোধ দেখিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের পথ পরিহার করেন এবং ধীরে ধীরে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস পেতে থাকে।

এই উত্তেজনা প্রশমনকেই দ্যতাঁত (Detente) বলা হয়। 'Detente একটি ফরাসী শব্দ। এর অর্থ হল বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা। Coral Bell বলেছেন যে সুপরিকল্পিতভাবে ও সচেতনভাবে উত্তেজনা হ্রাস করার নীতিকে দ্যতাঁত বলা যায়। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছিল। দ্যতাঁতের মাধ্যমে এই ব্যয়ের মাত্রা হ্রাস করার সম্ভাবনাও ছিল। Calvocoressi লিখেছেন, "The argument for more butter and fewer guns gained ground."

অস্ত্র সীমিতকরণ নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

ক) আংশিক পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি; (Partial Nuclear Test Ban Treaty 1963)।

খ) পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ-বিরোধী চুক্তি বা সাধারণভাবে NPT নামে খ্যাত (Nuclear Non-Proliferation Treaty) এবং

গ) স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (Strategic Arms Limitation Talks I, 1972)।

১৯৭০-এর দশকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন (Richard Nixon) দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় আসার পর নিকসন ঘোষণা করেন, "The era of confrontation has ended; the era of negotiations has begun." নিকসনের বৈদেশিক নীতির মূল বিষয় ছিল সোভিয়েত-মার্কিন বিরোধ প্রশমিত করা, কমিউনিস্ট চীনকে আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে গ্রহণ করা, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন দায়দায়িত্ব হ্রাস। এই নীতি কার্যকর করতে তাঁকে যোগ্য সহায়তাদান করেন তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা (National Security Adviser) হেনরী কিসিঞ্জার (Henry Kissinger)। নিকসন ১৯৭২ সালে সোভিয়েত সফরে যান ও উভয় দেশের মধ্যে মস্কোতে SALT-I চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার (Jimmy Carter) বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার (human rights) রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কার্টার প্রশাসনের প্রথম দিকে দ্যতাঁত প্রক্রিয়া বজায় থাকলেও ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র SALT-II চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে এবং ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত মস্কো অলিম্পিক বয়কট করে। আরব-ইস্রায়েল সম্পর্কের উন্নতি ও প্যালেস্তাইন সমস্যার সমাধান কল্পে কার্টারের উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে Camp David চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কার্টারের সময়ই চীনের সঙ্গে আমেরিকার পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন বিদেশ নীতি ঃ ১৯৮০ সালের মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagan) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে রেগন প্রশাসন রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে। ক্ষমতায় এসেই রেগন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'অশুভ সাম্রাজ্য' (evel cmpire) বলে চিহ্নিত করেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য রেগন 'নক্ষত্রযুদ্ধ' (Star Wars বা Strategic Defence Initiative) পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। আফগান বিদ্রোহীদের সাহায্য দানের জন্য রেগন প্রচুর সামরিক অস্ত্রসাহায্য দান করেন। রেগনের বিদেশ নীতির ভিত্তি ছিল চরম কমিউনিস্ট বিরোধিতা। এই কারণেই লাতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণপন্থী

শাসকদের প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে মার্কিন সামরিক বাহিনী গ্রেণাজ দখল করে।

রেগন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতা (১৯৮৪-৮৮) গ্রহণ করার পরে রাশিয়ার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে মিখাইল গর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev)-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোভিয়েত বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। গর্বাচভ 'পেরেস্ত্রৈকা (Perestroika) ও 'গ্লাসনোস্ত' (Glasnost) নীতির ঘোষণা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে নভেম্বর মাসে জেনিভাতে গর্বাচেভের সঙ্গে রেগনের শীর্ষ বৈঠক (Summit) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে অক্টোবরে আইসল্যান্ডের রাজধানী রেকিয়াভিকে (Reyjavik) রেগন ও গর্বাচেভ পুনরায় মিলিত হয়। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া সৈন্য অপসারণে সম্মত হলে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ১৯৮৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র I.N.F. চুক্তি সম্পাদন করে। পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

কাম্পুচিয়া (ক্যাম্বোডিয়া) ও তাইওয়ান প্রশ্নে চীন-মার্কিন মতপার্থক্য থাকলেও রেগনের আমলে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক উন্নত হয়। ১৯৮৪ সালে রেগনের চীন সফরের সময় উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীন মুক্তদ্বার নীতি গ্রহণ করার ফলে মার্কিন লগ্নির পথ প্রশস্ত হয়। আশির দশকে তাই চীন-মার্কিন বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (১৯৮৮-১৯৯২) ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর রেগনের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রেগন প্রশাসন এবং বুশ প্রশাসনের মধ্যে কোন মৌলিক বা গুণগত পার্থক্য ছিল না। বুশ প্রশাসনের সময়ই পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের চরম বিপর্যয় ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ধরে; বার্লিন প্রাচীর (Berlin wall) ভেঙে দেওয়া হয়; দুই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়; ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও দ্বিমেরুপ্রবণতার অবসান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অতি দ্রুততার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। NATO ও Warsaw Pact ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে C.F.E. চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা Conventional বা সাবেকী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়।

বুশের প্রশাসনের সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ। ইরাক তার পার্শ্ববর্তী দেশ কুয়েত আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘ ইরাকের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়। অনেকের মতে রাষ্ট্রসংঘের নামে পরিচালিত হলেও এটি ছিল মূলত একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

বুশ প্রশাসনের সময় সাময়িক ভাবে চীন-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমেরিকা তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে ছাত্রদের হত্যা করার প্রতিবাদ করলেও চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

আনলে চীন বিরক্ত হয় ও সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা Most Farvoured Nation মর্যাদা প্রত্যাহার করার হুমকি দেয়। কিন্তু চীনের মতো বিশাল বাজার হারানোর ভয়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাপে আমেরিকা পুনরায় চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আগ্রহী হয়। বুশ ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে 'New world order' গড়ে তোলার ডাক দেন। এর মূল কথা ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন একাধিপত্য (U.S. Legemony) প্রতিষ্ঠা করা। ক্লিন্টন প্রশাসনও সেই নীতি অব্যাহত রাখে। হাইটিতে মার্কিন সেনাবাহিনী প্রেরণ, ইরানের ওপর আক্রমণ চালানো, কসোভো সমস্যা নিয়ে সার্বিয়ার ওপর বোমাবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা থেকে পরিষ্কার যে আমেরিকা আন্তর্জাতিক পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩.৪ তৃতীয় বিশ্ব, জোট নিরপেক্ষতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রধানত তার কমিউনিস্ট-বিরোধিতা নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। Frankel তাই বলেছেন, "American relations with other regions and states were to a very large extent a reflection of their relations with the Communist Powers . . ." কমিউনিজম্ বিরোধিতার নামে ইন্দোচীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের স্থান গ্রহণ করে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আবার কমিউনিজম্ প্রতিরোধ কল্পেই দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনস্ এ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচারী বর্ণবিদ্বেষী শেতাঙ্গ সরকারকে মৌখিক ভাবে সমর্থন না করলেও বাস্তবে এই সরকারের প্রতি সরাসরি কঠোর কোন ব্যবস্থা আমেরিকা নেয় নি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নিজের আধিপত্য ও খবরদারী বজায় রাখাই মার্কিন নীতির উদ্দেশ্য। নিকারাগুয়া, পানামা, হাইটি গ্রেনাজ, প্রভৃতি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার বার হস্তক্ষেপ করেছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির সময় কিউবা অভিযানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশ জোট নিরপেক্ষ নীতি (Non-aligned policy) অনুসরণ করেছিল আমেরিকা তাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। সাম্প্রতিককালে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হলেও বহুদিন যাবৎ আমেরিকা পাকিস্তানকে প্রচুর সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি আফ্রিকান দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বামপন্থী-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাহায্য করেছে। এক কথায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশলে নয়া-উপনিবেশিক শোষণ চালায়, বলে সমালোচকগণ মনে করেন।

৩.৫ সোভিয়েত বিদেশ নীতি ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতা ও মহাশক্তিধর (Super-power) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মেরুতে

অবস্থান করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাশিয়ার বিদেশ নীতি অনুধাবন করতে হলে সংক্ষেপে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে পুঁজিবাদী শক্তিবর্গের মনোমালিন্য শুরু হয়। হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও যোশেফ স্ট্যালিনের রাশিয়া সাময়িকভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। Peter Calvocoressi এই যুদ্ধকালীন মিত্রতাকে যথার্থভাবেই "marriage of Convenience" আখ্যা দিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করে।

সোভিয়েত বিদেশ নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর (Imperialism – The Highest Stage of Capitalism) বলে উল্লেখ করেন। মার্কসবাদ অনুযায়ী পুঁজিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন এবং পরাধীন জাতিগুলিকে মুক্তিসংগ্রামে উৎসাহিত করেন। Communist International বা Comintern-এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

৩.৫.১ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে সোভিয়েত বিদেশ নীতি

১৯৩৯ সালে রুশ রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে হিটলার এই চুক্তি ভেঙে রাশিয়া আক্রমণ করলে স্ট্যালিন মিত্রজোটে যোগদান করেন। বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত সরকার পূর্ব ইউরোপে তার প্রভাব সম্প্রসারিত করার কাজে মনোনিবেশ করে। এই সময় পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের (Winston Churchill) ফুলটন বক্তৃতা (Fulton speech) পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে আসন্ন ঠাণ্ডা লড়াই-এর ইঙ্গিত দেয়। এই বক্তৃতায় চার্চিল বলেন যে স্টেটিন থেকে ট্রিয়েস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত লৌহ যবনিকা (Iron Curtain) - র অন্তরালে চলে গেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সতর্ক না হয় তাহলে রাশিয়া সমগ্র 'Free world' কে গ্রাস করবে। সোভিয়েত বিদেশনীতির মূল ভিত্তি মার্কসবাদ লেনিনবাদ হলেও পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সময়োপযোগী নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই দেখা যায় যে মার্কসবাদ অনুযায়ী ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হলেও ক্রুশ্চেভের যুগে রাশিয়া পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। Peaceful Co-existence) ডাক দেয়।

সোভিয়েত বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য ঃ সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্যগুলি সোভিয়েত সংবিধানের (১৯৭৭) ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছিল। সংবিধানে বলা হয়েছিল সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হবে সাম্যবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুকূলে আন্তর্জাতিক শর্তগুলির নিশ্চিতকরণ,

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংরক্ষণ, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থানজনিত সংহতি সাধন, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতিতে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতির সংগ্রামকে সমর্থন, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নিবারণ, সার্বজনীন ও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ অর্জন এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির সঙ্গতি সম্পন্ন রূপায়ণ। সংবিধানে আরও ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মৈত্রী, সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা প্রদানকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করবে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শ্রম বিভাজনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে।

৩.৫.২ ইউরোপ ও সোভিয়েত নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির পুনর্গঠন নিয়ে চার বিজয়ী শক্তির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্মানিকে নিয়ে জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার (F.R.G. বা Federal Republic of Germany) গঠন করে। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানির রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন G.D.R বা German Democratic Republic গড়ে তোলে। ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকর হলে রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয়। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আশংকা করেন যে মার্শাল পরিকল্পনার সহায়তায় পশ্চিমের দেশগুলি রুশ-বিরোধী জোটে আবদ্ধ হবে। আমেরিকার হাতে আণবিক বোমা থাকায় রাশিয়া স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত ছিল। মার্শাল পরিকল্পনার প্রত্যুত্তরে ১৯৪৭ সালে রাশিয়া কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (Cominform) গঠন করে। এটি ছিল Comintern-এর উত্তরসূরি। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লাক্সেমবার্গ প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য ব্রাসেলস চুক্তি (Brussels Pact) স্বাক্ষর করলে রাশিয়াও এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে Comecon গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে সাম্যবাদী যৌথ অর্থনীতি প্রয়োগ করা। ১৯৪৮-এর বার্লিন অবরোধের ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তোলে। পশ্চিমের NATO চুক্তির প্রত্যুত্তরে রাশিয়া ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য Warsaw Pact নামক সামরিক জোট গঠন করে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকার পায়। আণবিক শক্তি অর্জনের জন্য রাশিয়া এই সময় অবিরাম গবেষণা চালিয়ে যায় ও ১৯৪৯ সালে এ্যাটম বোমা প্রস্তুত করতে সফল হয়। স্ট্যালিনের সময় মোটামুটি ভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ঐক্য বজায় থাকলেও যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর (Tito) সঙ্গে স্ট্যালিনের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যুগোশ্লাভিয়াকে Cominform থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৩.৫.৩ ক্রুশ্চেভ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি

১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত বৈদেশিক নীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা

দেয়। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা স্মরণ রেখে নতুন সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Peaceful Co-existence)-এর ডাক দেন। ক্রুশ্চেভ মনে করতেন যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করা সম্ভব। সোভিয়েত-মার্কিন আণবিক যুদ্ধের পরিণাম উভয়ের পক্ষেই ছিল ধ্বংসাত্মক। পারমাণবিক সামর্থ্যকে Mutual Assured Destruction বা MAD Capability বলা হয়। তাই Co-destruction-এর একমাত্র বিকল্প ছিল Co-existence বা সহ-অবস্থান। সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি ঘোষণা করলে দ্যতাঁতের পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও ঠাণ্ডা লড়াই-এর উত্তেজনা অনেকটা হ্রাস পায়। তবে এই পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (Cuban missile crisis)। ১৯৬২ সালে ক্রুশ্চেভ কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করলে আমেরিকা আতঙ্কিত হয় ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি অবরোধ ঘোষণা করেন। দুই Super power-এর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে সময়োচিত বাস্তববোধ দেখিয়ে উভয় নেতাই যুদ্ধের পথ পরিহার করেন। এই যুদ্ধের কিনারায় পৌঁছে যাবার নীতিকে 'Brinkmanship' বলা হয়েছে। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পর দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগের বরফ গলতে শুরু করে। এই পর্যায়ের সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্কে 'thaw' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে হট লাইন (Hot line) স্থাপিত হয়। রাশিয়ার অভ্যন্তরে যে স্ট্যালিন-বিরোধী 'de-stalinization' প্রক্রিয়া শুরু হয় পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাকে স্বাগত জানায়। তৃতীয় বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (Non-Aligned Movement) সাথে সদ্ভাব রেখে ক্রুশ্চেভ তাঁর বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া বজায় রেখে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তার করা ছিল ক্রুশ্চেভের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। দ্যতাঁত-এর যুগে সোভিয়েত নীতি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ দ্যতাঁত (Dentente) আখ্যা দিয়ে থাকেন। দ্যতাঁত-এর যুগে সোভিয়েত বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমের সঙ্গে সম্পূর্ণ উন্নয়ন করা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নিজ প্রভাব বিস্তার করা। পশ্চিম জার্মানিতে চ্যান্সেলার উইলী ব্র্যান্ডট ক্ষমতায় আসার পর রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির সম্পর্ক উন্নত হয়। ক্রুশ্চেভের পর রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের (Breshnev) যুগ শুরু হয় ও দ্যতাঁতের নীতি অব্যাহত থাকে। তবে ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে ওয়ারস চুক্তির সেনাবাহিনী তা কঠোর ভাবে দমন করে। রাশিয়ার এই নতুন নীতিকে Breshnev Doctrine বলা হয়। এই নীতির মূল কথা ছিল যে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ সমাজবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হলে ক্রেমলিনের অধিকার থাকবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার। ব্রেজনেভের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক উন্নত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন মস্কো সফর করেন ও ব্রেজনেভও ওয়াশিংটন সফর করেন। উভয় দেশের মধ্যে SALT-I চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৫ সালে হেলসিংকিতে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

কানাডা ও ইউরোপের ৩৩টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মানবাধিকার সুরক্ষিত করার আশ্বাস দেয়।

৩.৫.৪ তৃতীয় বিশ্ব ও সোভিয়েত নীতি

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই সকল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন জানায়। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশের মুক্তি সংগ্রামে মস্কো সক্রিয় ভাবে সাহায্য করে। রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায় শাসকগোষ্ঠীর বর্ণ বৈষম্যবাদ বা Apartheid নীতির বিরুদ্ধে রাশিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন জানায়।

আরব দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রতা সম্প্রসারিত হয়। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (Palestine Liberation Front) কে মস্কো সমর্থন জ্ঞাপন করে। ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র, লিবিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী সংগ্রামকে রাশিয়া নৈতিক সমর্থন জানায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement বা NAM) -এর এক বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এক সময় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের 'স্বাভাবিক বন্ধু' (Natural ally) বলা হত যদিও এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বিতর্ক দেখা দেয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নেহেরুর সময় ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলে মস্কো তা স্বাগত জানায়। তবে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ১৯৫৫ সালে ক্রুশ্চেভের ভারত সফরের সময়। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নেরও মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের নীতিকে সমর্থন করে। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদগর্ণি (Podgorny) আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সফর করেন এবং বর্ণবৈষম্যবাদ ঔপনিবেশিকতা ও নয়া উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের লড়াই-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৮০ সাল নাগাদ অ্যাঙ্গোলা, মোজামবিক ও ইথিওপিয়ায় সোভিয়েতপন্থী মার্কসবাদী সরকার স্থাপিত হয়। এই সময় নিকারাগুয়া, এল সালভাডর এবং কিউবার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অন্যতম প্রধান অস্ত্রসরবরাহকারী দেশরূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মপ্রকাশ করে। ভিয়েতনামের সহায়তায় ক্যাম্বোডিয়ার সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation) স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সুদৃঢ় হয়।

৩.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের চীন নীতি

১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবরে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘঠিত হবার পর স্ট্যালিনের রাশিয়া ও মাও-জে-ডং এর চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি (Treaty of Friendship Alliance and Mutual Assistance) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া চীনকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও কারিগরী সহায়তা দান করে। তাছাড়া চীনের পুনর্গঠনের কাজেও রাশিয়া সাহায্য করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক অবনতি হতে শুরু করে। ক্রুশ্চেভ যে স্ট্যালিন বিরোধী de-stalinization প্রক্রিয়া শুরু করেন চেয়ারম্যান মাও তা তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেবেন এই প্রশ্নেও ক্রুশ্চেভ ও মাও-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এছাড়া মতাদর্শগত কারণও ছিল। রাশিয়া ক্রুশ্চেভের আমলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (Peaceful co-existence) নীতি ঘোষণা করে। অন্যদিকে চীন পুঁজিবাদের সঙ্গে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার (Inevitability of war with capitalist states) নীতিতে বিশ্বাস করত। এই সকল সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী ও ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় বিদ্রোহ দমনে রাশিয়া সৈন্য প্রেরণ করলে চীন তার কঠোর সমালোচনা করে। এ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত ভূমিকাকে চীন নিন্দা করে। সোভিয়েত-সমর্থিত ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়ায় পলপট সরকারের অবসান ঘটালে চীন অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করলে চীন এই হস্তক্ষেপকে 'সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করে। ১৯৭৬ সালে মাও-এর মৃত্যুর পর চীন বিদেশনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। চীনে সংস্কারবাদী নেতা ডেঙ্ জিয়াও পিঙ্ (Deng Xiao Ping)-এর উত্থান ঘটে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নেও বাস্তববাদী নেতা মিখাইল গোর্বাচেভের উত্থানের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ ঘটে।

৩.৫.৬ গর্বাচভের বিদেশ নীতি ঃ ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবস্থান

১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। আর এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দুটি নতুন নীতি — 'পেরেস্ত্রইকা' (Perestroika) ও গ্লাসনোস্ত (glasnost)। এই নতুন ভাবনা দুটির প্রবক্তা ছিলেন মিখাইল গোর্বাচেভ (Gorbacev) ১৯৮৫ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে গোর্বাচেভ তাঁর এই নতুন চিন্তার উপর ভিত্তি করে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করতে অগ্রসর হন। তাঁর 'পেরেস্ত্রৈকাও নতুন ভাবনা ঃ আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্ব' (Perestroika : New Thinking for our country and the world) পুস্তকে গোর্বাচেভ তাঁর পররাষ্ট্র নীতির মূলসূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেন। গোর্বাচেভের মতে গ্লাসনোস্ত-পেরেস্ত্রৈকা হল গণতন্ত্রীকরণের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের ভাবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা', পেরেস্ত্রৈকা বলতে পুনর্গঠন, পরিবর্তন ও নবসংস্কারকে বোঝায়। অন্যদিকে গ্লাসনোস্ত বলতে মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্রকে বোঝায়। ১৯৮৫ সালে

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি (CPSU)-র ২৭তম কংগ্রেসে পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনোস্তকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই কংগ্রেসে নতুন পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা অঙ্কন করা হয়। বলা হয় যে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হল ঃ

(১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎকর্ষসাধন ও সাম্যবাদের অগ্রগতির অনুকূলে বৈদেশিক পরিস্থিতির সৃষ্টি;

(২) বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর করা এবং সার্বজনীন নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর করে তোলা;

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতি ও উন্নতি সাধন করা;

(৪) সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে সমমর্যাদা ও মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ সাধন;

(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক স্বার্থসাধক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক সাধন; এবং

(৬) কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক স্থাপন। তাঁর 'Perestroika' গ্রন্থে গোর্বাচেভ ঘোষণা করলেন ঃ "- - - We genuinely seek to improve Soviet American relations and attain at least that minimum of mutual understanding needed to resolve issues crucial to the world's future."

গোর্বাচেভ বললেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম বিশ্বের পরস্পরবিরোধী দুই শিবিরকে অনেকখানি নিকটবর্তী করে এনেছে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যকার মৌলিক দ্বন্দ্বের থেকেও বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামরিক নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকার সঙ্গে ব্যয়সাধ্য অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসতে গোর্বাচেভ অস্ত্র সংবরণ ও নিরস্ত্রীকরণের পথ বেছে নেন। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পথ পরিহার করে গোর্বাচেভ বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার পথে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে শুরু করেন। আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার, কাম্পুচিয়া থেকে সোভিয়েত-সমর্থিত ভিয়েতনামী সেনা অপসারণ, একতরফা অস্ত্রসংবরণ ঘোষণা, রেগ্যান ও বুশের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনার জন্য ভ্লাদিভোস্তক ঘোষণা প্রভৃতি সকলই ছিল এই নতুন নীতির ফলশ্রুতি।

কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্য হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর এক দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ রাজ্যগুলিতে সার্বভৌমত্বের দাবি ক্রমশই প্রবল হয়। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়ায় তা প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত

ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং "স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের কমনওয়েলথ, (Common-wealth of Independent states বা CIS) স্থাপিত হয়। পূর্বতন ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থলে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় যথা রাশিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান, তাজিকিস্তান, ইউক্রেন ইত্যাদি।

পূর্ব ইউরোপেও এর প্রভাব পড়ে। হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটে। বার্লিন প্রাচীর (Berlin Wall) ভেঙে ফেললেন পূর্ব জার্মানির নাগরিকেরাই। এক অভ্যুত্থানের ফলে গোর্বাচেভ ক্ষমতাচ্যুত হন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন বরিশ ইয়েলৎসিন (Boris Yeltsin) ও অন্যান্য সংস্কারপন্থীরা। সমাজতন্ত্রের পতন ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান সূচিত করে।

৩.৬ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করত। মনরো নীতিতে বিচ্ছিন্নতার এই নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে। কমিউনিজম্ প্রতিরোধ করা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ সুনিশ্চিত করা আমেরিকার বিদেশনীতির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, দুই মহাশক্তিধর দেশ — পুঁজিবাদী আমেরিকার এবং কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতাদর্শগত ও ক্ষমতার লড়াই বা ঠাণ্ডা লড়াই বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

ট্রুম্যান নীতি অনুযায়ী আমেরিকা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ প্রভাব সম্প্রসারণের জন্য বিশ্বের স্বাধীনতকামী মানুষদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের ১২টি দেশ মিলিতভাবে NATO সামরিক জোট গঠন করে।

ইউরোপের বাইরে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির জন্য বাগদাদ চুক্তি, MEDO, CENTO ইত্যাদি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ছাড়াও এশিয়ার জন্য SEATO স্বাক্ষরিত হয়।

কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে প্রথমে তিক্ত সম্পর্ক থাকলেও ১৯৭১ থেকে চীন-মার্কিন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়।

১৯৫৩ সালে যোশেফ স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে দাঁতাত বা উত্তেজনাহ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আংশিক পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তিগুলির মাধ্যমে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সৌজন্য ব্যয়ের মাত্রা হ্রাসের

প্রসঙ্গ ছিল। ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ হ্রাসকল্পে SALT-I চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর মার্কিন সোভিয়েত সম্পর্ক আফগানিস্থানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে অবনতির দিকে যায় এবং SALT-II চুক্তিতে সমস্যা দেখা যায়। অন্যদিকে চীন-আমেরিকা সম্পর্ক উন্নত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচভের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনোস্তকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণের জন্য উভয়ে INF চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

পরবর্তীকালে বার্লিন-প্রাচীর ভেঙে দেওয়া, ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও দ্বিমেরুপ্রবণতার অবসানকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করে New world order গড়ে ওঠে।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পুঁজিবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পুরনো তিক্ততা আত্মপ্রকাশ করে। লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন এবং পরাধীন জাতিগুলিকে মুক্তিসংগ্রামে উৎসাহিত করেন। পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া ইত্যাদি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির পুনর্গঠন নিয়ে চার বিজয়ী শক্তির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায়। পূর্ব জামানি সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে যায়। যেখানে জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক গড়ে তোলা হয়। মিত্রশক্তির অন্য তিন রাষ্ট্রের আওতায় পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। এই সময় থেকে ঠাণ্ডা লড়াই বৃদ্ধি পায়। ব্রাসেলস চুক্তি, কসেকন ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ক্রুশ্চেভের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি গুরুত্বলাভ করে। কিউবাকে কেন্দ্র করে উভয়ের সম্পর্ক তিক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়। উভয়ের মধ্যে দাঁতাত বা উত্তেজনা প্রশমন নীতি প্রাধান্য পায়। গর্ভাচেভের আমলে পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের প্রাধান্যের ফলে উভয়ের সম্পর্ক উন্নততর হতে থাকে।

তবে শেষ পর্যন্ত অঙ্করাজ্যগুলির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার ফলে ১৯১৯ এ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ঘটে এবং গর্বাচেভের স্থানে বরিশ ইয়েলৎসিন ক্ষমতাসীন হন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশেও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। এর ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৭ অনুশীলনী

১। ক) 'ঠাণ্ডা লড়াই' (cold war)-এর অর্থ কী?

খ) 'Containment' বলতে কী বোঝায়?

গ) ট্রুম্যান নীতির উদ্দেশ্য কী ছিল?

ঘ) মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

ঙ) 'দ্যতাঁত-এর অর্থ কী?

চ) রাশিয়ার কোন নেতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ডাক দেন?

ছ) নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা কে ঘোষণা করেন?

জ) 'পেরেস্ত্রোকা' (Perestroika') শব্দের অর্থ কী?

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

i) পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত সামরিক জোটটির নাম ছিল - - - -।

ii) পূর্ব ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত সামরিক জোটটির নাম ছিল - - - -।

iii) মানব অধিকারের উপর গুরুত্ব দেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি - - - -।

iv) গ্লাসনোস্ত (Glasnost) নীতির প্রবক্তা ছিলেন - - - -।

v) - - - - সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙন ধরে।

৩। সংক্ষেপে উত্তর করুন ঃ

ক) ঠাণ্ডা লড়াই-এর কারণ কি কি ছিল?

খ) ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

গ) নিকসনের সময়ে মার্কিন বিদেশ নীতিতে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়।

ঘ) ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিটি ব্যাখ্যা করুন।

ঙ) রাষ্ট্রপতি রেগনের বিদেশ নীতি আলোচনা করুন।

চ) ব্রেজনেভের বিদেশনীতি আলোচনা করুন।

৪। বিস্তৃত ভাবে উত্তর করুন ঃ

ক) ঠাণ্ডা লড়াই-এর উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করুন।

খ) দ্যতাঁত-এর যুগে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক আলোচনা করুন।

গ) গোর্বাচেভের বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করুন।

৩.৮ উত্তর সংকেত

১। ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগতও ক্ষমতার লড়াইকে ঠাণ্ডা লড়াই বলে।

খ) পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণ রোধ করার মার্কিন নীতিকে 'Containment' বলে।

গ) ট্রুম্যান নীতির উদ্দেশ্য ছিল গ্রীস, তুরস্ক ও অন্যান্য স্থানে কমিউনিস্ট-বিরোধী সংগ্রামকে অর্থ ও সামরিক সাহায্য দেওয়া।

ঘ) মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

ঙ) 'দ্যতাঁত' এর অর্থ হোল উত্তেজনা প্রশমন ও বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

চ) ক্রুশ্চেভ

ছ) প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন।

জ) পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস।

২। i) উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO)।

ii) ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact)।

iii) জিমি কার্টার

iv) সোভিয়েত নেতা মিখাইল গোর্বাচেভ।

v) ১৯৯১।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Roy C. Macridis (ed.) : Foreign Policy in World Politics (1979)

২। Peter Calvocoressi : World Politics since 1945 (latest edition)

৩। Joseph Frankel : International Relations in a changing World (latest edition)

৪। F.S. Northedge (ed) The Foreign Policies of the Powers (1968)

একক ৪ ◻ ভারতের প্রতিবেশীদের বিদেশ নীতি [চীন ও পাকিস্তান]

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ চীনের পররাষ্ট্র নীতির বিবর্তন

৪.৩ চীনের বিদেশ নীতির মূল সূত্র

৪.৩.১ চীনের সোভিয়েত নীতি

৪.৩.২ চীনের মার্কিন নীতি

৪.৩.৩ চীন-ভারত সম্পর্ক

৪.৩.৪ মাও-উত্তর চীনের (Post-Mao China) পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

৪.৪ পাকিস্তানের বিদেশ নীতি

৪.৪.১ পাক বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য

৪.৪.২ পাকিস্তানের ভারত নীতি

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ উত্তর সংকেত

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ও ভারতের প্রতিবেশী চীনের পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি ও বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হবেন।
- ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারবেন।

- ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- এশিয়া ও বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা করতে পারবেন।

৪.১ প্রস্তাবনা

গণসাধারণতন্ত্রী চীন (People's Republic of China বা P.R.C.) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ। অনেকের মতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর বর্তমান দুনিয়ায় ক্ষমতা ও প্রভাবের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের অবস্থান। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের অন্যতম হল চীন। ১৯৬৪ সালে চীন পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে।

পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট শক্তি। ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ও ভারতের সম্পর্ক তিক্ত এবং বিদ্বেষপূর্ণ। পাকিস্তান চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতবিরোধী জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এই এককে চীন ও পাকিস্তানের বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২ চীনের পররাষ্ট্র নীতির বিবর্তন

চীন একটি অতি প্রাচীন সভ্যতা হলেও আধুনিক বিশ্ব রাজনীতিতে ১৯৪৯ সালেই চীন একটি ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর ১৯১২ সালে চীনা প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল কিন্তু একটি শক্তিশালী সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র রূপে চীন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চিয়াং-কাই শেক পরিচালিত কুয়োমিন-টাং সরকারকে বিতাড়িত করে চেয়ারম্যান মাও-জে-ডঙ পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় হয়। সমাজতান্ত্রিক চীন মাও-এর নেতৃত্বে একটি বলিষ্ঠ রাষ্ট্র রূপে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের জায়গা করে নেয়। এর আগে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। Allen S. Whiting এর ভাষায়, "In sum, China was the object of international relations but seldom the agent. Acted on by others, she was unable to act in her own right."

প্রথম দিকে সমাজতান্ত্রিক চীন পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতি কঠোর মনোভাব অনুসরণ করেছিল। এই পর্যায়ে চীনের বৈদিশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন (২) হং কং, ম্যাকাও তাইওয়ান প্রভৃতি হৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার, (৩) পুঁজিবাদী দেশগুলির বিরোধিতা করা এবং (৪) বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জোরদার করা। এই পর্যায়ের বিদেশ নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও জে-ডঙ্ তাঁর 'On the People's Democratic Dictatorship' শীর্ষক রচনায় বলেন ঃ "to unite in a common struggle with those nations of the

world who treat us on a basis of equality, and peoples of all countries. This is to ally with Soviet Union, to ally with the new democratic countries of Europe and to ally with the proletariat of mass of the people in all countries."

চীনের পররাষ্ট্র নীতিকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায়ে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ — বিরোধী জোটের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা উভয়েই মার্কিন-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল চীন-সোভিয়েত মতবিরোধের (Sino-Soviet rift) যুগ যদিও এ সময় চীন তার মার্কিন-বিরোধী নীতি বজায় রাখে। তৃতীয় পর্যায়ে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'Social imperialist' আখ্যা দেয় এবং প্রধান শত্রু বলে বিবেচনা করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য চেষ্টা করে। চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় ১৯৭৬ সালে মাও-এর মৃত্যুর পর। মাও-পরবর্তী (Post-Mao period) যুগে চীন বাস্তববাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই পর্যায়ে চীনের বিদেশ নীতিতে মতাদর্শগত কঠোরতা হ্রাস পায়। আধুনিক চীনের রূপকার ডেঙ্ ডিয়োও-পিঙ্ সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ (Socialist modernization) ও মুক্তদ্বার নীতি (Open door policy) অনুসরণ করেন। নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে চীন রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের সাথেই সম্পর্ক উন্নত করতে প্রয়াসী হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মাও-উত্তর যুগে চীন বাস্তববাদী (Pragmatic) বিদেশ নীতি অনুসরণ করে আসছে।

৪.৩ চীনের বিদেশ নীতির মূল সূত্র

১৯৮২ সালের সংবিধানের মূল অংশে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কোন বক্তব্য না থাকলেও সংবিধানের প্রস্তাবনায় চীনের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি সংযোজিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চীন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে। এই পাঁচটি নীতি হল ঃ সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা সম্পর্কে পারস্পরিক সম্মানবোধ, পারস্পরিক অনাক্রমণ, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা এবং পারস্পরিক সুবিধা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চীন পঞ্চশীলের নীতির প্রতি আস্থা ঘোষণা করলেও প্রয়োজনমত নিজের স্বার্থে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫০ এর দশকে চীন কর্তৃক তিব্বত দখল বা ১৯৬০এর দশকের প্রথম দিকে ভারত আক্রমণের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে মাও-পরবর্তী যুগে চীন নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে অন্যদেশের সাথে সম্পর্কের উত্তেজনা হ্রাস করার নীতি অবলম্বন করেছে।

প্রস্তাবনায় আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে গণসাধারণতন্ত্রী চীন নিরন্তর সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ

এবং উপনিবেশিকতার বিরোধিতা করে। আরও বলা হয়েছে, অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে সংহতি স্থাপন, নিষ্পেষিত এবং উন্নয়নশীল দেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ এবং মানবপ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়াসী হওয়া চীনের পররাষ্ট্র নীতির স্তম্ভ বিশেষ।

৪.৩.১ চীনের সোভিয়েত নীতি

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক চীনের গঠনের পর চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই মাও-জে-ডঙ্ তাঁর বিখ্যাত 'একদিকে ঝোঁকা'র ("lean to one side") নীতি ঘোষণা করেন। মাও বলেন ঃ "you lean to one side. Precisely so . . . Chinese people either lean to the side of imperialism or to the side of socialism. To sit on the fence is impossible; a third road does not exist . . . . Internationally we belong to the anti-imperialist front headed by the U.S.S.R. and we can look for genuine friendly aid only from that front, and not from the imperialist front." ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত-মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধে চীন মস্কোর পক্ষ সমর্থন করে। কোরিয়ায় যুদ্ধের সময় চীন-সোভিয়েত বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নি। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্ট্যালিন-বিরোধী 'de-Stalinization' প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে উভয় দেশের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। Peter Calvocoressi বলেছেন ঃ "The deterioration in Sino-Russian relations set in about 1956. . ." স্ট্যালিন-পরবর্তী যুগে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর ক্রুশ্চেভের একচ্ছত্র আধিপত্য মাও মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দমনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য প্রেরণ করলে চীন তার সমালোচনা করে। চীন-সোভিয়েত বিরোধ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানা কারণ দেখিয়েছেন।

(১) দুটি দেশের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ছিল। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করে ক্রুশ্চেভ পুঁজিবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (Peaceful Co-existence) ডাক দেন ও সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেন। অন্যদিকে চীন পুঁজিবাদের সঙ্গে যুদ্ধের অনিবার্যতায় (inevitability of war) বিশ্বাস করত।

(২) বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রশ্নে মাও ও ক্রুশ্চেভের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিল।

(৩) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্যদান ও সমাজতন্ত্রের উত্তরণ প্রসঙ্গেও উভয় দেশের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল।

(৪) সোভিয়েত-সমর্থন পুষ্ট ভিয়েতনাম ক্যাম্পুচিয়ায় (ক্যাম্বোডিয়া) সৈন্য প্রেরণ করলে চীন অসন্তুষ্ট হয়।

(৫) চীন ও রাশিয়ায় সীমানা-সম্পর্কিত বিরোধ উভয় দেশের সম্পর্ক অবনতির আর একটি প্রধান কারণ। ১৯৬৪ সালে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটে।

১৯৭০-এর দশকে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে প্রয়াসী হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'Social imperialist' আখ্যা দেয়। ১৯৭৬ সালে মাও-এর মৃত্যুর পর চীনে সংস্কারপন্থী নেতা ডেঙ-এর উত্থান হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নেও সংস্কারপন্থী নেতা মিখাইল গোর্বাচেভ নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক ১৯৯০-এর দশকে উন্নত হয়।

৪.৩.২ চীনের মার্কিন নীতি

আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পরই চীন পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য কমিউনিস্ট চীন দীর্ঘদিন রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারে নি। মার্কিন সমর্থনপুষ্ট তাইওয়ান চীনের আসনটি দখল করে রাখে। ১৯৫০ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধের সময় চীন-মার্কিন সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের আমলে চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হয়। নিকসন অনুভব করেন যে চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হলে রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে আমেরিকার দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। চীন-মার্কিন সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করে।

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময় চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মাও-এর মৃত্যুর পর চীনা নেতারা আধুনিকীকরণের নীতি ও ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করে। তবে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাইওয়ান নীতিতে সন্তুষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Two-China Policy চীনা নেতাদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট বুশের সময় চীনের অভ্যন্তরে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীন-মার্কিন সম্পর্কের সাময়িক ভাবে অবনতি ঘটে। পরে উভয়পক্ষই বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। Calvocoressi বলেছেন যে আধুনিকীকরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য চীন পাশ্চাত্যের কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য লাভের তাগিদে মুক্তদ্বার নীতি অবলম্বন করেছে।

৪.৩.৩ চীন-ভারত সম্পর্ক

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক চীনের জন্মের পর ভারতই ছিল অন্যতম প্রথম রাষ্ট্র যে চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

নেহরু পঞ্চশীলের নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের দলাই লামা তাঁর সমর্থকগণ সহ ভারতে আশ্রয় নিলে চীন অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৬২ সালে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় ও ভারতের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে। ১৯৭৭ সালে ভারতের জনতা সরকার চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮০-এর দশকে উভয় দেশের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হয়। সীমান্ত সমস্যার সমাধান না হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ্ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর উপস্থিতিতে বেজিং-এ উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল কথা ছিল, জমিতে যার যেখানে অবস্থান তাঁর ভিত্তিতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করে এবং সৈন্য সমাবেশ কমিয়ে দিয়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করা এবং সীমান্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা অব্যাহত রাখা। Manoranjan Mohanty বলেছেন, "In contrast to its attitude during the 1970s, when countering Indian influence was its main objective, China pursued a policy of normalizing relations with India during the 1980s." ১৯৯০-এর দশকেও চীনের এই নমনীয় নীতি বজায় থাকে।

৪.৩.৪ মাও-উত্তর চীনের (Post-Mao China) পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য

১৯৭৬ সাল ছিল চীনের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণ। ঐ বছর জানুয়ারিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে সমাজতান্ত্রিক চীনের রূপকার মাও-জে-ডঙ্-এর মৃত্যু হয়। চীনে ক্ষমতায় আসেন একজন বাস্তববাদী সংস্কারপন্থী নেতা ডেঙ্-জিয়োও-পিঙ। ডেঙ্ 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ' ও "Socialist market economy" গড়ে তোলার উপর জোর দেন। মতাদর্শগত গোঁড়ামি বর্জন করে ডেঙ্ চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডেঙ্ 'Four Modernizations' কার্যক্রম ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ঃ

কৃষির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ;

শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ;

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, এবং

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ।

এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিদেশী কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পুঁজি প্রয়োজন ছিল। চীন তাই মুক্তদ্বার-নীতি (Open door Policy) গ্রহণ করে। বিশেষজ্ঞগণ চীনের এই পর্যায়ের বিদেশ নীতিকে "Pragmatic, flexible foreign policy" আখ্যা দিয়েছেন। Manoranjan

Mohanty বলেছেন যে, সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য ও দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মাও-উত্তর যুগে চীন সেইরূপ বিদেশ নীতি অনুসরণ করছে যা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে ও উন্নতির পথকে প্রশস্ত করবে। ("In order to continue the policies of reforms and persist in maintaining relative stability within the country, the Chinese leadership pursued its foreign policy geared toward peace and development").

সাম্প্রতিককালে চীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রসংঘে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিবেশ দূষণ, নিরস্ত্রীকরণ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস ইত্যাদি প্রশ্নে চীন আগের তুলনায় অনেক বেশি সরব। ১৯৯৭ সালে চীন হংকং এবং ১৯৯৯ সালে ম্যাকাও ফিরে পায়। তাইওয়ান অবশ্য এখনও চীনের দুশ্চিন্তার কারণ। সাম্প্রতিক কালে চীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই এর অবসান বা উপসাগরীয় যুদ্ধের ঘটনা চীনের বৈদেশিক নীতির মূল কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন করে নি। ডেঙ-এর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রশিষ্য ডিয়োং জেমিন সংস্কার প্রক্রিয়া বজায় রেখেছেন।

৪.৪ পাকিস্তানের বিদেশ নীতি

পাকিস্তানের সৃষ্টি ও বৈদেশিক নীতির বিবর্তন ঃ- ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two-nation Theory) ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সময় পাকিস্তানের কর্ণধার ছিলেন মুসলীম লীগ নেতা ও পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৪৮ সালে জিন্নার মৃত্যু ও ১৯৫১ সালে পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানের হত্যার পর থেকেই ঐ দেশ রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়, ".... after their departure Pakistan fell into the hands of pygmies who have been devoid of statemanship." দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান Crisis of identity বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে থাকে। রক্ষণশীল ও মৌলবাদী শক্তিগুলি পাকিস্তানী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। উগ্র ইসলামিক নেতারা ভারতকে শত্রুদেশ ছাড়া আর কোন ভাবে ভারতে পারে নি। তাই ভারতবিরোধী মনোভাবই পাকিস্তানী বিদেশ নীতির মূল কথা এবং এই ভারত-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানী বিদেশ নীতি আবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সে দেশের নেতারা তাই ইসলাম ও ভারত বিদ্বেষ এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে।

'সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ঃ পাকিস্তানের রাজনীতিতে ও বিদেশনীতি রচনার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী বার বার ক্ষমতা দখল করেছে। এ পর্যন্ত চার বার দেশটি সামরিক শাসনের কবলে পড়েছে। প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে ১৯৫৮ সালে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ঐ বছর

জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন (Martial Law) জারী করেন। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হলে ব্যাপক গণঅসন্তোষের মুখে আয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্থলাভিত্তিক হন জেনারেল ইয়া ইয়া খান। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে জুলফিকর আলি ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ও পাকিস্তানে সাময়িকভাবে সীমিত গণতন্ত্র ফিরে আসে। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম ও ভারতের হাতে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়। পুনরায় জেনারেল জিয়া-উল-হকের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে ও ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল জিয়া-উল-হকের মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরিফ ক্ষমতাসীন হন। কিন্তু এবারেও গণতন্ত্র স্থায়ী হয় নি। ১৯৯৯ সালের ১২ই অক্টোবর জেনারেল পারভেজ মুশারফ-এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে।

৪.৪.১ পাক বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য

পাকিস্তানী বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় নিরাপত্তার সুরক্ষা ও ভারতের সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে তোলা। জনসংখ্যা, আয়তন, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি সব দিক থেকেই ভারত পাকিস্তান থেকে বড় হওয়ায় পাকিস্তান এক ধরনের ভারত-আতঙ্ক বা ভারত-ভীতি থেকে ভোগে। ভারতের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী মনোভাব তার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িত। ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করে পাকিস্তান তার জাতীয় সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করে। ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্য লাভ করাই হল পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিকে পাকিস্তানী সরকার ভারত-বিরোধী প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে।

৪.৪.২ পাকিস্তানের ভারত নীতি

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল ও সংকটজনক হয়। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির পশ্চাতে ভৌগোলিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণ নিহিত আছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দুটি দেশের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয় যেমন সিন্ধু নদের জলবণ্টন, কচ্ছের রান ও অন্যান্য অঞ্চলে সীমান্ত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা, পাকিস্তান ও ভারতে সংখ্যালঘুদের সমস্যা ও সর্বোপরি কাশ্মীর সমস্যা।

স্বাধীনতার পর সিন্ধু এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত অন্যান্য কয়েকটি নদীর জলবণ্টন নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভারত ভাকরানাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ করলে পাকিস্তানে দারুণ উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। পাকিস্তান আশঙ্কা করে যে পশ্চিম পাঞ্জাবে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ সালে

ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের জল বণ্টন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ও জলসংক্রান্ত বিরোধ অনেকটা মিটে যায়।

তবে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের প্রধান কারণ হ'ল কাশ্মীর। স্বাধীনতার সময় কাশ্মীর ছিল একটি দেশীয় রাজ্য যার শাসক ছিলেন ডোগরা রাজপুত বংশীয় মহারাজা হরি সিং। তাঁর অধিকাংশ প্রজারা ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মহারাজা হরি সিং দেশবিভাগের সময় ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ না দিয়ে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পথ বেছে নেন। এদিকে পাকিস্তান বলপূর্বক কাশ্মীরকে সেদেশে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। পাক প্ররোচনায় হানাদাররা এবং পাক সৈন্যরা ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রবেশ করে। উপায়ন্তর না দেখে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দেন এবং ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানী বাহিনীকে বাধা দেয়। রাষ্ট্র সংঘের চেষ্টায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। পাকিস্তান কাশ্মীরের যে অংশটি দখল করে সেটিকে 'আজাদ কাশ্মীর' ঘোষণা করে। বৃহত্তর অংশটি ভারতের অধীনে থাকে। পাকিস্তান দাবি করে যেহেতু কাশ্মীর মুসলিম-প্রধান অঞ্চল সেহেতু দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুযায়ী কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হওয়া উচিত। ভারত এই যুক্তি মেনে নেয় নি। ভারত দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করে না; ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শে বিশ্বাসী।

এই ভাবে বিগত পাঁচ দশক ধরে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য চলে আসছে। কাশ্মীর বিবাদ পাক-ভারত সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলেছে ও ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সমগ্র কাশ্মীর দখল করবার জন্য যুদ্ধবিরতি সীমারেখা (Line of Control) অতিক্রম করে বহু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীকে কাশ্মীরে প্রেরণ করে। এটি ছিল দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে এই যুদ্ধের সাময়িক নিষ্পত্তি ঘটে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ও কাশ্মীর সীমান্তে একযোগে পাক-ভারত যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থির করা হয় যে কোন তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভারত ও পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে নেবে।

ভারতের মতো পাকিস্তানও দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন SAARC-এর সদস্য। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস এত বেশি যে সম্পর্ক উন্নতির আশা ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে পারমাণবিক বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ১৯৯৮ সালের মে ১১ ও ১৩ই পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান ঐ সালেরই ২৮ ও ৩০-এ ছয়টি বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর ১৯৯৯ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বাসে করে লাহোর যাত্রা করলে উভয় দেশের সম্পর্ক সাময়িক ভাবে

উন্নত হয়। লাহোর ঘোষণায় সমস্ত বিষয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রতিজ্ঞা করা হয়। কিন্তু এই ঘোষণার পরেও পাক-ভারত সম্পর্কের কোন স্থায়ী উন্নতি হয় নি। পাকিস্তান তার ভারত-বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখে। কারগিল সেক্টরে পাক প্ররোচনায় উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি স্থাপন করলে মে-জুলাই ১৯৯৯ সালে উভয় দেশের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। যুদ্ধ বিরতি ঘটলেও সম্পর্ক উন্নত হবার আশা দুরূহ কারণ পাকিস্তান কাশ্মীর উগ্রপন্থীদের আজও সাহায্য করে যাচ্ছে।

৪.৫ সারাংশ

চীন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ। ১৯৪৯-এ চীনে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম দিকে চীন পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতি কঠোর মনোভাব ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু পরে তা পরিবর্তিত হয়।

চীনের পররাষ্ট্র নীতির চারটি পর্যায় আছে —

(১) চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী জোটের অন্তর্ভুক্ত এবং মার্কিন নীতির বিরোধী।

(২) চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। তবে চীনের মার্কিন বিরোধী নীতি বজায় থাকে।

(৩) চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধ ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ প্রচেষ্টা চলে।

(৪) চীনে বাস্তববাদী নীতি অনুসৃত হয় — মতাদর্শগত কঠোরতা হ্রাস পায়, সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ ও মুক্ত-দ্বার নীতি গৃহীত হয়।

চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রথমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও ১৯৫৬ সাল থেকেই উভয়ের মনোমালিন্য বাড়তে থাকে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। উভয়ের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষও ঘটে। তাছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের পুঁজিবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি চীনের পছন্দ ছিল না।

১৯৭৬ এ সংস্কারপন্থী নেতা ডেঙ্-এর উত্থানের পর চীন সোভিয়েত সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়। প্রথমদিকে সমাজতান্ত্রিক চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি না দেওয়ায় মার্কিন-চীন সম্পর্ক ভাল ছিল না। ১৯৭০ সালের পর উভয়ের সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। আগে আপত্তি জানালেও এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করে। ডেঙ-এর আধুনিকীকরণ নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

চীনকে ভারতই প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। চীন ও ভারত মিলিতভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৫৯ সাল থেকে উভয়ের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে সীমান্ত সমস্যা থেকে উভয়ের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ এর ভারত-পাক যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ১৯৮০ সালের পর থেকে উভয়ের সম্পর্ক কিছুটা উন্নততর হয়। ১৯৯৩ তে

উভয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়।

মাও-উত্তর চীনে আধুনিকীকরণ ও মুক্তদ্বার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে চীনের সঙ্গে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কও অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের পর চীনই সমাজতান্ত্রিক জগতের প্রতিনিধি হিসাবে এখনও টিকে আছে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের দ্বারা ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক বাহিনীর বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা এবং ভারতের সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে তোলা পাকিস্তানের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পাকিস্তান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। প্রথম থেকেই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বিদ্বেষপূর্ণ। সিন্ধু নদের জলবণ্টন, সীমান্ত সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও সংখ্যালঘু সমস্যা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কারণ। বিরোধে মূল কেন্দ্র হল কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে উভয়ের বিরোধ উপমহাদেশে মাঝে মাঝেই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৫ সালে উভয়ের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামও হয়েছে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ও কাশ্মীর সীমান্তে সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধের পর উভয় দেশের মধ্যে সিমলাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সাম্প্রতিককালে পরমাণবিক বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর বাসে লাহোর যাত্রা সাময়িক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করলেও উত্তেজনা কমে নি। কারগিল সেক্টরে উভয়ের তীব্র লড়াই হয়। পরে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও শান্তির আবহাওয়া গড়ে ওঠে নি।

৪.৬ অনুশীলনী

১। ক) গণসাধারণতন্ত্রী চীন কখন গঠিত হয়?

খ) সমাজতান্ত্রিক চীনের রূপকার কে ছিলেন?

গ) 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের' নীতিকে কে প্রবর্তন করেন?

ঘ) সিমলা চুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়?

ঙ) স্বাধীনতার পূর্বে কাশ্মীর কোন রাজার অধীনে ছিল?

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) মাও-এর মৃত্যু হয় - - - - - - - - খ্রীষ্টাব্দে।

খ) পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষর করেন নেহেরু ও - - - - - - - -।

গ) চীন হংকং ফিরে পায় - - - - - - - - খ্রীস্টাব্দে।

ঘ) পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন - - - - - - -।

ঙ) - - - - - - - তারিখে পাকিস্তান পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

৩। সংক্ষেপে উত্তর করুন ঃ

ক) চীনা বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য কী কী?

খ) মাও-উত্তর চীনের বৈদেশিক নীতিতে কী কী পরিবর্তন দেখা যায়?

গ) পাকিস্তানী রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা কী?

ঘ) পাকিস্তানী বিদেশ নীতির মূল উদ্দেশ্য কী?

ঙ) ভারত-পাকিস্তান বিরোধের কারণ কী কী?

৪। বিস্তৃতভাবে উত্তর করুন ঃ

ক) চীনের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

খ) চীনের মার্কিন নীতি ব্যাখ্যা করুন।

গ) মাও-উত্তর চীনের বিদেশনীতি আলোচনা করুন।

ঘ) পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৪.৭ উত্তর সংকেত

১। ক) ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর।

খ) মাও-জে-ডঙ্।

গ) ডেঙ্-জিয়াও-পিঙ্।

ঘ) ১৯৭২ সালে।

ঙ) মহারাজা হরি সিং।

২। ক) ১৯৭৬

খ) চৌ-এন-লাই

গ) ১৯৯৭

ঘ) মহম্মদ আলি জিন্না।

ঙ) মে ২৮ ও ৩০, ১৯৯৮ খ্রীস্টাব্দ।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Roy C. Macridis (ed). *Foreign Policy in World Politics (1979)*

২। Peter Calvocoressi : *World Politics since 1945 (latest edition)*

৩। F.S. Northedge (ed.) *The Foreign Policies of the Powers (1968).*

একক ১ □ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঃ উদ্ভব, উদ্দেশ্য ও নীতি

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.১.২ রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্ভব

১.১.৩ রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য

১.১.৪ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি

১.১.৫ মূল্যায়ন

১.১.৬ উপসংহার

১.৭ সারাংশ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের যেসব দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি হল—

- কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত উদ্দেশ্য কি কি?
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের কি কি মূল নীতি আছে?
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ পর্যন্ত তার নীতি অনুযায়ী চলেছে কী না?
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজকর্মের একটি সাধারণ মূল্যায়ন।

১.১ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-18) পর যেমন জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) গঠিত হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (1939-45) পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Naitons) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের সময় বেশ কিছু সাবধানতা নেওয়া হয় যাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখার কাজে ব্যর্থ না হয়। জাতিসঙ্ঘ গঠনের সময়ে প্রথম থেকেই কতকগুলি সাংগঠনিক ও আইন বিষয়ক দুর্বলতা ছিল যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের সময় দূর করার চেষ্টা করা হয়। যুদ্ধহীন বিশ্বসমাজ গঠনের স্বপ্ন মানুষের অনেকদিনের কিন্তু সব যুগেই কতগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে এই স্বপ্ন সার্থক করা সম্ভব হয়নি। সেই বিচারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার নিজস্ব দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গত অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে তার অগ্রগতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। সে কারণে বিরাট কোন ধ্বংসলীলার হাত থেকে মানবজাতি

রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গত ৫৫ বছর ধরে অবিরাম কাজ করে চলেছে। এই কাজ করতে গিয়ে তাকে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বিগত ৫৫ বছরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যেসব নীতি ও উদ্দেশ্যগুলি আছে তা বাস্তবে সম্পূর্ণ কার্যকর হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সর্বাঙ্গসুন্দর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্তমান যুগে এমন একটি সংস্থা যার সাহায্য ধনী-দরিদ্র এবং ক্ষমতাশালী-ক্ষমতাহীন সকল রাষ্ট্রই গ্রহণ করে কম-বেশি উপকৃত হচ্ছে।

১.১.২ রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্ভব

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) যেমন তৈরি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ, তেমনি রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations) তৈরি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময় একটি নতুন, আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। যে সংগঠন ভবিষ্যতে মানবসমাজকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জানুয়ারি ৬, ১৯৪৬ সালে মার্কিন কংগ্রেসে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের বক্তব্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপন করে। এর ছ'মাস পরে জুন ১২, ১৯৪৬ সালে মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে একটি ঘোষণা করেন যা লন্ডন ঘোষণা (London Declaration, 1941) হিসেবে পরিচিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের দিকে এই লন্ডন ঘোষণাই হল প্রথম সরকারি পদক্ষেপ।

১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক যৌথ বিবৃতি পেশ করেন যা আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter, 1941) নামে পরিচিত। এই সনদে আক্রমণকারীর নিরস্ত্রীকরণ, ব্যাপক ও স্থায়ী নিরাপত্তা, ব্যক্তির ও জাতির সমানাধিকারের উপর জোর দেওয়া হয় এই সনদে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এর চার মাস পরে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়। United Nations বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কথাটি প্রথম প্রস্তাব করেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি, ছাব্বিশটি দেশের প্রতিনিধি ওয়াশিংটনে এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে আটলান্টিক সনদে উল্লেখ করা নীতি ও আদর্শকে স্বীকৃতি জানায়। এটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণাপত্র (Declaration of the United Nations, 1942) নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে আটলান্টিক সনদে উল্লেখ করা সমস্ত উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি স্বীকৃতি জানানো হবে। অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার কথা ঘোষণায় স্থান পায়। এই ঘোষণায় স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবিক অধিকারের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অক্ষশক্তিকে পুরোপুরি পরাস্ত করার আহ্বান জানানো হয়। অন্যান্য রাষ্ট্র যারা অক্ষশক্তিকে পরাজিত করতে সাহায্য করবে, তাদের এই ঘোষণায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

জানুয়ারি ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে (Casablanca Conference, 1943) একটি নতুন সংগঠন গড়ার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চার্চিল ও রুজভেল্ট—তাদের দেশ ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। ঐ সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া

হয়। এই প্রসঙ্গে যে ঘোষণায় স্বাক্ষর করা হয় তা মস্কো ঘোষণাপত্র (Moscow Declaration, 1943) নামে পরিচিত। পরে চীন এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংগঠন ছোট-বড় সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সদস্যপদের ভিত্তিতেই গঠন করা হবে।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে ইরানের রাজধানী তেহেরানে মিলিত হন স্তালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট। তাঁরা এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন যা তেহেরান ঘোষণাপত্র (Teheran Declaration, 1943) নামে পরিচিত। এক যৌথ বিবৃতিতে এই রাষ্ট্রপ্রধানেরা একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদানের জন্য বিশ্বের সকল দেশের কাছে আবেদন করেন। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফল হবেন।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ডাম্বারটন ওক্‌সে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন ও চীনের প্রতিনিধিগণ (Dumberton Oaks Conference, 1944)। সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার নাম দেওয়া হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations)। প্রস্তাবে সংগঠনের চারটি বিভাগ গঠনের কথা বলা হয়। এগুলি হচ্ছে সাধারণ সভা (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং সচিবালয় (Secretariate) এবং একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)। সাধারণ সভা গঠন করা হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যকে নিয়ে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১১ জন যার মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী ও ছ'জন অস্থায়ী সদস্য হবেন। অস্থায়ী সদস্যরা সাধারণ সভার দ্বারা দু বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগ করতে পারবে। বিশ্বশান্তি বজায় রাখা ও যুদ্ধ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য, পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও অধীনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির শান্তিরক্ষা বাহিনী রাখার প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় ইয়ালটা সম্মেলন (Yalta Conference, 1945) ডাম্বারটন ওক্‌সে যে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত ছিল, সেগুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা হয়। ঠিক হয় যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যর হাতে ভেটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে। এই সম্মেলনে ফ্রান্স এবং চীনকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ডাম্বারটন ও ওক্‌সের ও ইয়ালটার প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনেই ঠিক হয় যে ২৫শে এপ্রিল তারিখে সানফ্রান্সিসকো শহরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সভা আহ্বান করা হবে।

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ৫০টি রাষ্ট্রের প্রায় ৮৫০ জন প্রতিনিধি সানফ্রান্সিসকো শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন (Sanfransisco Conference, 1945) বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন হচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করার ব্যাপারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাহায্য করবার জন্য ছিলেন পরামর্শদাতারা, আইনের লোকেরা এবং অনুবাদকেরা। দীর্ঘ দু মাস ধরে বিচার বিবেচনা চলে। এখানে ডাম্বারটন ওক্‌সে ও ইয়ালটা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। মতভেদের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো দানের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অবশ্য সম্মেলনে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংগঠনগুলি (Regional Security Organisations) রাষ্ট্রসঙ্ঘের গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করবে এই শর্তে

আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংগঠনের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। আরেকটি বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে অছি পরিষদ। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, লীগ শাসিত ম্যান্ডেট অঞ্চলগুলিতে, অক্ষশক্তির নিকট থেকে অধিকৃত স্থান ও অনগ্রসর অঞ্চলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে। এই সম্মেলনে মোট দশটি পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মতৈক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ (Charter) এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্ট্যাটিউট (Statute) প্রণীত হয়। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ২৬শে জুন ১৯৪৫ সালে প্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে ৫১টি দেশ সাক্ষর করে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ গৃহীত ও কার্যকর হয়। এইভাবে চার বছরের বিতর্ক ও পরিকল্পনার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। জন্মলাভ করল জাতিসঙ্ঘের পর দ্বিতীয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যার উদ্দেশ্য হল বিশ্বে শান্তি ও প্রগতিকে সুনিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীর জনগণের জীবনে দুটি বিশ্বযুদ্ধ যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এনেছে তা থেকে ভবিষ্যতে মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দৃঢ়সঙ্কল্প। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানুষের মৌলিক অধিকারে, মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধে, নারী ও পুরুষের সমানাধিকারে এবং ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের সমান সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে চায় যেখানে ন্যায়বিচার রক্ষা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তি ও আইনের অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা সসম্মানে পালন করা হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের লক্ষ্য হল বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অগ্রগতি ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

> [We the people of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained and to promote social progress and better standards of life in larger freedom.]

১.১.৩ রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও সর্বতোমুখী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে সব সদস্য রাষ্ট্র আছে তাদের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সমস্যার সমাধান করা, এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বে অশান্তির কারণগুলি দূর করে শান্তি স্থাপন করা এর আরেকটি লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির যাতে একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের প্রথম ধারার চারটি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সনদের ১(৬) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করবে ও সেই উদ্দেশ্যে আক্রমণের ঘটনা ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা প্রতিরোধের জন্য যথাযথ যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। [To maintain international peace and security, and to that end, to take collective measures for the prevention and

removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international dispute or situations which might lead to a breach of the peace. Act. 1(1) রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে যৌথ পদ্ধতিতে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এই ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারকে অনুসরণ করা হবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে যে সব বাধা আছে তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তি বিঘ্ন করা বা আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

সনদের ১(২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতিবিধান করবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। [To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace. Act. 1(2)] সনদের ১(২) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেবল সকল জাতির সমান অধিকার এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ করবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দরকার এবং এই ধারায় আরো বলা হযেছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জাতিসমূহের সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর জোর দিয়েছে।

সনদের ১(৩) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য ও জাতি, ধর্ম, ভাষা ও নরনারী নির্বিশেষে সকলের সম মানব অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে উৎসাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তুলবে। [To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion. Act.1(3)] বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে এর ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যা আছে, তার সুষ্ঠু মীমাংসা করা যাবে। এই ধারায় আরো বলা হয়েছে যে সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে উন্নত ও উৎসাহিত করতে হবে।

সনদের ১(৪) ধারা অনুসারে ঐ সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সমন্বয় ক্ষেত্ররূপে কাজ করবে। [To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Act. 1(4)] রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে যে সব উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেন্দ্রস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এই সমন্বয় সাধন সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষত বৃহৎ শক্তিবর্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক একান্তভাবে জরুরী।

সনদের ৫৫ এবং ৭৩ ধারাতেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। সনদের ৫৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ

উন্নত জীবনযাত্রার মান, পূর্ণ নিয়োগ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এই ধারায় আরো বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রসারণ ও শিক্ষাগত সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জাতি, ধর্ম, ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব অধিকারের প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

সনদের ৭৩ ধারায় পরাধীন অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনায় দায়িত্ব যে সব রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে তাদের কর্তব্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে যেসব রাষ্ট্র পরাধীন জনগণের শাসনের দায়িত্ব পাবে তারা ঐ অঞ্চলের জনগণের স্বার্থকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেবে ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সেই সমস্ত অধিবাসীদের উন্নতির ব্যাপারে উদ্যোগী হবে।

১.১.৪ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ২ ধারায় কয়েকটি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এই ধারায় ৭টি গুরুত্বপূর্ণ নীতির উল্লেখ আছে।

সনদের ২(৬) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সকল সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। [The organisation is based on the principle of the sovereign equality of all its members. Act. 2(1)] সকল সদস্য-রাষ্ট্র আইনগত বিচারে সমান এবং প্রত্যেকেরই একটি করে ভোট প্রদানের ক্ষমতা আছে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারবে সকল সদস্য-রাষ্ট্র। এই ধারা অনুসারে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। আইনগতভাবে সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র তাদের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি স্বাধীনভাবে ঠিক করতে পারবে।

সনদের ২(২) ধারা অনুসারে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তাদের সদস্যগত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সনদে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব মেনে চলবে। [All members in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present charter. Act. 2(2)] এই ধারা অনুসারে সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রগুলিকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা কিছু সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে থাকে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রগুলির উপর কিছু দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে যা তারা মেনে চলতে বাধ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে দায়িত্ব না পালন করলে রাষ্ট্রগুলি তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। ইচ্ছে করে দায়িত্ব না পালন করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সনদের ২(৩) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে তাদের আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ণ না হয়। [All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. Act. 2(3)] শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিরও একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

সনদের ২(৪) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্যের বিরোধীভাবে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে। [All members shall regrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Act. 2(4)] এই ধারায় বলা হয়েছে যে কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এমন কোন আচরণ সদস্য দেশগুলি করতে পারবে না। এই ধারায় একইসঙ্গে যুদ্ধকে প্রতিরোধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য এই নীতি মেনে চলবে। এটি হল সনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ যুদ্ধের আইনগত নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সর্বশেষ মাইলস্টোন।

সনদের ২(৫) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সব সদস্য-রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করবে ও যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন প্রতিরোধমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাকে সাহায্যদান থেকে বিরত থাকবে। [All members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present charter and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. Act. 2(5)] এই ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা সফল করতে সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে হবে। যে দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন নিবারণমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেই দেশের সঙ্গে কোন প্রকারের সহযোগিতা করা চলবে না। এর ফলে কোন দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘে থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরোধী কোন দেশকে সাহায্য করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই নীতিটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সনদের ২(৬) ধারা অনুসারে যেসব রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় তারাও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সনদের এই নীতিগুলি অনুসরণ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার জন্য সচেষ্ট থাকবে। [The organisation shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. Act. 2(6)] যেসব দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় তারা যাতে সনদের নির্দেশ মেনে চলে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এইরূপ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে। যেসব রাষ্ট্র সদস্য নয়, তারা ইচ্ছামতন আচরণ করলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ২(৬) ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যারা সদস্য নয় সেইসব দেশগুলি এর ফলে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে সতর্ক ও সচেতন থাকবে।

সনদের ২(৭) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন সদস্যের অভ্যন্তরীণ এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হবে না। [Nothing contained in the present charter shall authorise the United Nations to inference in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to

submit such matters to settlement under the present charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII. Act. 2(7)]। সনদের অভ্যন্তরীণ এলাকার কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে সাধারণ সভা এ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ এলাকার ব্যাখ্যার সময় পুরোপুরি আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে তার রাজনৈতিক ও উদার ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এলাকা ও আন্তর্জাতিক এলাকার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা বড় কঠিন। এই ধারায় আরো বলা আছে যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কোন দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। তবে যদি কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বা ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করবে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মতে হস্তক্ষেপ কথাটির অর্থ হল কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ। কিন্তু কোন সমস্যা বিষয়ে আলোচনা, অনুসন্ধান বা সুপারিশ গ্রহণের অর্থ স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ নয়। সাধারণ সভা স্পেনের সমস্যা নিয়ে যখন আলোচনা করছিল, তখন তারা ঘোষণা করে যে কোন একটি বিষয় যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তবে তাকে অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হবে না। সাধারণ সভা দক্ষিণ রোডেশিয়া, আলজিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার সমস্যা আলোচনার সময়ে অভ্যন্তরীণ এলাকার দাবি অগ্রাহ্য করেছিল।

১.১.৫ মূল্যায়ন

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে অনেকগুলি উদ্দেশ্যর কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো, বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক সমস্যার সমাধান করা। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাজ করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অগ্রগতি আশাপ্রদ নয়। শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের দুর্বলতা অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক সদস্য-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে। উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবার একটা বড় কারণ হল বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই। নিরাপত্তা পরিষদ অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। সাধারণ সভার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বার্থের থেকে। এর ফলে উদ্দেশ্যগুলির সফল রূপায়ণ করা যায়নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেশগুলির মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে সেইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও সকলক্ষেত্রে মানা হয় না। বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের ফলে সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা যায়নি। এই সংস্থাগুলি সুপারিশ করা ছাড়া আর কোন কাজ করে না। এমনকি সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদও কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে না। এই ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো-ক্ষমতা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের প্রস্তাবনায় এবং ধারা ৬ অনুসারে যেসব উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজকর্মের অনেকাংশে মিল নেই।

অবশ্য এই উদ্দেশ্যগুলির আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি বলে এই উদ্দেশ্যগুলি যে অর্থহীন তা নয়। বিভিন্ন

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাদের জাতীয় সরকার ঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতি সব সময় সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে পারে না। সুতরাং একটি বিশাল আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষে তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করতে সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে, এটা তো স্বাভাবিক। গত পঞ্চান্ন বছরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলিকে সফলভাবে রূপায়িত করতে। বিশেষত নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। তবে এটা আশা করা উচিত নয় যে পরিষদ সব সময় সাফল্য পাবে। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা আশার আলো জাগিয়েছে। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা। ন্যায় বিচারের আদর্শকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ২ ধারায় যেসব নীতিগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু নীতিগুলির মধ্যে কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি আছে। নীতিগুলি কতখানি বাস্তবে রূপায়িত করা গেছে, সেই নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

সনদের প্রথম নীতিতে বলা আছে যে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি করে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সমতার নীতিটি প্রযুক্ত হয়নি। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা আছে। এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদে এই পাঁচ স্থায়ী সদস্যের গুরুত্ব অগ্রাধিকার পেয়েছে। কোন বিষয় আলোচনার সময় এই পাঁচটি দেশের ঐক্যমত্যের উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাফল্য বা অসাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে যেকোন একটি দেশ যদি কোন প্রস্তাবের ওপর ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহলে সেই প্রস্তাব গৃহীত হবে না। এর ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে কোন প্রয়াস ব্যর্থ হতে পারে। বলা যেতে পারে যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের সিদ্ধান্তকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার এক অপকৌশল।

সনদের দ্বিতীয় নীতিটিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হয়নি। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে না। সুয়েজ সঙ্কটের প্রাক্কালে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘকাল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করেছে।

তৃতীয় নীতিতে যে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে, তা কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় উপেক্ষিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বা তাদের কোন বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। তৃতীয় নীতিতে বিরোধের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কোন বিষয়ে মতভেদ বিরোধের পর্যায়ে পড়ে কি না তা স্থির করার কোন ব্যবস্থা নেই। আবার কোন বিরোধ আন্তর্জাতিক কি না সেই বিষয়ে সংশয় থাকে।

চতুর্থ নীতিও অনেক ক্ষেত্রে মানা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরা বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা থেকে সব সময় বিরত থাকতে পারেনি। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই একে অপরকে আক্রমণ করেছে। যেমন ১৯৯১ সালে ইরাক কুয়েতের উপর হামলা চালায়।

পঞ্চম নীতিতে বলা হয়েছে যে কোন দেশ যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে তাহলে অন্যান্য দেশগুলি তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল আপত্তির ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

বর্ণবৈষম্য নীতির অনুগামী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে গোপনে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গৃহীত কার্যক্রমকে রূপায়ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও সামরিক সাহায্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

ষষ্ঠ নীতিতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র-সদস্য নয় তারাও যেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি মেনে চলে তা দেখা দরকার। কিন্তু এই ধরনের কাজ করার নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে চীন দীর্ঘকাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরে থেকে ইচ্ছে মতন সনদের নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন বাধা দিতে পারেনি।

সনদের সপ্তম নীতিতে বলা হয়েছে যে কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু সেটা বহু ক্ষেত্রে পালন করা হয়নি। অব্যন্তরীণ বিষয় বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে।

১.১.৬ উপসংহার

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সনদে যেসব নীতি ও উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে তার মধ্যে অনেক জায়গায় অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিগত পঞ্চান্ন বছরে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের চুক্তির অস্পষ্টতা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে স্পষ্টতর হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনেক ক্ষেত্রেই তার ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর করতে পারেনি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতার জন্য। বিশেষত পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মতানৈক্য ঘটেছে। যার ফলে উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ করা যায়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ, প্রতিযোগিতা, সন্দেহ ও সংঘর্ষের জন্য বিশ্বশান্তি বিপন্ন হয়েছে বহু জায়গায়। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু তবুও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি ও উদ্দেশ্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ হল জাতিসঙ্ঘের একটি সংশোধিত সংস্করণ—কোন বিষয়ে উন্নততর এবং কোন বিষয় দুর্বলতর। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনেকাংশেই জাতিসঙ্ঘের ঐতিহ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং মতাদর্শগত আবহাওয়াতে। এইসব পরিবর্তন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বিশ্বের সমস্যার মোকাবিলা করার কার্যপদ্ধতি অনেকটা একইরকম রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রশাসনিক যন্ত্র কিভাবে কাজ করে এবং তার সাফল্যের শর্ত জানতে হলে অতীতের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসঙ্ঘের বিরাট এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকাতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মতামতের থেকে বিশ্বজনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১.৭ সারাংশ

গত পঞ্চান্ন বছরের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (UNO) নানান সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে

চলেছে। পূর্বসূরি লীগ অব্ নেশনস্-এর দুর্বলতা কাটিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও চীন ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ডাম্বারটন ওবস্ সম্মেলনে। পরে ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত ৫৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মতৈক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ (charter) গৃহীত হয়। যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ হতাশার হাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সকল মানুষের সমানাধিকারে, ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের সমান মর্যাদায় এবং মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে তার মহান উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার উন্নতমান প্রতিষ্ঠা করা, পূর্ণ কর্মনিযুক্তি এবং সামাজিক-আর্থনীতিক প্রগতির জন্য চেষ্টা করা, আর পরাধীন অঞ্চলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথাও বলা হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান নীতিগুলির মধ্যে আছে ঃ

(১) সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সমান সার্বভৌমত্ব,

(২) সদস্য-রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সনদে ঘোষিত দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব মেনে চলা,

(৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘবিরোধী কাজকর্ম থেকে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির বিরত থাকা,

(৪) সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও যাতে সনদের নীতি মেনে চলে তা নিশ্চিত করা এবং

(৫) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

অবস্থা বিশেষে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই নীতিগুলি মেনে চলতে পারেনি, কিন্তু সেজন্য বেশ কিছু সদস্য-রাষ্ট্রের অসহযোগিতাই মূলত দায়ী। বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

১.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ

১) রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন বছরে এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

২) রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যালয় কোন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাংগঠনিক মূল নীতি কোনটি?

৪) ভারত রাষ্ট্র কি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল সদস্য ছিল?

৫) রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পেছনে প্রধান দুটি ঘোষিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ

১) রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করুন।

২) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে যে প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছে তা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করুন।

৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

৪) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাংগঠনিক নীতিগুলি বর্ণনা করুন।

৫) রাষ্ট্রসঙ্ঘ সবসময় তার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছে কি না তা সম্যকভাবে আলোচনা করুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Rumki Basu, **The United Nations**, New Delhi, Sterling Publishers, 1993

২) H. Nicholas, **The United Nations as a Political Institution,** London, O.U.P., 1975

৩) শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, Calcutta, World Press, 2000

৪) অনাদিকুমার মহাপাত্র, আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা, কলকাতা সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৫

একক ২ ❑ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল অঙ্গ/বিভাগ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.১.২ সাধারণ সভা

২.১.৩ নিরাপত্তা পরিষদ

২.১.৪ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

২.১.৫ অছি পরিষদ

২.১.৬ আন্তর্জাতিক আদালত

২.১.৭ মহাসচিব ও সচিবালয়

২.৮ সারাংশ

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের যেসব দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি হল—

- রাষ্ট্রসঙ্ঘের কতগুলি মূল বিভাগ আছে
- এইসব বিভাগ কি ধরনের কাজকর্ম করে
- এই বিভাগগুলির কি ধরনের দুর্বলতা আছে
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের এইসব বিভাগের একটি সাধারণ মূল্যায়ন।

২.১ প্রস্তাবনা

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বিশ্বের বহু সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হয়,, প্রশাসন পরিচালনা করতে হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হয়। এই বিচিত্র ও বহুবিধ কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিজস্ব কয়েকটি মুখ্য অঙ্গ বা বিভাগ আছে; আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা আছে। ১৯৪৫ সালে যে সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাজ করতে শুরু করেছিল তা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। এখনও রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রশাসনিক কাঠামোর আরও সংশোধন প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থাটিকে তার উদ্দেশ্য যথাযথভাবে রূপায়িত করতে গেলে তার প্রশাসনিক কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশেষজ্ঞরা ক্রমশই

সজাগ হচ্ছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার প্রশাসনের মাধ্যমে কিছু সাফল্য লাভ করেছে এবং তার ব্যর্থতাও অনেকক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। কিন্তু একথা আজ প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে ব্যর্থতা যাই হোক রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো একটি সংস্থা ক্রমশই মানবজাতির কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিগত বৎসরগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। ভাবাবেগের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক জীবনের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই সে কাজ করতে হবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল বিভাগের সংখ্যা ছটি। এগুলি হল—

- সাধারণ সভা (The General Assembly)
- নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
- অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)
- আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice)
- সচিবালয় ও মহাসচিব (The Secretariate and the Secretary General)

২.১.২ সাধারণ সভা

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল কাজকর্ম হয় সাধারণ সভাতে (General Assembly)। সাধারণ সভার ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সভার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, তার জন্য বহু অধীনস্থ সংস্থা ও অস্থায়ী সংস্থা স্তাপন করা হয়েছে। বিগত ৫৫ বছর ধরে সাধারণ সভা রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্র, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এই সভা বিশ্ব জনমত গঠন, প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই সভার সদস্য এবং প্রত্যেকেরই একটি ভোট প্রদানের ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যকে নিয়ে গঠিত সাধারণ সভা সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয় প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার এবং তা চলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রতি বার্ষিক অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সভা নির্বাচন করে একজন নতুন সভাপতি, ২১জন উপ-সভাপতি এবং সাধারণ সভার ৭টি প্রধান কমিটির চেয়ারম্যান। সাধারণ সভার সভাপতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের থেকে নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব, নিরাপত্তা পরিষদ বা অধিকাংশ সদস্যদের অনুরোধক্রমে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত সাধারণ সভার বেশ কয়েকবার বিশেষ অধিবেশন হয়েছে। প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনের শুরুতে, সাধারণ সভা একটি সাধারণ বিতর্কের আয়োজন করে যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা বিষয়ের ওপর তাদের মতামত জানায়। সাধারণ সভার কার্য পরিচালনার জন্য তিন ধরনের কমিটি আছে—প্রধান কমিটি (Main Committee), পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি (Procedural Committee) ও স্থায়ী কমিটি (Standing Committee)। সাধারণ সভার প্রধান কমিটির সংখ্যা সাতটি। এগুলি হল—

- রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি (Political and Security Committee)
- অর্থনৈতিক ও অর্থসংক্রান্ত কমিটি (Economic and Financial Committee)
- সামাজিক, মানবিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি (Social, Humanitarian and Cultural Committee)
- অছি বিষয়ক কমিটি (Trusteeship Committee)

- প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত কমিটি (Administrative and Budgetary Committee)
- আইন বিষয়ক কমিটি (Legal Committee)
- বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি (Special Political Committee)

সাধারণ সভার কার্য পরিচালনার জন্য পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি আছে। পদ্ধতি বিষয়ক কমিটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল জেনারেল কমিটি (General Committee)। জেনরেল কমিটি সাধারণ সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের (Plenary Session) আলোচ্যসূচী প্রণয়ন করে ও অন্যান্য পদ্ধতি বিষয়ক সব কমিটির কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সাধারণ সভার একটি পরিচয় বিষয়ক কমিটিও (Credentials Committee) আছে। সাধারণ সভা তার কাজের সুবিধার জন্য অস্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে। অস্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- বর্ণ বিদ্বেষের বিরোধী কমিটি
- দক্ষিণ পসিচম আফ্রিকা সম্পর্কিত কমিটি
- ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত কমিটি
- বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটি
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্মচারী পেনশন কমিটি
- শান্তি পর্যবেক্ষক কমিশন
- আন্তর্জাতিক আইন কমিশন
- নিরস্ত্রীকরণ কমিটি
- রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরী সেনাবাহিনী সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি
- প্রশাসন ও বাজেট বিষয়ক কমিটি

সাধারণ সভার কয়েকটি বিশেষ সংস্থা আছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund—UNICEF)
- উদ্বাস্তু বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় (United Nations High Commission for Refugees, Office of the UNHCR)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয়কারীর কার্যালয় (United Nations Disaster Relief Coordinator, Office of the UNDRC)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিকাশ কর্মসূচি (United Nations Development Programme, UNDP)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাণিজ্য ও বিকাশ সম্মেলন (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ মূলধন বিকাশ তহবিল (United Nations Capital Development Fund, UNCDF)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্প বিকাশ সংস্থা (United Nations Industrial Development Organisation, UNIDO)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (United Nations Institute for Training and Research, UNITAR)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ববিদ্যালয় (United Nations University, UNU)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme, UNEP)
- রাষ্ট্রসঙ্ঘ সামাজিক বিকাশ প্রতিষ্ঠান (United Nations Institute for Social Development, UNISD)

সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলির ওপর সাধারণ সভার সিদ্ধান্তগুলির কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তগুলির পেছনে সমগ্র পৃথিবীর জনমতের সমর্থন থাকে এবং সমগ্র মানব সমাজের নৈতিক সমর্থন থাকে। সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সারা বছর ব্যাপী কাজ করতে হয়। অর্থাৎ সাধারণ সভার সংখ্যাধিক সদস্যর ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাজ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাজ করে নিরস্ত্রীকরণ, মহাকাশ, শান্তিরক্ষা, উপনিবেশের অবসান, মানবিক অধিকার, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সাধারণ সভার কমিটিগুলির মাধ্যমে। সাধারণ সভা কর্তৃক আহুত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির মাধ্যমে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয়, সেক্রেটারী জেনারেল এবং আন্তর্জাতিক কৃত্যকগুলির আধিকারিকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কার্য করে।

আলোচ্য বিষয় ঃ

প্রতি বছরের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছাড়া সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে মহাসচিবের প্রতিবেদন, সচিবালয়ের প্রতিবেদন, আর্থ সামাজিক সংসদের প্রতিবেদন এবং অছি পরিষদের প্রতিবেদন। অন্যান্য অধস্তন বিভাগের এবং বিশেষ এজেন্সির প্রতিবেদনও আলোচনা করা হয়। আগের বছরের অনালোচিত বিষয় যা থাকে তাও আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান বিভাগগুলি, মহাসচিব বা সদস্য রাষ্ট্রগুলি যদি বিশেষ কোন প্রস্তাব পেশ করে সেগুলিও সাধারণ সভায় আলোচনা করা হয়। পরিশেষে সাধারণ সভাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাজেটের আলোচনা করতে হয়।

সুতরাং সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয় খুবই বিস্তৃত। সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধত্বের সমস্যা, শান্তি রক্ষার কাজ থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, পরিবেশ, সমুদ্রগর্ভ মহাকাশ, যুদ্ধোপরাধীদের শাস্তি প্রদান, আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য সবরকম বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। অপরদিকে, দারিদ্র ও বিকাশশীল দেশগুলির প্রযুক্তিগত সমস্যা সম্পর্কেও সদস্যদের আলোচনা করতে হয়। অবশ্য সদস্যদের আসল লক্ষ্য বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ভোট পদ্ধতি ঃ

সনদের বিভিন্ন ধারায় ভোট পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের ১৮(১) ধারা অনুসারে সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের ক্ষমতা আছে। সনদের ১৮(২) ধারা অনুযায়ী যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে নতুন সদস্যপদ গ্রহণ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বাতিল, সদস্যপদ বাতিল, অছি ব্যবস্থা পরিচালনা এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়। সনদের ১৮(৩) ধারা অনুসারে অন্য বিষয় সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশেরও ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সনদের ১৯ ধারা অনুসারে কোন সদস্য রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থভাণ্ডারে অর্থ না দেয় এবং এই বকেয়া টাকার পরিমাণ যদি দুবছরের দেয় অর্থের সমান বা অধিক হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাধারণ সভায় ভোটাধিকার থাকবে না। তবে যদি সাধারণ সভা মনে করে যে অনিচ্ছাকৃত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণের জন্যই অভিযুক্ত সদস্য রাষ্ট্র তার দেয় অর্থ দিতে পারেনি, তাহলে সেই রাষ্ট্রকে সাধারণ সভা ভোটদানের অনুমতি দিতে পারে।

সাধারণ সভায় ভোটদানের ক্ষেত্রে ব্লক ভোটদান প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণ সভায় মতাদর্শ, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণের জন্য ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি হয়েছে। এই রাষ্ট্রগোষ্ঠীগুলি ভোটাভুটির সময় জোটবদ্ধভাবে ভোট প্রদান করে। সাধারণ সভা সরকারিভাবে ৭টি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। এগুলি হল

আরব রাষ্ট্রদল, আফ্রিকার রাষ্ট্রদল, এশিয়ার রাষ্ট্রদল, পূর্ব ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রদল, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রদল, ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রজোট এবং পশ্চিম ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রজোট।

সাধারণ সভার কার্যাবলী ঃ

১। আলোচনা ও সুপারিশমূলক কার্য—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে সাধারণ সভাকে সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ সভা কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে পারবে না। এ বিষয়ে সনদের ১০ ধারায় আলোচনা করা আছে। তবে সনদের ১২ ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ কোন বিবাদ নিয়ে যদি আলোচনা করে, তখন সেই ব্যাপারে সভা কোন সুপারিশ করতে পারবে না যদি না নিরাপত্তা পরিষদ ঐ বিষয় আলোচনার জন্য অনুরোধ জানায়। সনদের ১৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে সভা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক বিষয় ও জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত ৫৫ বছর সাধারণ সভা নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং মানবাধিকারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বর্ণবিদ্বেষ প্রথা বন্ধ করার জন্য, মানবাধিকার সুরক্ষিত করতে, নিরস্ত্রীকরণের সমস্যার সমাধান করার মত নানাবিধ বিষয় সাধারণ সভা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে।

২। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তামূলক কার্য—

সাধারণ সভার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তামূলক বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে। যদিও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব আছে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর। সনদের ১১(২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন সদস্য বা নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা আনীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয় কোন প্রশ্ন নিয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারে। যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পরিপন্থী কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সনদের ১৪ ধারা অনুসারে সভা কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে। ১৯৫০ সালের Uniting for Peace Resolution অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাধারণ সভা বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য সভা শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম (Peace keeping functions) গ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছে। বর্তমানে এ ব্যাপারে সাধারণ সভার গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত কার্য—

আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতিসাধন ও বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ভূমিকা আছে। আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে সভা আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে। তবে সভা এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওপর বাধ্যতামূলক হবে। সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক আইন কমিশন নিয়োগ করেছে। এই কমিশন বহু আইনের সাধারণ নিয়মাবলী রচনা করেছে। সাধারণ সভা বহু বিষয় কনভেনশন তৈরি করেছে। তবে সভার এই ক্ষমতা "আধা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা" (Quasi-legislative power)। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে আইন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাধারণ সভার সুপারিশের গুরুত্ব আছে। সাধারণ সভা যে বিভিন্ন বিষয়ে কনভেনশন প্রস্তুত করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সম্পর্কিত কনভেনশন ও ১৯৬৫ সালের বর্ণবিদ্বেষ প্রথা

প্রসঙ্গে কনভেনশন। আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের উদ্যোগে নতুন সমুদ্র আইন রচিত হয়েছে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির দিক থেকে আগ্রহের অভাবে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবিশ্বাসের আবহাওয়ার ফলে সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষেত্রে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

৪। নির্বাচনমূলক কার্য—

নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ সভাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ সভা এককভাবে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের ও অছি পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে নির্বাচিত করে। সভা বিভিন্ন অস্থায়ী কমিশনের সদস্যগণকেও নির্বাচিত করে। নিরাপত্তা পরিষদের ৬০জন অস্থায়ী সদস্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্যকে নির্বাচিত করার দায়িত্ব সাধারণ সভার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ ৯ জন সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদস্যগণকে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা উভয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। তবে একই রাষ্ট্র থেকে একজনের বেশি বিচারপতি নির্বাচিত করা যায় না।

৫। তদারকমূলক কার্য—

সাধারণ সভার উপর অন্যান্য বিভাগের তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সনদের ১৫(১) ধারা অনুসারে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের কাছ থেকে বাৎসরিক ও বিশেষ রিপোর্ট গ্রহণ করবে। সনদের ৬৫(২) ধারা অনুসারে সভা অন্যান্য দপ্তরের কাছ থেকে বার্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ ও বিবেচনা করবে। নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ সভার কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকেও সভার কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এরপর সভা প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপারিশ দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত বহু সহযোগী সংস্থাও সাধারণ সভার কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

৬। আর্থিক দায়িত্ব—

সাধারণ সভা রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাজেট নিয়ে আলোচনা করে। সনদের ১৭(৬) ধারা অনুযায়ী সাধারণ সভা রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যয়-বরাদ্দের বিষয়টি সাধারণ সভার আওতায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সংস্থাগুলির অর্থ ও বাজেট সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম সভা অনুমোদন করে। সনদের ১৭(৩) ধারা অনুসারে এই সমস্ত সংস্থার হিসাব সভা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র কত অর্থ রাষ্ট্রসঙ্ঘে দেবে তা ঠিক করবে সাধারণ সভা। কোন দেশ যদি নির্ধারিত অর্থ সময়মতো না দেয় তাহলে সভা তাকে তিরস্কার করতে পারে এবং দরকার পড়লে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারে।

৭। সনদ সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা—

সাধারণ সভা দরকার পড়লে সনদ সংশোধন করতে পারে। সনদ সংশোধনের জন্য কোন প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি বলতে বোঝায় পাঁচজন স্থায়ী সদস্যসহ কমপক্ষে ন'জনের সমর্থন, যা বলা আছে সনদের ধারা ১০৮-এ। সনদের ৬০নং ধারায় সংশোধনের বিষয়ে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের গতিশীলতা ও নমনীয়তার স্বার্থে সনদেই সনদ সংশোধনের প্রক্রিয়াটি আলোচিত হয়েছে।

৮। অন্যান্য কার্য—

সাধারণ সভা বহু অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে। সাধারণ সভা সহযোগী সংস্থা গঠন করতে পারে ও

প্রয়োজনীয় কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করতে পারে। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যাবলীকে ভালভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। সভা আজ পর্যন্ত আণবিক শক্তি কমিশন শান্তি তদারক কমিটি, বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত কমিটি ইত্যাদি অনেক কমিটি গঠন করেছে। কোন নতুন সদস্যকে নেওয়া হবে কিনা বা কোন সদস্যকে বহিষ্কারের ব্যাপারে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে। সনদের অধ্যায় ১৩ ও ১৪ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে সাধারণ সভার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সভাকে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ ও সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সভা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

মূল্যায়ন—

নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে সাধারণ সভার সম্পর্কের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে সাধারণ সভা বিস্তার লাভ করেছে। সভাতে কোন রাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। তাই সভা অধিকাংশ সমস্যার উপর আলোচনা করে। নিরাপত্তা পরিষদ অনেকক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর একমত হতে পারেনা। এই কারণে সাধারণ সভার গুরুত্ব বেড়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে সনদের উদার ব্যাখ্যার কারণে সাধারণ সভার প্রভাব বেড়েছে। কোরিয়া ও প্যালেস্টাইন সমস্যার ক্ষেত্রে সভা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা দেখা দিলে, সেই বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে পাঠান যায়। সাধারণ সভা বিশ্বের মানুষের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পেরেছে। এই সভা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করতে সফল হয়েছে। এই সভার আলোচনার সময় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমসার্বভৌমত্ব ও সমানাধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সভায় বিশ্বজনমতের প্রতিফলন ঘটে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (কোন বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের মত সাধারণ সভার ওপরে চাপানো যায় না।) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়েছে। জোট নিরপেক্ষ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ সভার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ সভা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সাধারণ সভা বর্ণবিদ্বেষ নীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সভা বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। নামিবিয়াকে স্বাধীন করতে সভা উদ্যোগ নেয়। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ ও আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সভার উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশন নিয়োগ করা ছাড়া, সাধারণ সভার উদ্যোগে সম্পাদিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। সাধারণ সভা শক্তিধর রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ সভা মানবাধিকার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে। বর্ণবিদ্বেষী আচরণের বিরুদ্ধে সভায় আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রহীন ও উদ্বাস্তু মানুষ, যুদ্ধবন্দী, গণহত্যা, আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সাধারণ সভার ভূমিকা কৃতিত্বের দাবি রাখে। পরিষেবামূলক কাজকর্মেও সাধারণ সভা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করা ছাড়া নানা সেবামূলক কাজ করেছে। মহাকাশ ও সমুদ্রতলের ব্যবহার, জনসংখ্যা ও খাদ্য সমস্যা, পরিবেশ দূষণ রোধ, প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে জোর দিয়েছে।

সাধারণ সভার ক্ষমতা ও ভূমিকার সীমাবদ্ধতা আছে। ষাটের দশক থেকে সাধারণ সভায় আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা সাধাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ও জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। যার ফলে মার্কিন শিবিরের দেশগুলি সাধারণ সভার উপর নির্ভর না করে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর বেশি করে আস্থা জ্ঞাপন করে। যার ফলে সভার ক্ষমতা ও ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। সাধারণ সভা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা,

বিতর্ক ও পর্যালোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সভার কার্যকরী ক্ষমতা নেই। সাধারণ সভার সদস্য সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সভায় এখন অনেক সময় সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগ, বাক্-বিতণ্ডা ও ঝগড়া লেগে থাকে। এর ফলে মূল্যবান সময়ের অপচয় হয় এবং সভার পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র জানে যে ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম নিরাপত্তা পরিষদ। সভার এই অক্ষমতার জন্য তার প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সভার প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে একই বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী আলোচনা চলতে থাকে। এ কারণে আলোচ্যসূচী অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণ সভার অধিবেশন এবং কমিটির সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিটিগুলির আলোচ্যসূচীও অসংখ্য বিষয়ে ঠাসা থাকে। প্রতিটি বিষয়ের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ থাকে না। সভার কাজকর্মের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে।

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সভার যথেষ্ট গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সভা জনমত সৃটি করতে সক্ষম হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও সাধারণ সভা অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার কাজকর্ম প্রশংসনীয়। পরিশেষে বলা যায় যে সাধারণ সভা ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের মিলনের এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ। সাধারণ সভার সাংগঠনিক সংস্কারসাধন ও কার্যপদ্ধতির মানোন্নয়ন করা দরকার।

২.১.৩ নিরাপত্তা পরিষদ

গঠন—

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ২৩ ধারায় নিরাপত্তা পরিষদের গঠনের ব্যাপারে আলোচনা আছে। নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ১৫। এর মধ্যে ৫জন স্থায়ী সদস্য ও ১০ জন অস্থায়ী সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন হল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। ১০টি অস্থায়ী আসনের মধ্যে রয়েছে এশিয়ার ২টি আসন, আফ্রিকার ৩টি আসন, লাতিন আমেরিকার ২টি, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ২টি এবং পূর্ব ইউরোপের ১টি আসন। অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচনের সময় ভৌগোলিক বণ্টনের নীতি মেনে চলা হয়। এ ছাড়া নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলির অবদানের কথা বিচার বিবেচনা করা হয়। এইসব শর্তের কথা বলা হয়েছে সনদের ২৩(১) ধারায়।

অস্থায়ী সদস্যরা দু বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এরা সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়। কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারে না। একথা বলা আছে সনদের ২৩(২) ধারায়। যদি কোন রাষ্ট্রের সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সে যদি পরিষদের সদস্য না হয়, তাহলে আলোচনার সময় নিরাপত্তা পরিষদ সেই রাষ্ট্রকে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অবশ্য কোন ভোটাধিকার থাকে না।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের কিছু বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। পদ্ধতিমূলক বিষয় (Procedural Matters) ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে গেলে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সম্মতি আবশ্যক। সনদ সংশোধন করতে গেলে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে পরিষদকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যদের সামরিক বাহিনীর অধিনায়করা মিলিটারি স্টাফ কমিটিতে (Military Staff Committee) থাকে।

ভোট পদ্ধতি—

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ২৭ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমস্ত পদ্ধতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে ৯ জন সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে প্রয়োজন ৫ স্থায়ী সদস্যদের সমর্থন সহ ৯ জন সদস্যের সম্মতিসূচক ভোট। যে কোন স্থায়ী সদস্য যদি কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। একে বলা হয় ভেটো ক্ষমতা (Veto Power)। কোন স্থায়ী সদস্য যদি কোন প্রস্তাবে অসম্মতিসূচক ভোট দেয়, তাহলে পরিষদ সেই প্রস্তাবের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। সনদে পদ্ধতিগত বিষয় (Procedural Matters) এবং অন্যান্য বা মৌলিক বিষয়ের (Other Matters or non-procedural matters) মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদ ভোট পদ্ধতির জটিলতা হ্রাস করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যদি কোন স্থায়ী সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে, তাহলে সেটাকে ভেটো বলে গণ্য করা হবে না। নিরাপত্তা পরিষদে দ্বৈত ভেটোর (Double veto) প্রচলন আছে। কোন বিষয়কে পদ্ধতিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে, কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট বিয়টিকে পদ্ধতিগত বিষয়ের আওতার বাইরে রাখতে পারে। তারপর সেই প্রস্তাবকে পরাস্ত করতে হলে দ্বিতীয়বার সে ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। একে বলা হয় "দ্বৈত ভেটো"। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাকে অনেকে সমালোচনা করেছে। অনেকের মতে পাঁচ স্থায়ী সদস্য ইচ্ছামতন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। ভেটো প্রদানের ফলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা সদস্য রাষ্ট্রদের সমমর্যাদার বিরোধী। ইতিহাসে এরকম অনেক নজির আছে যেখানে ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে।

কার্যাবলী—

নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পণ করা হয়েছে। পরিষদের কার্যাবলীতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

♦ **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী—**

সনদের ধারা ২৪ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর। নিরাপত্তা পরিষদ যাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নীতি অনুযায়ী কাজ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখবে। সনদের ৩৩ ধারা অনুসারে কোন বিবাদের ফলে যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে বিবাদের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষকে ডেকে বিবাদের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদের যে কোন বিষয়ের উপর তদন্ত করতে পারে। সনদের ৩৫ ধারা অনুযায়ী কোন সদস্য রাষ্ট্র কোন বিরোধ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় এমন দেশও বিরোধ সম্পর্কে সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে পারে। সনদের ৩৬ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারে। সনদের ৩৭ ধারা অনুসারে যদি বিরোধের সঙ্গে জড়িত আছে যারা, তারা যদি মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিষয়টি পেশ করবে। আবার ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে বিরোধের সঙ্গে জড়িত দেশগুলি যদি অনুরোধ করে তাহলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ করতে পারে। সনদের ৩৯ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা আছে স্থির করার যে কোথাও কোন শান্তিভঙ্গের ঘটনা, শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে কিনা। ৪০ ধারা অনুসারে অবস্থার যদি অবনতি হয় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ঠ পক্ষকে কোন অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। পরিষদের নির্দেশ না পালিত হলে পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

পারে। সনদের ৪১ ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ ঠিক করবে যে বলপ্রয়োগ না করে তার নির্দেশকে যদি অন্য কোন উপায়ে কার্যকর করা যায়। সনদের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে নিরাপত্তা পরি,দ যদি মনে করে যে ৪৬ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী কোন কাজ হচ্ছে না তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিমান, নৌ বা স্থলবাহিনীর সাহায্যে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অবরোধমূলক ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সকল সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনমতো সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করবে। ৪৪ ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ যদি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের কাছে সশস্ত্র বাহিনীর জন্যে আবেদন জানাতে পারে। ৪৬ ধারা অনুসারে পরিষদ মিলিটারী স্টাফ কমিটির সাহায্যে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে যে একটি মিলিটারী স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও পরিচালনা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশমতো সব রাষ্ট্র বা প্রয়োজনে কয়েকটি রাষ্ট্র সহযোগিতা করবে। একথা বলা হয়েছে সনদের ৪৮ ধারাতে। ৪৯ ধারায় বলা হয়েছে যে নিরাপত্তা পরিষদ যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র পরস্পরকে সাহায্য করবে। সনদের ৫৬ ধারা অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রদের একক বা যৌথভাবে আত্মরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। কোন সদস্য রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে একক বা যৌথভাবে আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে হবে এবং সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব যেন চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়ে। সনদের ৫২(৩) ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসার জন্য উৎসাহ দেবে। তবে ওই ব্যবস্থা যেন ৩৪ ও ৩৫ ধারার বিরুদ্ধভাবে প্রযোগ না করা হয়।

♦ অস্থি সংক্রান্ত ক্ষমতা—

নিরাপত্তা পরিষদকে অছি সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সামরিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলির ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সকল কার্য সম্পাদন করবে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য অছি পরিষদের সদস্য যাতে এই দায়িত্ব ভালভাবে পালন করা যায়। সামরিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলিতে যাতে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। অছি সংক্রান্ত ক্ষমতা নিয়ে সনদের ৮৩ ধারায় আলোচনা আছে। সমস্ত অছি এলাকাভুক্ত বিষয় সংক্রান্ত সকল চুক্তির শর্ত অনুমোদন ও পরিবর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

♦ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ বা সম্মতি দরকার। সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করে। এই সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫জন সদস্যের মধ্যে ৯জন সদস্যের সম্মতি আবশ্যক। আবার এই ৯ জনের মধ্যে ৫জনকে স্থায়ী সদস্য হতে হবে।

♦ সদস্যপদ গ্রহণ ও বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘে নতুন সদস্য গ্রহণ করার ব্যাপারেও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা আছে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা নতুন সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নতুন সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে পরিষদের

পাঁচ স্থায়ী সদস্যের একমত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি সামরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তবে পরিষদ তাকে তার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এ কথা বলা আছে ৫ ধারায়। তেমনি আবার সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা ও অধিকার পুনরায় প্রদানের ব্যপাারে নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ করতে পারে। কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি বারবার সনদের নীতি অমান্য করে তবে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা সেই সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারে।

♦ সনদ সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। সনদ সংশোধনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারাও অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সনদের ৬০৮ ধারায় বলা আছে।

♦ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ২৬ ধারায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ আছে। অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও মানবিক সম্পদ যাতে যথাসম্ভব কম পরিমাণে ব্যয় করা হয়, সেদিকে পরিষদ লক্ষ্য রাখবে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে ও পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষদ সামরিক কর্মচারী কমিটির (Military Staff Committee) সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে থাকে। পরিষদ এই কমিটির সাহায্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করতে পারে।

♦ আঞ্চলিক সংস্থা—

রাষ্ট্রসংঘ সনদের অষ্টম অধ্যায় অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মীমাংসার জন্য যদি কোন আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হয় ও সেই সংস্থা যদি নিজের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ তাকে উৎসাহিত করবে। তবে সেই আঞ্চলিক সংস্থাকে নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে হবে যে সে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংস্থার সাহায্য নিতে পারে। সনদের ৫২ থেকে ৫৪ ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে অথবা বিরোধের সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রের উদ্যোগে আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব।

♦ কূটনৈতিক ভূমিকা—

নিরাপত্তা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল কূটনৈতিক ভূমিকা। পরিষদ সর্বদাই স্থায়ী, অস্থায়ী ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করে। বিশ্বে হঠাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদে তা প্রথম আলোচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনে বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এটি স্থায়ী সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা হয় নিরাপত্তা পরিষদে।

মূল্যায়ন—

গত তিরিশ বছরের সালতামামি করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপনের সময় যে আশা করা হয়েছিল তার তুলনায় নিরাপত্তা পরিষদ খুব বেশি কিছু কাজ করতে পারেনি। অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে অবাস্তব প্রত্যাশা করাটাই হল তার কাজকর্মের হতাশার কারণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদেই এই অবাস্তব প্রত্যাশার উৎস রয়েছে। সনদের ৪৩ ধারায় নিরাপত্তা পরিষদের সম্বন্ধে এমন এক প্রত্যাশা জাগিয়েছিল যা ছিল পুরোপুরি অবাস্তব। যদি এই ধরণের শান্তিরক্ষা বাহিনীর গঠন সম্বন্ধে ঐক্যমত গড়ে তোলা যেত, তাহলেও এর ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যাশা ছিল

অবাস্তব। কেননা, কোন না কোন স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র মনে করতেই পারে যে এই বাহিনীর কাজকর্ম তার রাষ্ট্রগত স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে আর তখনই সে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় বিশ্বব্যাপী মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিবর্তে যখন নিতান্তই স্থানীয় স্তরে কোন বিরোধ দেখা গেছিল তখন জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছিল তার পেছনে ছিল বৃহৎ শক্তিগুলির ঐক্যমত। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর যে বিশ্ব পরিস্থিতি দেখা গেল সেখানে এই সম্ভাবনা ছিল না। কেননা বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই যেমন গ্রীস, বার্লিন ইন্দোনেশিয়া, গুয়েতামালা, লেবানন, ভিয়েতনাম, ডোমিনিকান রিপাবলিক বা অ্যাঙ্গোলায় বিরোধ দেখা দিলে তা সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন বৃহৎশক্তির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত এবং ভেটো প্রয়োগ করা হত।

নিরাপত্তা পরিষদের ওপর আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, নিরাপত্তা পরিষদ সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। অনেক সময় বিরোধের সঙ্গে যুক্ত দেশগুলি পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। তথ্য সংগ্রহ, তদন্ত সালিশী ও সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্ররা সবসময় সহযোগিতা করেনি পরিষদের সঙ্গে। পরিষদ ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত কোন শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন সামরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারেনি। এর একটি কারণ হল যে পাঁচ স্থায়ী সদস্য একমত হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের উপর নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ বা মিলিটারী স্টাফ কমিটি সফলতা পায়নি।

তবে ষাটের দশকে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শিবিরের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হওয়ায়, ভেটোর সংখ্যা হ্রাস পায়। স্থায়ী সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এই সময় নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি রেখা পর্যবেক্ষণের জন্য শান্তিরক্ষীকারী মিশন পাঠিয়েছে। গ্রীক সমস্যার ক্ষেত্রে পরিষদ তথ্যানুসন্ধানী কমিশন নিয়োগ করেছে। প্যালেস্টাইনে নিরাপত্তা পরিষদ Truce Commission ও লেবাননে শান্তি পর্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত করেছে। কঙ্গো সমস্যার মোকাবিলার জন্য পরিষদ মহাসচিবকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশন পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছিলো। একইভাবে সাইপ্রাস সমস্যার ব্যাপারে পরিষদ শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠিয়েছিল।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার মূল কারণ স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা। কিন্তু প্রভাবশালী রাষ্ট্রদের ইচ্ছার উপরই যখন বিশ্বশান্তি নির্ভর করে, তখন ভেটো প্রদানের ক্ষমতা বাস্তবকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে একেবারে উপেক্ষিত থাকে নি। ১৯৫০ সালের পর থেকে দেখা গেছে যে যখনই কোথাও বিরোধ দেখা গেছে তখনই নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ বিরোধের নিষ্পত্তি করতে না পারলেও অন্তত বিরোধের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং অনেক সময়েই নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রগত স্বার্থের বোঝাপড়ার মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে সাহায্য করেছে। সুতরাং সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তিই হয়েছে বোঝাপড়ার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য আপোস সূত্র বের করে। নিরাপত্তা পরিষদ তো জাতীয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার সঙ্গে তুলনীয় নয়। বরং বলা যায় পরস্পর বিরোধী শক্তিদের এক ধরণের অ্যাড হক কমিটি যেখানে আলোচনা বা দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমেই সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হয়। যেখানে বৃহৎ শক্তিদের স্বার্থের সংঘাত খুব বেশি নয়—যেমন সাইপ্রাস বা কঙ্গোর ক্ষেত্রে—সেখানে এই ধরণের সহমতের ভিত্তিতে বিরোধের সমাধান হয়েছে। আর যেখানে বৃহৎ শক্তিদের সংঘাত স্পষ্ট এবং গভীর—যেমন, হাঙ্গেরী ও ভিয়েতনাম—সেখানেও নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনার ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

নিরাপত্তা পরিষদ মূলত একটি রাজনৈতিক পরিষদ ও তার মধ্যেই তার শক্তি ও দুর্বলতা নিহিত। পরিষদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে সদস্য রাষ্ট্রের মতভেদ, বিবাদ বা মতৈক্য প্রতিফলিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বে শান্তিরক্ষায় পুরোপুরি সাফল্য না পেলেও গত পনের বছরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে তার রাজনীতিক দক্ষতা দেখতে পেরেছে। রোডেশিয়া সমস্যা বা ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল সমস্যায় নিরাপত্তা পরিষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanction) গ্রহণ করেছে। অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষক বাহিনী গঠন করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রচেষ্টাতেও নিরাপত্তা পরিষদ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পরিষদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তবে পরিষদের সিদ্ধান্ত সবসময় খুব বেশি কার্যকর হয়নি। আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আরো সুষ্ঠু ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিষদকে আরো বেশি প্রতিনিধিমূলক ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হতে হবে। পরিষদ শুধু প্রস্তাব পাশ করে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাকে সক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। পরিষদকে বিশ্বের সকল সংঘর্ষ ও বিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রত্যেক দেশের সরকারের উচিত প্রকাশ্যে পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকার করা। আন্তর্জাতিক ব্যবহার সম্পর্কে আচরণবিধি তৈরি করলে ভাল হয়। বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তি বিন্যাস আরো সঠিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের গঠনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এর স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জার্মানি, জাপান ও ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক বাস্তবতার যত বেশি সঠিক প্রতিফলন নিরাপত্তা পরিষদের গঠনের মধ্যে দেখা যাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একবিংশ শতকে তত বেশি কার্যকরী সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

২.১.৪ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

গঠন—

সনদে সাধারণ সভার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার লক্ষ্য অর্জন করতে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের এই ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫৪। প্রত্যেক সদস্য পরিষদে একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। সর্বদাই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যদের থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিষয়ে পরিষদে যদি আলোচনা হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আলোচনার সময় উপস্থিত থাকতে পারে। পরিষদের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি (Specialised agencies) অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি বার্ষিক অধিবেশন শুরু করার আগে একজন সভাপতি ও দুজন সহ সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে আফ্রো-এশীয় সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা এখন আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিষদে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রভাব কিছুটা কমেছে। প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য, অর্থাৎ ১৮জন সদস্য অবসর গ্রহণ করে এবং নতুন ১৮ জন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর। সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারে। একথা বলা আছে সনদের ৬১(২) ধারায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করে সাধারণ সভা। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি প্রভৃতির সমান প্রতিনিধিত্বের দিকে নজর রাখা হয়। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে চলা হয়। আফ্রিকা থেকে ১৪, এশিয়া থেকে ১১, লাতিন আমেরিকা থেকে ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য থেকে ১৩ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হন। পরিষদের অধিবেশন বছরে তিনবার হয়। প্রথমে এপ্রিল থেকে মে মাসে হয় নিউইয়র্কে। দ্বিতীয়

অধিবেশন হয় জুলাই মাসে জেনেভায়। তৃতীয় অধিবেশন হয় অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে আবার নিউইয়র্কে। অধিবেশন স্থায়ী হয় চার থেকে ছ সপ্তাহ। পরিষদের অধিকাংশ সদস্য যদি চায় তাহলে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরা, অন্যান্য বিভাগ, মহাসচিব ও বিশেষ বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাছে সুপারিশ করতে পারে। সনদের ৬৩(১) ও ৬৩(২) ধারা অনুসারে পরিষদ বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে সাধারণ সভাকে দিয়ে সেই চুক্তি অনুমোদন করাতে হবে। সনদের ৬৮ ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য করার জন্য বিশেষ কমিশন নিয়োগ করতে পারে।

কার্যাবলী—

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলীর পরিধি বিশেষভাবে ব্যাপক। সনদের ৬১(১) ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা সমস্যার সমীক্ষা করে। তারপর সেই সমস্যাগুলির ব্যাপারে সাধারণ সভা বা বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাছে সুপারিশ করে। সনদের ৬২(২) ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। সনদের ৬২(৩) ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবাদির খসড়া চুক্তি (Draft Conventions) প্রস্তুত করে এবং সাধারণ সভার কাছে পেশ করে। সনদের ৬২(৪) ধারায় বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ম অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকতে পারে। সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশেষ সংস্থা (Special Bodies) গঠন করা হয়েছে। সনদের ৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাথে যাতে তারা সহযোগিতা করে, সেটা দেখার দায়িত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের। এ ব্যাপারে সাধারণ সভার অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন। বিশেষ সংস্থাগুলি কিভাবে সহযোগিতা করবে, সে ব্যাপারে পরিষদ চুক্তি করতে পারে। তবে এই সমস্ত চুক্তি কার্যকর করার জন্য সাধারণ সভার অনুমোদন লাগে। সনদের ৬৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে পরিষদ এই সমস্ত বিশেষ সংস্থাগুলির কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পরিষদ বিশেষ সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে অথবা তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় সুপারিশ করতে পারে।

সনদের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ সংস্থাগুলির থেকে কাজকর্মের প্রতিবেদন নিয়মিত চাইবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। পরিষদ প্রয়োজনমত এই সমস্ত প্রতিবেদনের ব্যাপারে সাধারণ সভাকে তার মতামত জানাবে। এই ধারায় পরিষদকে আধা-প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরিষদের সুপারিশগুলো সঠিকভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা সেটা পরিষদ দেখবে। সনদের ৬৫ ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করবে এবং প্রয়োজনমতো সাহায্য করবে। বিশেষ সংস্থাগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ যে চুক্তিগুলি করবে তার অন্যতম উদ্দেশ্য নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করা। আবার নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন যে কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য প্রদান করতে পারে। সাধারণ সভা কোন দায়িত্ব দিলে পরিষদ তা সম্পাদন করে। সনদের ৬৬(১) ধারা অনুসারে সাধারণ সভার সুপারিশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কার্যকর করবে এবং নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করবে। সনদের ধারা ৬৬(২) অনুসারে পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুরোধ বা বিশেষ সংস্থাগুলির অনুরোধে

পরিষেবামূলক কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে। তার আগে অবশ্য সাধারণ সভার অনুমোদন নিতে হবে। সনদের ৬৬(৩) ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে অন্যত্র আলোচিত কাজকর্মও করতে হয়। সাধারণ সভা যদি কোন কার্য নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে পরিষদকে তা সম্পাদন করতে হবে। সনদের ৬৮ ধারায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের স্বার্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন করবে এবং তাদের কাজকর্মের তদারকি করবে।

বিশেষ সংস্থা ও কমিশনসমূহ—

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে কিছু স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) আছে। অধিবেশন চলাকালীন পরিষদের কাজকর্মে সহযোগিতা করার জন্য তিনটি কমিটি আছে। এগুলি হল—

- ❑ প্রোগ্রাম ও সমন্বয় কমিটি (Programme and Coordination Committee)
- ❑ অর্থনৈতিক কমিটি (Economic Committee)
- ❑ সামাজিক কমিটি (Social Committee)

স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে রয়েছে—

- ■ কর্মসূচি ও সমন্বয় কমিটি (১৯৬২) (Committee for Programme and Coordination)
- ■ বহুজাতিক কর্পোরেশন সম্পর্কিত কমিটি (১৯৭৭) (Committee on Transnational Corporations)
- ■ আন্ত-সরকারি এজেন্সীসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনা সম্পর্কিত কমিটি (১৯৬৫) (Committee on Negotiation with Inter Governmental Agencies)
- ■ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি (১৯৪৬) (Committee on Non-Governmental Organisations)
- ■ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত কমিটি (১৯৭০) (Committee on Natural Resources)
- ■ মানব জাতির বসতি সম্পর্কিত কমিটি (১৯৭৭) (Committee on Human Settlement)
- ■ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত কমিটি (১৯৬৫) (Committee for Development Planning)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কয়েকটি বিশেষ সংস্থা আছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে—

- ◆ শিশুদের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থভাণ্ডার (United Nations International Children's Emergency Fund—UNICEF)
- ◆ ঔষধপত্র তদারকির সংস্থা (Drug Supervisory Body)
- ◆ স্থায়ী কেন্দ্রীয় ওপিয়াম বোর্ড (Permanent Central Opium Board)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থা (Specialised Agencies) আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- ◆ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation, ILO)
- ◆ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation, FAO)
- ◆ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund, IMF)
- ◆ রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO)

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation, WHO)
- আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency, IAEA)
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (International Development Organisation, IDA)
- আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (International Finance Corporation, IFC)
- পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
- আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা (International Postal Union, IPU)
- আন্তর্জাতিক টেলি-যোগাযোগ ইউনিয়ন (International Telecommunication Union, ITU)
- আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা (International Civil Aviation Organisation, ICAO)
- আন্ত-সরকারি সমুদ্র পরামর্শদাতা সংস্থা (Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation, IMCO)
- বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organisation, WMO)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দু ধরনের কমিশনের সাহায্য নিয়ে থাকে। এরা হল—কার্যনির্বাহী কমিশন (Functional Commission) এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন (Regional Economic Commission)। আটটি কার্যনির্বাহী কমিশন আছে। সেগুলি হল—

- পরিসংখ্যান কমিশন (Commission on Statistics)
- জনসংখ্যা কমিশন (Commission on Population)
- মানবিক অধিকার সম্পর্কিত কমিশন (Commission on Human Rights)
- মাদক দ্রব্য সম্পর্কিত কমিশন (Commission on Narcotic Drugs)
- সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কমিশন (Commission for Social Development)
- নারী মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন (Commission on the Status of Women)
- অপরাধ রোধ ও অপরাধ বিষয়ক নীতি সম্পর্কিত কমিশন (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice)
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিশন (Commission on Science and Technology)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে পাঁচটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন (Regional Economic Commission) গঠন করা হয়েছে। সেগুলি হল—

- ইউরোপের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Europe, ECE)। এর সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত।
- আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Africa, ECA)। এর সদর দপ্তর আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত।
- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ESCAP)। ব্যাংককে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।
- লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Latin America and Carribean, ECLAC)। এর সদর দপ্তর সান্তিয়াগোতে অবস্থিত।

- পশ্চিম এশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA)। বাগদাদ-এ এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

মূল্যায়ন—

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বাস্তবে কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই। তার এক্তিয়ারের মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে তা নিয়ে পরিষদ কেবল আলোচনা করতে পারে এবং খসড়া প্রস্তুত করতে পারে। অথবা পরিষদ সুপারিশ করতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ সভার অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই সংস্থা সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশগুলি সাধারণ সভার মাধ্যমে কার্যকর হয়। কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষদ সাধারণ সভাকে অতিক্রম করতে পারে না। কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাজ ব্যাহত হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থ ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব। পরিষদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী মতাদর্শগত বিরোধ ও রাজনৈতিক দলাদলি। এর ব্যর্থতার আরেকটি মূল কারণ হল যে এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, উচ্চাভিলাষী ও অবাস্তব। এই পরিষদের কার্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ-বিতর্ক লেগে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ বা দুর্ভিক্ষ দূর করার ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হয়নি। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশগুলি রয়েছে তার অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে পরিষদ খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে অনেকরকম বিশেষজ্ঞ কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন কমিশন ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়সাধন করার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার হয় তা পরিষদের নেই।

বিভিন্ন দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে মূল্যহীন বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই পরিষদ দায়িত্ব পালন করতে সফল হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনমূলক উদ্দেশ্য বা কাজকর্ম এই পরিষদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিষদ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নানা গবেষণা চালিয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে পরিষদ যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাম্প্রতিককালে বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করেছে। এর ফলে সাংগঠনিক দুর্বলতা বা অবস্থাজনিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জন করা গেছে।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিষদ নানা বিষয় প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি সহযোগিতা না করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পক্ষে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণ কার্যাবলী সফল করার জন্যে এই পরিষদের কাজকর্মকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। বিশ্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরিষদের বহুমুখী অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কার্যাবলী প্রশংসার দাবি রাখে।

২.১.৫ অছি পরিষদ

অছি ব্যবস্থা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৭৫ থেকে ৮৫ ধারার মধ্যে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সনদের ৭৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার অধীনে একটি আন্তর্জাতিক অছি

ব্যবস্থা (International Trusteeship System) গড়ে তুলবে যা তার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই অছি ব্যবস্থার অধীনে কোন কোন অঞ্চলকে ন্যস্ত করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যের দায়িত্বে থাকবে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা। সনদের ৭৬ ধারায় অছি পরিষদের যে উদ্দেশ্যগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল—

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

অছি এলাকার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন ও স্বশাসিত সরকার অর্জনের দিকে তাদের প্রগতি। মানব অধিকার ও সকলের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য ও তার নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যগত ব্যাপারে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান।

সনদের ৭৭ ধারা অনুসারে অছি ব্যবস্থার মধ্যে যে সব অঞ্চল আছে সেগুলি একই শ্রেণীভুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার মধ্যে তিন ধরনের এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। সেগুলি হল—

ম্যান্ডেট ব্যবস্থার (Mandate System) অধীনস্থ এলাকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে অধিকৃত এলাকাগুলি

স্বেচ্ছাগত ভিত্তিতে অছি ব্যবস্থার কাছে হস্তান্তরিত কোন এলাকা।

সনদের ৭৮ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির ওপর অছি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে না। সনদের ৭৯ ধারায় বলা হয়েছে যে কোন পদ্ধতি অনুসারে অধীনস্থ এলাকাগুলিকে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সাধারণ সভা ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। কোন অঞ্চলকে অছি ব্যবস্থার আওতায় আনতে হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে অছির শর্ত মানতে হবে। ম্যান্ডেটারী রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া ম্যান্ডেট অঞ্চলকে অছি ব্যবস্থার অধীনে করা যাবে না। অছির যেসব শর্ত আছে, সেগুলির মধ্যে থেকে কোন শর্ত সংশোধন বা পরিবর্তন করতে চাইলেও এই সম্মতি আবশ্যক। অছি সংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা থাকবে কোন কর্তৃপক্ষ অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করবে। একথা উল্লেখ করা হয়েছে সনদের ৮১ ধারায়। বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেনে নিতে হবে। শাসনকার্য পরিচালনার শর্ত প্রতিটি চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। সনদের ৮৪ ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অছি অঞ্চল যে ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করবে, তারজন্য এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আশ্বাস দেবে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সাহায্য নিতে পারে। প্রয়োজনে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য নিতে পারে। সনদের ৮৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অছি সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে কোন বিশেষ অঞ্চলকে আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে সামরিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা যায়। তবে সেই চুক্তি নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি নিয়েই সংশ্লিষ্ট চুক্তির সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছাড়া বাকি সকল অঞ্চলের ক্ষেত্রে অছি সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে সাধারণ সভা দায়িত্ব পালন করবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১১টি অছি এলাকাভুক্ত অঞ্চল ছিল। সেগুলি হল—

- অস্ট্রেলিয়ার অধীনে নিউগিনি ও নৌরা
- বেলজিয়ামের অধীনে রুয়ান্ডা উরুন্ডি
- ফ্রান্সের অধীনে ক্যামেরুনস ও টোগোল্যান্ড
- ইতালির অধীনে সোমালিল্যান্ড
- নিউজিল্যান্ডের অধীনে পশ্চিম সামোয়া

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (মারিয়ানাস, মার্শালস ও ক্যারোলিনাস দ্বীপপুঞ্জ)
- ব্রিটেনের অধীনে ক্যামেরুন, টোগোল্যান্ড ও টাঙ্গানাইকা

এদের মধ্যে সোমালিল্যান্ড ছাড়া সকল অঞ্চলই লীগের ম্যান্ডেট ব্যবস্থার অধীনে ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি ব্যবস্থার নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল।

অছি পরিষদ—

সনদে অছি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য অছি পরিষদ (Trusteeship Council) গঠন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ৮৬ ধারায় উল্লেখ আছে অছি পরিষদের গঠন নিয়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কিছু রাষ্ট্রকে নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হয়। এগুলি হল—

অছি অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক দায়িত্বযুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহ।

নিরাপত্তা পরিষদের সেই সমস্ত স্থায়ী সদস্য যাঁরা অছি অঞ্চলের শাসক নন।

সাধারণ সভার দ্বারা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য রাষ্টর।

অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সমান সংখ্যক রাষ্ট্রকে নিয়োগ করার ক্ষমতা সাধারণ সভার আছে। অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রথমে ছিল ১৪। তারপর কিছু অছি অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করায় সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৮। অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মনোনীত করে। অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের অছি অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। অছি পরিষদের কাজের সূচনা হয় ১৯৪৬ সাল থেকে। ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ৮৯ ধারা অনুযায়ী অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে ভোট প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গ্রহণ করতে হবে। সনদের ৯০ ধারা অনুসারে অছি পরিষদ নিজের সভাপতি নির্বাচন করতে পারবে এবং কার্যপদ্ধতি বিষয়ক নিয়ম কানুন প্রণয়ন করবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশের অনুরোধে অছি পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা যায়। তাছাড়া পরিষদ নিজের নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক ডাকতে পারে। সাধারণ অছি পরিষদের বৈঠক নিউইয়র্কে বসে বছরে একবার। সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অনুরোধে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ৮৭ ও ৮৮ ধারায় অছি পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে—

অছি পরিষদ অছি অঞ্চলের শাসক রাষ্ট্রগুলির বার্ষিক প্রতিবেদন বিচার বিবেচনা করে। প্রয়োজনে প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষদ তার সুপারিশ পাঠাতে পারে। অছি অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত আবেদনপত্র পরিষদ গ্রহণ করে। তার সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেইসব সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করে। অছি পরিষদ কোন অঞ্চলে পরিদর্শক দল পাঠাতে পারে। পরিদর্শক দলে থাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ থেকে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা। পরিদর্শনের পর এই দল যে রিপোর্ট দেয় তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। অছি চুক্তির যেসব শর্ত আছে তার বাইরেও পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে। সনদের ৮৮ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক অছি অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সম্পর্কিত অগ্রগতি জানতে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারে অছি পরিষদ। সনদের ৯১ ধারা অনুসারে অছি পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে যে কোন বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

স্বয়ংশাসিত নয় এমন এলাকা—

সনদের একাদশ অধ্যায়ে সংযোজিত স্বয়ংশাসিত নয় এমন এলাকা (Non Self-governing territories) সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই প্রথম পরাধীন রাষ্ট্রের প্রশাসক রাষ্ট্রগুলি ঠিক করল যে তারা কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সনদের একাদশ অধ্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে পরাধীন উপনিবেশগুলির জনগণের ওপর আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও তদারকের কোন নীতি অবলম্বন করা হবে। অছি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিগুলির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে সনদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। সনদের ৭৩ ধারাতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ওপর কতকগুলি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যেসব সদস্য পরাধীন এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়েছে, তারা ঐ সমস্ত এলাকার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সর্বদাই চেষ্টা করবে তাদের উন্নতি এবং কল্যাণসাধনের জন্য। এই উদ্দেশ্যে প্রশাসক রাষ্ট্রগুলি কতকগুলি দায়িত্ব পালন করবে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে—

পরাধীন অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন, তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ ও অন্যায় আচরণ থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা।

- পরাধীন অঞ্চলের জনগণকে তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য দান।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি।
- উন্নয়নের গঠনমূলক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা।

এই ধারায় বর্ণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা।

পরাধীন জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণাপত্র এক বৈপ্লবিক কার্যক্রম। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ঔপনিবেশিক বিষয়টি আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্ণবৈষম্যবাদকে ও উপনিবেশবাদকে মানবতার প্রতি অপরাধ এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ করে বিশ্বের রাজনৈতিক সমাজের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মূল্যায়ন—

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে অছি পরিষদ সাধারণ সভার একটি সহায়ক সংস্থা। তাকে সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধানে কাজ করতে হয়। অছি পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলির ঠাণ্ডা লড়াই-এর একটি জায়গায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে অসুবিধা হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি অছি পরিষদের থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে বেশি আগ্রহী। এই পরিষদে অধিকাংশ রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি নেই। বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠন করা হয়নি। সদস্য রাষ্ট্রগুলি সাধারণত তাদের মর্জিমাফিক প্রতিনিধি পাঠায়। অছি পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নিতে হয়। এই ভোট পদ্ধতির ফলে অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব পরিষদে গ্রহণ করা যায় না। কারণ সনদে বলা হয়েছে যে পরিষদের সদস্যদের অর্ধেক হবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগুলির প্রতিনিধি।

অছি পরিষদ আজ পর্যন্ত তার সমস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছে। পরিষদ বিভিন্ন সময় পরিদর্শক মিশন বিভিন্ন অছি অঞ্চলে পাঠিয়েছে। অনেকক্ষেত্রে পরিষদ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন অছি অঞ্চলের স্বাধীনতা ও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করা, পরিষদের সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি ব্যবস্থা অনেককাংশে সাফল্য পেয়েছে। তার দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে অছি পরিষদ প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে। মোট ১১টি অছি অঞ্চলের মধ্যে ১০টি স্বাধীনতা পেয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণ-ভোটের

ব্যবস্থা করে কয়েকটি অঞ্চলকে তার পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত অছি অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করলে অছি পরিষদের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২.১.৬ আন্তর্জাতিক আদালত

গঠন—

আন্তর্জাতিক আদালতের একটি পৃথক সংবিধি (Statute) আছে। সেই সংবিধির ২ ধারা অনুসারে আদালত একদল স্বাধীন বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হবে এবং বিচারপতিগণ উচ্চ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। আদালতের সংবিধির ৩ ধারা অনুযায়ী এই আদালত ১৫ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠন করা হয়। কোন রাষ্ট্র থেকে একজনের বেশি বিচারপতি থাকবে না। বিচারপতিরা কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন না। তাঁরা ব্যক্তি হিসেবেই আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্য হন। সংবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী বিচারপতি নির্বাচনের সময় যারা নির্বাচন করবেন তাদের মনে রাখতে হবে যে নির্বাচিত ব্যক্তিরা যেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হন ও আদালতের মানবসভ্যতার প্রধান প্রধান ধারা ও বিশ্বের প্রধান প্রধান আইন ব্যবস্থার প্রতিনিধি হন। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি থেকে একজন করে পাঁচজন বিচারপতি নিযুক্ত হবেন। বিচারক পদের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করে। স্থায়ী সালিশী আদালতের (Permanent Court of Arbitration) জাতীয় প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে প্রার্থীদের প্যানেল মনোনীত করে। সেই তালিকা থেকে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ বিচারপতিদের নির্বাচিত করে।

নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা স্বতন্ত্রভাবে বিচারকদের নির্বাচিত করে। নির্বাচন পদ্ধতি সংবিধির ৮ ও ১০ ধারায় উল্লেখ আছে। বিচারপতিগণ সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ উভয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হন। বিচারপতি নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। বিচারপতিরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি এবং একজন সহ সভাপতি নির্বাচিত করেন। তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালত রেজিস্টার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে।

সংবিধির ১৩ ধারা অনুযায়ী বিচারপতিগণ নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। কোন বিচারপতি কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পদত্যাগ করতে পারেন। পদত্যাগপত্রটি সভাপতির কাছে পেশ করা হয়, যিনি সেটাকে মহাসচিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহাসচিব পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলে পদটি শূন্য হয়ে যায়। সংবিধির ১৮ ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালতের কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে কোন বিচারপতির ক্ষেত্রে যদি অন্যান্য বিচারপতিরা একমত হন যে তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করতে অক্ষম, তাহলে সেই বিচারপতিকে অপসারণ করা যায়। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকার্যের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হয়। সেজন্য, প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন। তাই প্রতি তিন বছর অন্তর পাঁচজন বিচারপতিকে নির্বাচন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা, পেনশন প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ সভা ঠিক করে দেয়। কোন বিচারপতিকে নিয়োগ করার পর তার নয় বছরের কার্যকালের মধ্যে সাধারণ সভা তার বেতন হ্রাস করতে পারে না। কোন মামলার দুটি পক্ষের মধ্যে যদি একটি পক্ষ যদি বিচারপতির দেশ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি ওই মামলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সেই দেশ তখন অপর কোন দেশের একজন বিচারপতিকে মনোনীত করতে পারে।

সংবিধির ৬৬ ধারা অনুসারে আদালতের বিচারপতিরা কোন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা অন্য কোন পেশাগত কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। বিচারপতিরা মামলায় উকিল হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। আদালতের

সদস্যরা তাঁদের কার্যকালে কয়েকটি কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে শপথ নেবে এই মর্মে যে তিনি তাঁর দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে ও বিবেকসম্মতভাবে পালন করবেন।

কার্যপদ্ধতি—

আন্তর্জাতিক আদালতের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আদালতের সভাপতিকে। উপস্থিত বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তাহলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) দেন। কোন মামলার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোন বা কয়েকজন বিচারপতি যদি একমত না হন তাহলে তাঁরা বিরুদ্ধ মত (dissenting opinion) জানাতে পারেন। আদালতের ১৫ জন বিচারপতির মধ্যে কমপক্ষে ৯ জন উপস্থিত থাকলে কোরাম (Quoram) হয়। বিভিন্ন রকম মামলার ক্ষেত্রে তিন বা তার অধিক সংখ্যার বিচারপতিদের নিয়ে বেঞ্চ গঠন করা যায়। আন্তর্জাতিক আদলতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগ (Hague) শহরে অবস্থিত। তবে প্রয়োজনে অন্য জায়গায় এর অধিবেশন বসতে পারে বা শুনানি হতে পারে। এই আদালতের কাজকর্ম সাধারণত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় পরিচালিত হয়।

কোন মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত যে রায় দেবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অন্য কোন আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না। তবে আদালত তার রায় পুনর্বিবেচনা অথবা সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে। তবে সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে হয়। একটি রায় ঘোষণার দশ বছরের পর আর আবেদন করা যায় না। সংবিধির ৫০ ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আদালত যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কমিশন, সঙ্ঘ বা সংগঠনের তদন্ত করার এবং সঠিক অভিমত প্রকাশের দায়িত্ব যে কোন সময় ন্যস্ত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আদালতে লিখিত ও মৌখিক, দুভাগে কার্য সম্পাদন করা হয়। একথা বলা হয়েছে সংবিধির ৪৩ ধারাতে। সংবিধির ৪৪ ধারায় বলা আছে যে কোন মামলায়, উকিল, কৌসুলী, এবং প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারো ওপরও নিষেধাজ্ঞা, আদেশ বা সমন জারি করতে হতে পারে। সংবিধির ৪২ ধারা অনুসারে মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষ নিজেদের বক্তব্য আদালতের সামনে পেশ করার জন্য প্রতিনিধি, কৌসুলী বা উকিল নিয়োগ করতে পারে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করে। সংবিধির ৪১ ধারা অনুসারে মামলার কোন এক পক্ষের আবেদনের ফলে অথবা আদালত নিজের উদ্যোগেই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

আদালতের এলাকা—

আন্তর্জাতিক আদালতের তিন ধরনের এলাকা আছে। সেগুলি হল—

- ঐচ্ছিক
- বাধ্যতামূলক
- উপদেশাত্মক

■ **ঐচ্ছিক এলাকা (Voluntary Jurisdiction)—**

আন্তর্জাতিক আদালতের ঐচ্ছিক এলাকা আছে। এই এলাকা অনুযায়ী আদালত বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতি অনুসারে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার জন্য কোন রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যায় না। কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি রাষ্ট্র আদালতের কাছে যাবে কিনা, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ওপর। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সম্মতিক্রমে আদালতে যে সমস্ত মামলা আসে তা সবই ঐচ্ছিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক আদালতের অন্যতম প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রগুলি যে সমস্ত বিরোধ পেশ করে তার মীমাংসা করা। এ ধরনের মামলা করার আগে বিবদমান পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নেয় যে তারা আদলতের রায় মেনে নেবে।

■ **বাধ্যতামূলক এলাকা (Compulsory Jurisdiction)—**

আন্তর্জাতিক আদালতকে স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার দেওয়া হয়নি। যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি কয়েকটি বিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচনা করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ওপর তা বাধ্যতামূলক হবে। একথা বলা হয়েছে সংবিধির ৩৬ ধারায়। সদস্য রাষ্ট্রগুলি কয়েকটি বিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে স্বীকৃতি জানাতে পারে। সংবিধির ৩৬(২) ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে সদস্যরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালতের বাধ্যতামূলক এলাকায় বিচার প্রার্থনা করতে পারে। বিয়গুলি হল—

চুক্তি বা সন্ধির ব্যাখ্যা
আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন
আন্তর্জাতিক দায় দায়িত্ব
আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

আদালত সেইসব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক এলাকা প্রয়োগ করেছে যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলি কোন চুক্তি বা কনভেনশন অনুযায়ী কতকগুলি বিবাদ বর্তমান আদালতের কাছে বা লীগের অধীনে কোন ট্রাইবুন্যালের কাছে বা স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে পেশ করতে বাধ্য। সংবিধির ৩৭ ধারা অনুসারে ওই বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে পেশ করা হবে। কোন রাষ্ট্র বিশেষ চুক্তি বা ঘোষণার মাধ্যমে আদালতের বাধ্যতামূলক এলাকা গ্রহণ করতে পারে। কোন মামলা পেশ করার পরও কোন রাষ্ট্র তার সম্মতি জানাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অনেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে, যেখানে বিবদমান অন্য রাষ্ট্র আদালতের কাছে উপস্থিত হয়নি।

আন্তর্জাতিক আদালতের বাধ্যতামূলক এলাকা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ৯৪(২) ধারায় বলা হয়েছে যে কোন মামলায় আদালত রায় দিলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ তা মেনে চলবে। মামলার কোন পক্ষ যদি আদালতের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে অপরপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য চাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ তখন প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আদালতকে মুখে সমর্থন করলেও, কার্যক্ষেত্রে খুব বেশি দায়িত্ব পালন করেনি। বহু রাষ্ট্রই অনেক শর্তসাপেক্ষে আদালতের বাধ্যতামূলক এলাকা গ্রহণ করেছে। আদালতের সামনে পেশ করা মামলার সংখ্যা এখন অনেক হ্রাস পেয়েছে।

■ **উপদেশাত্মক এলাকা (Advisory Jurisdiction)—**

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ৯৬ ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালতের ওপর উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত সনদ অনুসারে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা উপদেশ চাইতে পারে আদালতের কাছে। সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত যে কোন সংস্থা বা বিভাগ আদালতের কাছে কোন আইনগত প্রশ্নের ব্যাপারে মতামতের জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের ব্যাখ্যাও করে আদালত। তবে যে পরামর্শ প্রার্থনা করছে, সে সংশ্লিষ্ট পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। আদালত পরামর্শ দানের মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক আদালতের উপদেশ বা পরামর্শ প্রার্থনা করে লিখিতভাবে আবেদন করতে হয়। এ পর্যন্ত আদালত অনেক আইনগত প্রশ্নে উপদেশাত্মক অভিমত প্রদান করেছে।

মূল্যায়ন—

আন্তর্জাতিক আদালতের ঐচ্ছিক এলাকার খুব একটা গুরুত্ব নেই। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক

কাজ যদি কোন দেশ করে, আদালত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজে বিচারের জন্য এগিয়ে আসে। বিবদমান রাষ্ট্রগুলি আদালতের কাছে বিরোধ পেশ করতে বাধ্য নয়। বাধ্যতামূলক এলাকার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় আদালতের কর্তৃক মেনে না নিলে, আদালত কিছু করতে পারে না। রাষ্ট্রগুলি শর্তসাপেক্ষে বাধ্যতামূলক এলাকা স্বীকার করতে পারে যা আদালতের মর্যাদার বিরোধী। আন্তর্জাতিক আদালতের পরামর্শদানমূলক এলাকারও কোন বাস্তব মূল্য নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও আদালতের কোন ক্ষমতা নেই। অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে আদালতের রায় সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নয়। এই আদালতের বিচারপতিরা যে দেশের নাগরিক, কোন ক্ষেত্রে সেই দেশের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। আন্তর্জাতিক আদালতে কোন ব্যক্তি মামলা করতে পারে না। কেবলমাত্র রাষ্ট্রই আদালতে যেতে পারে। এটি একটি বড় ত্রুটি বলে গণ্য করা হয়। আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করার ঘটনাও ঘটেছে। কোন সদস্য রাষ্ট্রকে মামলার রায় মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা আদালতের নেই। এই কারণে আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আদালতের গঠন ব্যবস্থা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনৈতিক বিষয়ের সম্পর্কিত বিরোধের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এটি করে নিরাপত্তা পরিষদ। এটা আদালতের আরেকটা সীমাবদ্ধতা।

আন্তর্জাতিক আদালতকে যে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়, সেই পরিস্থিতি এর ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদিন থাকবে ততদিন আদালতের খুব একটা সাফল্য আসবে না। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব বাড়লে আন্তর্জাতিক আদালতের গুরুত্বও বাড়বে। এই আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা দরকার। আন্তর্জাতিক আদালতের কাজকর্মের পরিধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির করলে, আদালত নিজের কার্যকারিতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের আদালতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন দরকার।

২.১.৭ মহাসচিব ও সচিবালয়

মহাসচিব ঃ—

নিয়োগ—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয়ের (Secretariate) প্রধান হলেন মহাসচিব (Secretary-General)। মহাসচিব হলেন সামগ্রিক বিচারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের নির্বাচন নিয়ে সনদের ৯৭ ধারায় বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য সহ মোট ন'জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন মহাসচিব নির্বাচনের জন্য। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য একমত না হলে কোন ব্যক্তিকে মহাসচিব করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ যদি সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায় তাহলে মহাসচিব নিযুক্ত হন। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়াটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে মহাসচিবের কার্যকাল সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। সাধারণ সভা ১৯৪৬ সালে একটি সিদ্ধান্ত নেয় যে মহাসচিবের কাজের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। তবে তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণ সভা ইচ্ছে করলে কার্যকালের মেয়াদ বাড়াতে পারে।

কার্যাবলী—

সনদের ৯৮ ও ৯৯ ধারায় মহাসচিবের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা আছে। তবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট

কোন উল্লেখ নেই। প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) ও তার কার্যকরী পরিষদ মহাসচিবের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে—

১। সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী—

মহাসচিব রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন কাজকর্ম তদারক করেন ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেটাও তিনি দেখেন। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ রক্ষা করেন। সনদের ৯৮ ধারা অনুসারে মহাসচিব সংগঠনের কার্যাবলী সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সারা বছরে কি কি কাজ করেছে তা উল্লেখ করা থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম ও সদস্যদের নীতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে মহাসচিব তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন।

২। বিশেষ ধরনের (টেকনিক্যাল) কার্যাবলী—

মহাসচিব বিভিন্ন ধরণের টেকনিক্যাল কার্যও সম্পাদন করে। এইসব কার্যের মধ্যে রয়েছে আইনগত বিষয়ে রেকর্ড রাখা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমীক্ষা করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক হিসেবে মহাসচিব সমস্ত বিভাগের অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

৩। আর্থিক দায়িত্ব—

মহাসচিব বিভিন্ন আর্থিক দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ সভার কাছে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাজেট পেশ করেন। কোন বিভাগের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হবে তা মহাসচিব স্থির করেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে যা অর্থ পাওনা তা তারা ঠিকমত দিচ্ছে কি না, সেদিকেও লক্ষ রাখেন মহাসচিব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত বিভাগ ও বিশেষ সংস্থার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যাতে আর্থিক সমস্যার মধ্যে না পড়ে সেদিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়।

৪। সচিবালয় সংগঠন ও প্রশাসন—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব সচিবালয়ের সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন তদারক করেন। সচিবালয় যদি ভাল কাজ করতে পারে, সেখানে যদি ভাল কর্মী থাকে এবং মহাসচিব যদি সঠিকভাবে তা পরিচালনা করতে পারেন তাহলে সচিবালয়ের সুনাম হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয়ে বিভিন্ন দেশের কর্মচারীরা ও আধিকারিকরা কাজ করেন। এইসব কর্মচারী ও আধিকারিকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রাখার দায়িত্ব তাঁরই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করার সময় তাদের নৈপুণ্য, যোগ্যতা ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ রাখেন। কর্মচারী নিয়োগের সময় মহাসচিবকে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

৫। প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকে কিছু প্রতিনিধিমূলক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ও সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা একটি প্রধান কাজ। তাঁকে আইন সংক্রান্ত কাজও করতে হয়। সমস্ত রকম আলোচনার সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় এমন দেশ ও অন্যান্য আন্তসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি কোন বিষয়ের ওপর আবেদন করতে পারেন।

৬। রাজনৈতিক কার্যাবলী—

মহাসচিবকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য সম্পাদন করতে হয়। সাধারণ সভা ও অছি পরিষদের যে আলোচ্যসূচি থাকে, তার মধ্যে মহাসচিব যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। মহাসচিব প্রতিটি বিভাগের আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করেন। তিনি সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের ওপর যে কোন লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি পেশ করতে পারেন। সাধারণ সভার

কমিটিগুলির কাজকর্ম তদারক করার দায়িত্ব তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে। কমিটিগুলির মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে তাদের প্রস্তাব তৈরি করে।

সনদের ৯৯ ধারা অনুসারে মহাসচিব আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবে এমন কোন বিষয়ের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সনদের ৯৮ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে কোন বিভাগ মহাসচিবের হাতে অন্যান্য দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। ১৯৫০ সালে গৃহীত "শান্তির জন্য ঐক্য" প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ সভা মহাসচিবের ওপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবগণ সনদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার জন্য নিজেদের উদ্যোগে বহু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষীবাহিনী ও শান্তি পর্যবেক্ষণ মিশনের কার্যাবলী মহাসচিবের ক্ষমতা প্রসারিত করেছে। প্রত্যেক শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজকর্মের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন বিভাগ মহাসচিবকে বিশেষ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে মহাসচিবগণ শান্তিরক্ষী বাহিনী পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণমূলক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা করেছেন। মহাসচিবগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করেন। মহাসচিবগণ নীরব কূটনীতি পরিচালনার মাধ্যমে মূল্যবান কার্য সম্পাদন করেন।

মূল্যায়ন—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত হন। এর ফলে মহাসচিব তাদের স্বার্থরক্ষা করার দিকটা বড় করে দেখেন। মহাসচিব ও তার সচিবালয়ের কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মহাসচিব নিয়মকানুন ও ফাইলপত্রের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেন। সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার মতন ব্যক্তিত্ব মহাসচিবের থাকে না। থাকলেও অনেকসময় কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। মহাসচিবের কাজকর্ম আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

তবে মহাসচিবরা যে কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, তার জন্য সমস্ত দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতা এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। মহাসচিবের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য সেই সময়কার বিভিন্ন ঘটনার মূল্যায়ন করা দরকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মহাসচিবগণ যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন তা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে প্রতিপন্ন হবে।

সচিবালয় ঃ—

গঠন—

একজন মহাসচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে এই সচিবালয় গঠিত হয়। একথা বলা হয়েছে সনদের ৯৭ ধারায়। মহাসচিব ছাড়া সুস্পষ্টভাবে অন্যান্য কোন সচিবের কথা বলা হয়নি। এই ধারায় বলা হয়েছে যে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী মহাসচিবকে নিযুক্ত করবে সাধারণ সভা। সনদে সচিবালয়ের গঠন, পদাধিকারীর সংখ্যা, ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন প্রকারের আলোচনা নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সচিবালয়ের মহাসচিবের আট ধরনের বিভাগ আছে। সচিবালয় আবার বিভিন্ন দপ্তরে বিভক্ত। মহাসচিবের অধীনে এগারজন উপ-মহাসচিব (Under Secretaries General) এবং পাঁচজন সহকারী মহাসচিব (Assistant Secretaries General) থাকে। সচিবালয়ের কাজকর্ম যাতে ভালভাবে সম্পাদন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী থাকে। সাধারণ সভা কর্তৃক কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে মহাসচিব এই সমস্ত কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন।

সচিবালয়ের কর্মচারীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হল উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা যেমন মহাসচিব ও তাঁর সহকারীরা। দ্বিতীয়টি হল বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা। তৃতীয়টি হল সাধারণ কর্মচারী। সচিবালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। সচিবালয়ের কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত যেসব অভাব অভিযোগ থাকবে তা মীমাংসার জন্য একটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আছে।

১৯৪৫ সালের প্রস্তুতি কমিশন সচিবালয়কে ভালভাবে সংগঠিত করার উপর জোর দেয়। সচিবালয়ের যে আটটি দপ্তর বর্তমানে আছে সেগুলি হল—

- নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত দপ্তর (Security Council Affairs Department)
- অর্থনৈতিক দপ্তর (Economic Affairs Department)
- সামাজিক দপ্তর (Social Affairs Department)
- অছি সংক্রান্ত দপ্তর (Trusteeship and Information Department form Non Governing Territories)
- জনতথ্য দপ্তর (Public Information Department)
- আইন দপ্তর (Legal Department)
- সাধারণ কার্যাবলী সংক্রান্ত দপ্তর (Conference and General Services Department)
- প্রশাসনিক ও আর্থিক দপ্তর (Administrative and Financial Services Department)

মহাসচিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কর্মচারী নিয়োগ করার। সনদের ১০১ ধারা অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগের সময় উচ্চমানের দক্ষতা, যোগ্যতা ও চারিত্রিক সংহতির দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। কর্মচারী নিয়োগের সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক নিতে হবে। ১৯৬২ সালে সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে কর্মচারী নিয়োগের সময় সদস্যদের অবদান ও জনসংখ্যার দিকেও দৃষ্টি রাখা হবে।

কর্মচারীদের বিভাগ, নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ও অন্যান্য ভাতা সংক্রান্ত একটি নিয়মাবলী আছে। এ ব্যাপারে মহাসচিবকে সাহায্য করে একটি আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস উপদেষ্টা বোর্ড। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বেশীরভাগ কর্মচারী অস্থায়ী ও এক বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত হয়। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাকে অনেকাংশে আয়কর মুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য। ১৯৪৮ সালে পেনশন ফান্ড স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চমানের শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি Training and Research Institute স্থাপন করা হয়েছে। সচিবালয়ের কর্মচারীদের বিশ্বস্ততা ও বিবেকের সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মচারীদের সুবিধা ও অব্যাহতি সম্বন্ধে একটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে (Connection on Principles and Immunities)।

১৯৪৬ সালের কনভেনশন অনুযায়ী মহাসচিব, উপমহাসচিবগণ ও তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানেরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কূটনৈতিক দূতেরা যেসব সুবিধা ভোগ করে সেইসব সুবিধা পাবেন। সচিবালয়ের আধিকারিকগণ সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় যেসব লিখিত ও মৌখিক বিবৃতি দেবেন তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কর্মচারীরা তাদের বেতন ও ভাতা বিষয়ে অব্যাহতি ভোগ করে। তারা ইমিগ্রেশান সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে অব্যাহতি ভোগ করে।

কার্যাবলী—

সাধারণ সভার অধিবেশন যখন চলে তখন সচিবালয় সাধারণ সভার কার্য সম্পর্কে প্রাত্যহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, কার্যবিবরণী সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংরক্ষণ

করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আইন সংক্রান্ত নথিপত্র সচিবালয় প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সাধারণ সভায় যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় বা সুপারিশ করা হয় তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব সচিবালয়ের। সচিবালয় একটি তথ্য বিভাগ পরিচালনা করে। এই তথ্য বিভাগ নানা ধরনের পরিসংখ্যান ও তথ্য পাঠায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনকে যাতে তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। আবার জনতথ্য বিভাগ বিভিন্ন ধরনের তথ্য নিয়ে পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশ করে। তথ্য সংগ্রহ করা, বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তা সরবরাহ করা সচিবালয়ের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সচিবালয়ের কিছু কর্মচারীকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা যায়। সচিবালয় অনগ্রসর বা উন্নয়নশীল দেশে কারিগরী বিশেষজ্ঞ পাঠায়। অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ব্যাপারে চিঠিপত্র দেয়। যার ফলে অর্থনৈতিক ও রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয়কে কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। দরকার পড়লে কোন রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে হয়। সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে সচিবালয়ের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত সচিবালয়ের দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয়কে নিতে হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন, যোগাযোগ, নিরাপত্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা সচিবালয়কে করতে হয়।

মূল্যায়ন—

বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজকর্ম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সচিবালয়ের কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে। যার ফলে সচিবালয়ের উপর চাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সচিবালয় এই দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছে।

২.৮ সারাংশ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল বিভাগগুলি হল—সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, আর্থনীতিক-সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং মহাসচিব ও তাঁর সচিবালয়।

সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত সাধারণ সভা বিশ্ব জনমত গঠন, প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছাড়াও সাধারণ সভার কয়েকটি বিশেষ সংস্থা আছে যেমন—আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল, উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিকাশ কর্মসূচী ইত্যাদি। সাধারণ সভায় প্রতি সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোটাধিকার আছে। সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ে আলোচনা করার ও প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার সাধারণ সভার আছে। উপরন্তু অন্যান্য বিভাগের তদারকির দায়িত্ব সভার ওপর দেওয়া হয়েছে। সনদ সংশোধনের ক্ষমতাও এই সভার আছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার কাজ প্রশংসনীয়।

পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র ও দশটি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে (ভেটো), যার মাধ্যমে পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত করা যেতে পারে। এই পরিষদের প্রথম কাজ হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সেজন্য প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ও সুপারিশ আবশ্যক। রাষ্ট্রসঙ্ঘে নতুন সদস্য গ্রহণের বা কোন সদস্যরাষ্ট্রকে বহিষ্কারের জন্য পরিষদকে সাধারণ সভার

কাছে সুপারিশ করতে হয়। সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের কাজে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ৫৪টি সদস্যরাষ্ট্র তিন বছরের মেয়াদে অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিষদের সদস্য হয় সাধারণ সভার ভোটের মাধ্যমে। এই পরিষদ সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ে সমস্যা সম্বন্ধে এই পরিষদ সমীক্ষা করে এবং তার ভিত্তিতে সাধারণ সভা বা বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাছে সুপারিশ করে।

অছি পরিষদ গঠিত হয় বিশ্বের অছি অঞ্চলগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র এবং সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত কিছু সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে। এর প্রধান কাজ হল অছি এলাকার জনগণের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন ও তাদের স্বশাসনের পথে অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত মোট পনেরোজন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হয়। সাধারণত নয় বছরের মেয়াদে আইনজ্ঞদের বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। এই বিচারালয়ের ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক এবং উপদেশাত্মক এক্তিয়ার আছে এবং এর রায় সবসময়েই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। সদস্যরাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় এই বিচারালয়ের কর্তৃত্ব না মেনে নিলে এর কিছু করার থাকে না। সনদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এর কোন ক্ষমতা নেই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভার ভোটের মাধ্যমে। তাঁর নেতৃত্বাধীন সচিবালয়ের সাহায্য নিয়ে মহাসচিব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সবরকম প্রশাসনিক এবং বিশেষ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।

২.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ—

১। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান বিভাগগুলির নাম লিখুন।
২। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম লিখুন।
৩। ভেটো ক্ষমতা কথাটির অর্থ কি?
৪। সাধারণ পরিষদের সভাপতির কার্যকাল কত?
৫। কয়টি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য? তাদের কিভাবে নির্বাচন করা হয়?
৬। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতির সংখ্যা কত? তাঁদের কিভাবে নিয়োগ করা হয়?
৭। মহাসচিব কিভাবে নিযুক্ত হন?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ—

১। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন। এই সংস্থাটির কি কি দুর্বলতা আছে?
২। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার ক্ষমতা ও দায়িত্বের তুলনামূলক আলোচনা করুন?
৩। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
৪। অছি পরিষদ গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন এবং এর কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৫। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠন ও এক্তিয়ার আলোচনা করুন।
৬। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৭। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে প্রধান পাঁচটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Rumki Basu. **The United Nations**, Sterling Publishers. New Delhi, 1993.

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, World Press, Calcutta, 2000।

৩। অনাদিকুমার মহাপাত্র, আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৫।

৪। H. Nicholas, **The United Nations as a Political Institution**, OUP, London, 1975.

একক ৩ □ শান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক ভূমিকা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩.১ শান্তি রক্ষার ধারণা; বিশ্ব রাজনীতি ও জাতিপুঞ্জ

৩.৩.২ শান্তি রক্ষা বলতে কি বোঝায়

৩.৩.৩ জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার প্রয়াস

৩.৪.১ শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব

৩.৪.২ শান্তি রক্ষায় সাফল্যের শর্ত

৩.৫.১ শান্তি সৃজন ও শান্তি নির্মাণ

৩.৫.২ শান্তি রক্ষায় জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক ভূমিকা

৩.৫.৩ একটি মূল্যায়ন

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক বিবাগ—সংঘর্ষ এক সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই বা তার বেশি দেশ যেমন আঞ্চলিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে; কোন দেশের সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যেও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, শুরু হতে পারে গৃহযুদ্ধ। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়াসে সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন আঞ্চলিক সংঘর্ষগুলি মিটবে বা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি বিরাজ করবে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করে থাকে, শান্তিরক্ষী বাহিনী দিয়ে শান্তিরক্ষা এমনই এক কৌশল। এই এককটি থেকে আপনি

- শান্তি রক্ষা বা Peacekeeping-এর ধারণা সম্পর্কে জানবেন।
- জাতিপুঞ্জের প্রাসঙ্গিক প্রয়াসগুলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে।
- সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- জাতিপুঞ্জের সাফল্য অসাফল্যের কথা বিবেচনা করে বিশ্বশান্তি রক্ষার সমস্যাগুলি বুঝবেন এবং স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও শান্তি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বিচার করতে পারবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা (আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখা)

বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অনেক যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চায়। জন্মলগ্ন থেকেই জাতিপুঞ্জ যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে একটি হল শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি রক্ষা।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন আছে। কোথাও কোথাও সাফল্যের সঙ্গে তাদের কাজ শেষ হয়েছে, কোথাও কোথাও অবশ্য শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ সফল হয় নি। কিন্তু তবুও বলপ্রয়োগের পরিবর্তে শান্তি রক্ষার ধারণাটি সাধারণভাবে সমাদৃত।

শান্তি রক্ষার প্রয়াসগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু বিতর্ক। সময়ের সাথে সাথে শান্তিরক্ষার ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং এই এককে আমরা প্রথমে শান্তি রক্ষার ধারণা আলোচনা করে নেব, লক্ষ্য করব জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রয়াস এবং পরিশেষে বিচার করব সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষার গতিপ্রকৃতি।

৩.৩.১ শান্তি রক্ষার ধারণা ঃ বিশ্ব রাজনীতি ও জাতিপুঞ্জ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিভিন্ন কারণে দু'টি বা তার বেশি দেশের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার ফল ভালো হয় না, ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূল বিবাদের সুষ্ঠু সমাধানও হয় না। বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া ও সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াই কাম্য। সালিশী, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি, আলাপ-আলোচনা; মধ্যস্থতা ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে শান্তির পথে বিবাদের মীমাংসা সম্ভব। কোনো দেশ যদি শান্তির পথ উপেক্ষা করে আর একটি দেশকে আক্রমণ করে, তা সরাসরি আগ্রাসন বলে অভিহিত হবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আক্রান্ত দেশটির সাহায্যে আগ্রাসী দেশটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। যেহেতু এখনও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোনো সামরিক বাহিনী নেই, সভ্য দেশগুলি জাতিপুঞ্জকে অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করবে। এই ব্যবস্থা সম্মিলিত বলপ্রয়োগ (Collective Enforcement) নামে পরিচিত। আগ্রাসী দেশটিকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা হবে জাতিপুঞ্জের নির্দেশাবলী মেনে নিতে।

আজকের দুনিয়ায় সরাসরি আগ্রাসনের ঘটনা কমই ঘটে বরং অঘোষিত যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছে। কখনো কখনো বাইরের কোন তৃতীয় শক্তির প্ররোচনায় বা মদতে সীমিত গোষ্ঠী সংঘর্ষ আরো ছড়িয়ে পড়ে আর আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত করে। এক্ষেত্রে আগ্রাসী শক্তিটিকে স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যায় না, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে সম্মিলিত বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে সাংবিধানিক এবং ব্যবহারিক সমস্যা থাকে। এই প্রসঙ্গে শান্তি রক্ষা (Peace keeping) ধারণাটি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

৩.৩.২ শান্তি রক্ষা বলতে কি বোঝায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনী সভ্য দেশগুলির সৈন্যবাহিনী থেকে এলেও (তারা তখন জাতিপুঞ্জের প্রতীক, ইউনিফর্ম এবং পতাকা ব্যবহার করে) তাদের মূল উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ করে সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটানো নয়। কেননা বলপ্রয়োগ সবসময়ই বিতর্কমূলক। যদিও এটা ঠিক যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এর অর্থ হল দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষের নিরসন বা সুষ্ঠু সমাধান। বাস্তবে দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রীয় বিবাদ বা সংঘর্ষগুলির একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার, বিবাদরত দেশ বা গোষ্ঠীগুলির ওপর জোর করে একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়াও মুশকিল।

অথচ দেশীয় বিবাদগুলিকে সীমিত রাখতে না পারলে, সেগুলির সমাধানের পথে তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা না নিতে পারলে, ক্রমে ক্রমে এই বিবাদ-সংঘর্ষ বিশ্বশান্তির অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলির অস্ত্র ব্যবহার ও সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটলে সমস্যার পূর্ণ ও চূড়ান্ত সমাধান পেতে প্রয়োজন এক নিরপেক্ষ শক্তির তত্ত্বাবধান। শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতিপুঞ্জের সনদে কিন্তু Peace keeping (বাংলায় শান্তিরক্ষা অর্থে ব্যবহৃত) শব্দটি পাওয়া যায় না। বস্তুত সনদে বলা হয়েছে যে যদি কোন দেশ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে তবে তার বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের তরফে সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করা হবে। কোন বিবাদ-সংঘর্ষ যদি বিশ্বশান্তি নাশের কারণ হয়ে ওঠে; সেক্ষেত্রেও সম্মিলিতভাবে সেই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারবে এবং বলপ্রয়োগ করে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস করা হবে। শান্তিরক্ষার ধারণাটি কিন্তু এর থেকে সামান্য পৃথক। এখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী দু'টি বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝখানে এক নিরপেক্ষ শক্তি যারা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে। এই শান্তির বাতাবরণে সমস্যার সমাধান খুঁজে নেওয়া বিবদমান গোষ্ঠীগুলির কাজ। শান্তিরক্ষী বাহিনী কোন পক্ষের সঙ্গেই সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। সংঘর্ষের সমাপ্তি থেকে শুরু করে একটা সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত এই সাময়িক পর্যায়ে শান্তি বজায় রাখাই শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ। একদিকে শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি যেমন সংঘর্ষের তীব্রতা কমিয়ে আনে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনও থাকে না। সুতরাং সনদ বহির্ভূত শান্তিরক্ষার এই কৌশলটি সাধারণভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন মহাসচিব পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শান্তি রক্ষার ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জকে কোনো পক্ষই নিতে হয় না। যেহেতু কোনো গোষ্ঠী বা দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সুতরাং জাতিপুঞ্জের পক্ষে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ সাধারণভাবে শান্তি বজায় রাখা, বিবদমান গোষ্ঠীর কোনো একটিরও স্বার্থসাধন নয়। কোনো একটি বিশেষ আঞ্চলিক সংঘর্ষে যদি কোনো দেশের স্বার্থ থেকে থাকে বা ঘোষিত নীতি থেকে থাকে তবে সেই দেশের সৈন্য বাহিনী থেকে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সৈন্য নেওয়া হয় না। কেননা বিবদমান দেশ বা গোষ্ঠীগুলির কাছে শান্তিরক্ষী বাহিনী গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেই একমাত্র তা সম্ভব। শান্তিরক্ষী বাহিনী 'ব্লু হেলমেট' (Blue Helmets) নামে সমধিক পরিচিত।

৩.৩.৩ জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার প্রয়াস

শান্তি রক্ষার প্রয়াসের একটি দিক হিসেবে যদি পর্যবেক্ষক দল (Observation Mission) প্রেরণ আমরা আলোচনার মধ্যে আনি তবে দেখব ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগ থেকেই জাতিপুঞ্জের এই প্রয়াস শুরু হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যা অথবা সুয়েজ সংকটে, লেবাননে, কঙ্গোয়, সাইপ্রাসে, ইরান, ইরাক যুদ্ধে বিভিন্ন দশকে জাতিপুঞ্জ শান্তিরক্ষা বাহিনী অথবা পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছে। বাস্তবিক ১৯৯০-এর দশকে ইরাক-কুয়েত সমস্যায়, এল সালভাদরে, অ্যাঙ্গোলায়, কম্বোডিয়ায়, সোমালিয়া এবং মোজাম্বিকে, উগান্ডা, রাওয়ান্ডায়, হাইতিতে, জর্জিয়া, লাইবেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং ম্যাসিডোনিয়ায় জাতিপুঞ্জ শান্তিরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে। Observation Mission-এর ক্ষেত্রে যে দল পাঠানো হয় তাদেরও মুখ্য কাজ পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং শান্তির বাতাবরণ বিঘ্নিত হচ্ছে কি না দেখা। তবে সভ্যরা সংখ্যায় অল্প হন, সশস্ত্র থাকেন না এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীর মতো দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মাঝখানে এসে তাদের পৃথক করেন না। এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি সমস্যাই এক ধরনের নয় এবং সাধারণভাবে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব বর্তালেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষী বাহিনীকে বিভিন্ন বিশিষ্ট কাজের ভার নিতে হয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে কসোভো, সিয়েরা লিয়ন, পূর্ব তিমোর অঞ্চলে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্ব পায়। তবে যে কোনো অবস্থাতেই শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশের অধীন থাকবে, সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না আর বিবদমান গোষ্ঠীগুলির প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করবে।

৩.৪.১ শান্তি রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব

প্রচলিত অর্থে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ শুরু হয় তখনই যখন যুযুধান দেশ বা গোষ্ঠীগুলি সশস্ত্র সংঘর্ষের বিরতি ঘটিয়ে একটু সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। তা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কোনো শান্তি চুক্তি হতে পারে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো দেশে সর্বজনগ্রাহ্য এক সরকার গঠনও হতে পারে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ যুদ্ধ বিরতির পর যে ভঙ্গুর শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হল তা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা যাতে কোনো কারণে ফের সংঘর্ষ শুরু না হয়ে যায় এবং যে সমস্যার সমাধানের কথা ভাবা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে বিব্রত এবং বিপন্ন সাধারণ মানুষের কাছে শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি তাই কাম্য কেননা বিপৎকালে ত্রাণ কার্যের ভার শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

বর্তমান দুনিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করেন যে শান্তি রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব আরো খানিকটা বাড়ানো সম্ভব। দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধার পর নয়, তার আগেই সম্ভাব্য পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সীমান্ত অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটা সংকট তৈরি হলে তার নিরসন নয়, সংকট সৃষ্টি হবার আগেই তা প্রতিহত করা শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ হবে। তেমনই, যে দেশে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন হতে সংশয় দেখা দেবে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা যাবে যারা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে। বাস্তবিক, নামিবিয়া ও কম্বোডিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনী ইতিপূর্বেই সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করেছে কিন্তু এখানে বিচার্য এই যে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আগেই শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হলে তা জাতিপুঞ্জের অনৈতিক এবং অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া হতে পারে।

সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিপন্ন সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় খাবার, ওষুধপত্র, ন্যূনতম পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াও শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ। মানবিক ত্রাণ সাহায্যের এই দায়িত্ব ১৯৯০-এর দশকে যুগোশ্লাভিয়া সংকট এবং সোমালিয়া সমস্যায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

শান্তিরক্ষা (Peace keeping) ধারণার সাথে সাথে বর্তমানে শান্তি সৃজন (Peace keeping) এবং শান্তি নির্মাণ (Peace keeping) ধারণার উদ্ভবের ফলে শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের প্রসার ঘটেছে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন, কসোভো এবং পূর্ব তিমোরে) উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে শান্তিরক্ষী বাহিনীকে সাময়িকভাবে দৈনন্দিন শাসন কার্য পরিচালনা করতে হয়েছিল। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাম্প্রতিক ভূমিকা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব।

৩.৪.২ শান্তিরক্ষায় সাফল্যের শর্ত

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে শান্তি রক্ষার সবগুলি প্রয়াসই যে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা নয়। দেখা গেছে যে যুযুধান পক্ষগুলি যদি দু'টি দেশ হয় তবে শান্তি রক্ষার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। মোটামুটি স্বীকৃত একটা সীমান্ত রেখার দু'পাশে দুটি পক্ষকে পৃথক করে অস্ত্র প্রয়োগ থেকে সংযত রাখা সাধারণভাবে সম্ভব। গৃহযুদ্ধ বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কিন্তু এ কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো একটা সীমারেখার দু'দিকে বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে পৃথক করা যায় না, একই অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠী বসবাস করতে পারে ফলে ছোটখাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকে। দু'টি দেশ যখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি স্বীকার করে নেয়, তখন শান্তি রক্ষায় তারা সহযোগিতা করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে সব সময় দু'টি যুযুধান পক্ষই থাকবে এমন নয়। প্রধান দু'টি পক্ষ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হলেও অপ্রধান কিছু গোষ্ঠী গেরিলা যুদ্ধ বা সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিবদমান পক্ষগুলির সহযোগিতা শান্তি রক্ষার প্রয়াসে সাফল্যের এক অন্যতম শর্ত। তাছাড়াও, দু'টি বা তার বেশি দেশের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, যতটা না গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে।

একইভাবে বলা যায় যে শান্তিরক্ষী বাহিনী যদি এমন এক অঞ্চলে মোতায়েন হয় যেখানে দু'টি বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝখানে একটা নিরাপদ দূরত্ব আছে, যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তগুলি সহজেই নজরে রাখা যায় এবং শান্তিরক্ষী বাহিনী কোনো পক্ষেরই আক্রমণের লক্ষ্য নয় সেক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রয়াসে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। এর অন্যথা হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। যেখানে যুযুধান পক্ষের লোকজনদের পৃথকীকরণ করা যায় না; গুপ্তহত্যা, বোমা বিস্ফোরণ, ছোটো ছোট স্বল্পকালীন সংঘর্ষ হতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিরক্ষী বাহিনীও আক্রান্ত হয়, সেখানে রক্ষার প্রয়াস সফল হয় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শান্তিরক্ষী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিত হতে হবে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা কোনো এক পক্ষের স্বার্থ সাধনের সহায়ক তাহলেই অপরপক্ষ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)-এর অবসানে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে জাতিগত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ও সংঘর্ষ। এই সব বিবাদের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী বাহিনী তখনই প্রেরণ করা যায় যখন মূল যুযুধান পক্ষগুলি কোনো একটা সমঝোতায় আসে এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ হবে সেই সমঝোতার সফল বাস্তবরূপ দেওয়া। তা না হলে শান্তিরক্ষী বাহিনী বিবদমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে যা শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ নয়।

বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমঝোতা যদি প্রকৃত অর্থে না আসে শান্তিরক্ষী বাহিনী এক বিপদজনক পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। যেমন, সিয়েরা লীয়নে দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি হয়েছিল এবং ১৯৯৯ সালে এক শান্তিরক্ষী বাহিনী সেই চুক্তি বাস্তবায়িত করতে সেখানে পৌঁছয়। সঠিক অর্থে সিয়েরা লীয়নের শাসন কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্রোহীরা এই চুক্তির কোনো দামই দেয় নি। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এক ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিজেদের প্রাণ রক্ষার খাতিরেই যুদ্ধে জড়িয়ে যান। বিদ্রোহীরা গায়নার রক্ষী বাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নেয়, জাম্বিয়া থেকে যারা আসে তাদের উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না যা দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনার পেশাদারী উৎকর্ষের ফলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

এই কারণে কেউ কেউ মনে করেন শান্তিরক্ষী বাহিনী তখনই প্রেরণ করা উচিত যখন যুযুধান পক্ষগুলি শান্তিস্থাপনে আগ্রহী হয়ে জাতিপুঞ্জের কাছে শান্তিরক্ষী বাহিনী চেয়ে পাঠাবে।

৩.৫.১ শান্তি সৃজন ও শান্তি নির্মাণ

জাতিপুঞ্জের মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস ঘালি (Boutros Boutros Ghali) ১৯৯২-এর তাঁর রচনায় (Agenda for Peace) কয়েকটি নতুন ধারণার ইঙ্গিত দেন। মোটামুটি ভাবে শান্তি সৃজন (Peace making) এবং শান্তি নির্মাণ (Peace building) ধারণা দু'টি তখন থেকেই শান্তি রক্ষার ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে। নতুন চিন্তাধারায় জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধক কূটনীতি বা Preventive Diplomacy'র ওপর। অর্থাৎ সংকট তৈরি হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দূর করতে হবে সে সব কারণ যা থেকে সমস্যা এবং সংকট তৈরি হয়। শুধুই রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সব কারণ থেকে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব ও বিবাদের পরিস্থিতি, বিচার করতে হবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। বিবাদ সংকুল পরিস্থিতিতে নিতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস উদ্রেককারী কিছু ব্যবস্থা (Confidence building Measures) যাতে এক শান্তির বাতাবরণ তৈরি হতে পারে।

শান্তি সৃজন (Peace making) বলতে সাধারণভাবে বোঝায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া যে কোন বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান। জাতিপুঞ্জ বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করতে এবং আলোচনার অগ্রগতিতে সহায়ক হতে পারে, প্রয়োজনে বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারে, সমস্যা সমাধানের নানান উপায় বাৎলাতে পারে। শান্তি রক্ষার সাথে সাথে শান্তি সৃজন জরুরী এই কারণে যে দেখা গেছে কখনো কখনো শান্তিরক্ষী

বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি, বিরোধী পক্ষগুলির পক্ষে কোনো চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছন সম্ভব হয়নি। অবস্থার যাতে অবনতি না হয় তার জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনীকে সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকতে হয়েছে, সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় নি বলে তাদের কাজও ফুরোয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৬৪ সাল থেকেই সাইপ্রাসে শান্তিরক্ষী বাহিনী মজুত আছে। সংঘর্ষ না চললেও সাইপ্রাস সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখনও হয়ে ওঠে নি। স্বাভাবিক ভাবেই এর একটা আর্থিক চাপ জাতিপুঞ্জের ওপর পড়ে। সুতরাং শান্তি সৃজন শান্তি রক্ষার প্রয়াসের এক অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠছে।

শান্তি নির্মাণ (Peace building) জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষী বাহিনীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন মত মহাসচিব বুত্রোস খালি পোষণ করেছেন। যেখানে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে সেখানে সুস্থ জীবনের পুনরুদ্ধার ও মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। সরিয়ে দিতে হবে সাধারণ জীবন যাপনের পক্ষে অসুবিধাকর অবাঞ্ছিত বাধা নিষেধ অথবা বিপজ্জনক যুদ্ধ উপকরণ, যেমন, ল্যান্ড মাইন। চলবে ত্রাণকার্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে, নিরাপদ অঞ্চলে (safe havens) রক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে আশ্রয় দিতে হবে। স্পষ্টতই, পরিবর্তিত ধারণার সাথে সাথে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ ও দায়িত্ব অনেকটাই প্রসার পেয়েছে।

৩.৫.২ শান্তি রক্ষায় জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক ভূমিকা

হিসেব নিলে দেখা যাবে ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে ১৯৮০'র দশক পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যতগুলি শান্তিরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক প্রয়াস শুধুমাত্র ১৯৯০-এর দশকেই নেওয়া হয়েছে। এর থেকে দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যায়। এক) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানে দুনিয়া ব্যাপী অস্থিরতার পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক সংঘর্ষ অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং দুই) শান্তি রক্ষার ধারণাটি এখন অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হচ্ছে এবং জাতিপুঞ্জ ঘন ঘন ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করছে না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে দু'টি বৃহৎশক্তির (আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) রেষারেষির ফলে জাতিপুঞ্জ অনেক সময়ই বিভিন্ন সংকটে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অপারগ হত। সেই বৈরী সম্পর্কের তীব্রতা না থাকার ফলে এখন জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়েছে।

শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যভারও বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন প্রেরিত মিশনের নাম থেকেই তার বিভিন্নতা বা ব্যাপকতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৯৯০-এর দশকে প্রেরিত কয়েকটি মিশনের নাম উদাহরণ হিসেবে এখানে দেওয়া যায়। যেমন, ১৯৯১ সালে প্রেরিত United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, (MINURSO), ১৯৯২-৯৩-এ United Nations Trasitional Authority in Cambodia (UNTAC), ১৯৯২ সালে ক্রোয়েশিয়ায় প্রেরিত United Nations Protection Force (UNPROFOR), ১৯৯৫-এ নতুন একটি মিশন United Nations Confidence Restoration Operation (UNCRO) এর জায়গা নেয়, এছাড়াও ১৯৯৫ সালে প্রেরিত হয় United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDEP) ম্যাসিডোনিয়াতে, এখানে যে সামান্য কয়েকটি মিশনের নাম দেওয়া হল তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কখনো গণভোট (referendum), কখনো পরিবৃত্তিকালীন কর্তৃত্ব (transitional authority), কখনো প্রতিরক্ষা (protection), কখনো বিশ্বাস পুনরুদ্ধার (confidence restoration) এবং কখনো প্রতিরোধক সেনা সমাবেশ (Preventive deployment)—ইত্যাদি কত ধরনের কাজের দায়িত্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর বর্তায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, শান্তিরক্ষী বাহিনী কী এই সব ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত? সমস্যাগুলি এমনই যে এর জন্য বিশে, ধরনের প্রশিক্ষণ জরুরী। স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন মধ্যস্থতা করার মানসিকতা। বিভিন্ন দেশের সৈন্যবাহিনী থেকে সৈন্য নিয়ে যে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয় তাদের এ ধরনের প্রশিক্ষণ থাকে না বললেই চলে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের অস্ত্র-শস্ত্র, প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ধরনের হয়, একত্রে

কাজ করার পথে যা অন্তরায় হতে পারে। দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলি (যাদের অস্ত্রশস্ত্রের মান উন্নত এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণও উঁচু দরের) শান্তি রক্ষার প্রয়াসে সেনা পাঠাতে খুব একটা আগ্রহী নয়। বরং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিই প্রধানত শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনা প্রেরণ করে। উন্নতিশীল এই দেশগুলির সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রশিক্ষণগত মান সবক্ষেত্রেই উন্নত হয় না। জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সর্বাপেক্ষা বেশি সেনা প্রেরণ করে ভারত এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সেনারা পারদর্শিতার প্রমাণ রেখে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু তাই বলে সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্ব বা গুণগত উৎকর্ষ এক নয়।

শুধু সৈন্যদলই নয়, শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের প্রসারের সাথে সাথে প্রয়োজন পড়ে অসামরিক পেশাদারী ব্যক্তিবর্গের। যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত কোনো অঞ্চলে নতুন করে গণতন্ত্র এবং স্বশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে (যেমন, কসোভোতে), অথবা এমন কোনো অঞ্চলে যেখানে বাস্তব অর্থে কোনো শাসন কর্তৃপক্ষই নেই (পূর্ব তিমোরে), শুধুমাত্র সামরিক ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ চলে না। সুতরাং শান্তি রক্ষী বাহিনীর গঠনই একটু পাল্টে যেতে চলেছে।

যেখানে শান্তি রক্ষী বাহিনী যুযুধান গোষ্ঠীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে যায় অথবা নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে সমস্যায় পড়ে, সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা যেতে পারে তা স্থির করা মুশকিল। কেন না প্রথাগত ভাবে শান্তিরক্ষী বাহিনী একটা নিরপেক্ষ শক্তি, বিবদমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া তাদের কাজ নয়। কসোভোতে এমনই এক সমস্যা থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনীকে উদ্ধার করে NATO (North Atlantic Treaty Organization) নামক সামরিক মৈত্রীসংঘের সৈন্যদল। কিন্তু তা সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। বরং বিতর্কমূলক।

যত বেশি শান্তি রক্ষার প্রয়াস চলবে, তত বেশি আর্থিক দায়িত্বে জাতিপুঞ্জ জড়িয়ে যাবে। যখন জাতিপুঞ্জকে দেয় অর্থ সভ্য দেশগুলি বকেয়া ফেলে রাখে তখন এই আর্থিক দায়ভার মেটানো আরো কঠিন হয়ে পড়ে। বাস্তবিক, আর্থিক অস্বচ্ছলতা শান্তি রক্ষার প্রয়াসে এক অন্তরায়। ব্যাপকতর শান্তি রক্ষার প্রয়াস এই পরিস্থিতিতে কতটা সফল হতে পারে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

শান্তি সৃজন, শান্তি নির্মাণ, শান্তি রক্ষা সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সংঘর্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিপন্ন সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে তা জাতিপুঞ্জের, মানবিক কারণে হস্তক্ষেপের (humanitarian intervention) সামিল। জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব কোফি আন্নান (Kofi Annan) যখন মানবিকতার কারণে হস্তক্ষেপের প্রযোজনীয়তার কথা বলেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তা ভালভাবে নেয়নি। তাদের বক্তব্য ছিল যে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি বৃহৎ শক্তি (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) প্রধানত স্থির করে কখন, কোথায়, কি ভাবে এই হস্তক্ষেপ করা হবে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থসাধনে জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করা হতে পারে, কম শক্তি সম্পন্ন দেশগুলির জাতীয় নিরাপত্তা বা সার্বভৌমতাও বিঘ্নিত হতে পারে। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা স্থির করে যে মানবিক কারণে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করবে তখনই যখন সংঘর্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলের শাসন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের হস্তক্ষেপের আর্জি জানাবে।

কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে শান্তিরক্ষী বাহিনী উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছলে তাদের কি বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে মেনে নেবে? বরং শান্তিরক্ষী বাহিনীকেই তাদের স্বার্থসাধনের পরিপন্থী ভেবে আক্রমণের লক্ষ্য করতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ (enforcement) বা সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রথাগত শান্তিরক্ষার ধারণা থেকে বর্তমানে শান্তি রক্ষার প্রয়াস অনেকটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব শান্তি রক্ষী বাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে, অঞ্চল বিশেষে তাদের কাজের ভার এখন তিন ধরনের : এক) প্রথাগত শান্তি রক্ষা (traditional peace keeping), দুই) শান্তি সৃজন ও শান্তি নির্মাণ (peace making and peace building), এবং ৩) পরিপূর্ণ শাসনভার (full-scale administration)।

৩.৫.৩ একটি মূল্যায়ন

১৯৮৮ সালে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষা প্রয়াসকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি রক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, যে সব আঞ্চলিক বিবাদ আরো ছড়িয়ে পড়ে হয়তো বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারত। কিছু কিছু অঞ্চলে সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়তো হয় নি কিন্তু শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি মোটামুটি একটা স্থিতাবস্থার জন্ম দিয়েছে অথবা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করেছে। এর ফলে বিপন্ন সাধারণ মানুষের প্রাণরক্ষা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নামিবিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি মিশন সফল মিশন রূপে পরিগণিত।

যুযুধান গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতার অভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যায় নি। তার জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনীকে দায়ী করা যায় না। একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭৮ সালে জাতিপুঞ্জের এক শান্তিরক্ষী বাহিনী (UNIFIL) ইজরায়েল—লেবানন সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছয় সীমান্ত সুরক্ষিত করতে। লেবাননের যে অংশ ইজরায়েলের দখলে, তা থেকে ইজরায়েল হটে না এবং বিতর্কিত দক্ষিণ লেবাননের এই অংশে ইজরায়েলি সৈন্য এবং লেবানন গেরিলাদের সংঘর্ষ থেমে থেমে চলতেই থাকে। এমন কি ১৯৯৬ সালে কানা (Qana) গ্রামে UNIFIL আশ্রিত লেবাননের ১০০ সাধারণ মানুষ ইজরায়েলী গোলা বর্ষণে মারা যায়। যেহেতু সরাসরি সংঘর্ষে এ অঞ্চল থেকে ইজরায়েলী সৈন্য হটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীর নয়, সুতরাং শান্তিরক্ষী বাহিনী শুধুমাত্র প্রতীক্ষাই করতে পারে সেই শুভদিনের, যেদিন ইজরায়েল স্বেচ্ছায় এ অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যে (২০০০ সাল পর্যন্ত, ২২ বছরে) দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে ৮২ জন UNIFIL সৈন্যের মৃত্যু ঘটেছে।

এ ধরণের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই শান্তি রক্ষার ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। শান্তি সৃজন ও শান্তি নির্মাণ প্রথাগত শান্তি রক্ষার ধারণার সাথে জড়িয়ে গিয়েছে। তার ফলে অবশ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দায়িত্বও মাত্রাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সঙ্গে বেড়েছে আর্থিক চাপ। কিন্তু নানান অসুবিধের মধ্যেও শান্তি রক্ষার প্রয়াসে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য এসেছে।

সুতরাং বর্তমান দুনিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। একদল বলেন জাতিপুঞ্জের পক্ষে দুনিয়ার সব আঞ্চলিক সংঘর্ষ মেটানো সম্ভব নয়, সর্বত্র শান্তি নির্মাণ করাও মুশকিল। সুতরাং দ্রুত সাফল্য পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকলে, সেই আঞ্চলিক সংঘর্ষে জাতিপুঞ্জের জড়িয়ে না পড়াই ভালো। অর্থাৎ শান্তি রক্ষার প্রয়াস সীমিত রাখাই ভালো।

অন্য একদল বলেন যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরবর্তী জমানায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর গুরুত্ব বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আসন্ন ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্বের আরো প্রসার ঘটবে। তাঁরা বলেন সংঘর্ষের সময় তীরবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে নিরপেক্ষ দেশগুলির জাহাজ চলাচল যেন নিরাপদে হয় তার তদারকিও শান্তিরক্ষী বাহিনী করতে পারে। বিভিন্ন অস্ত্র সংবরণ চুক্তির (Arms Control Treaties) ধারাগুলি ঠিকঠাক মেনে চলা হচ্ছে কিনা, যাচাই করতে পারে তার সত্যতা। অর্থাৎ এঁদের মতে সারা বিশ্বে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত জাতিপুঞ্জের।

জাতিপুঞ্জ কতটুকু কি করতে পারবে তা নির্ভর করছে জাতিপুঞ্জের সভ্য দেশগুলির ওপর। কোন একটি দেশ এমন ভাবতেই পারে যে দূর-দূরান্তে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে তার কিছু এসে যায় না এবং সেই সংঘর্ষ থামাতে আর্থিক খরচ এবং সৈন্য প্রেরণ নিতান্ত অর্থহীন। বিশেষত জাতিপুঞ্জ অনেক ক্ষেত্রেই সৈন্য প্রেরণকারী দেশগুলির প্রাপ্য অর্থ বকেয়া ফেলে রাখে এবং সাধারণত যে সব দেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণ করে তারা অর্থনৈতিকভাবে খুব একটা স্বচ্ছল নয়।

সুতরাং আগামী দিনগুলিতে জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার প্রয়াস কোন পথে চলবে তা সভ্য দেশগুলিই ঠিক করবে। আঞ্চলিক সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে একদিকে যেমন শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের প্রয়োজন আছে অন্যদিকে এর কিছু

ধারণাগত, ব্যবহারিক এবং আর্থিক অসুবিধেও আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার নিরাপত্তা পরিষদে সীমিত না রেখে সাধারণ সভার হাতে ছেড়ে দিলে হয়তো দেশগুলির মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন হবে এবং ব্যবহারিক ও আর্থিক সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারবে। কিন্তু তার জন্য জাতিপুঞ্জের বর্তমান কাঠামো ও কার্যবিধির সংস্কার প্রয়োজন।

৩.৬ সারাংশ

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি। যে সব আঞ্চলিক সংঘর্ষ (আন্তর্জাতিক বা গৃহযুদ্ধ) বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে তার সুষ্ঠু সমাধান হোক, জাতিপুঞ্জের তাই কাম্য। এছাড়াও সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিপন্ন সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষাও এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে সংঘর্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলে জাতিপুঞ্জ এক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলি সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে নিতে পারে।

প্রথাগত শান্তি রক্ষার কাজ তখনই শুরু হয় যখন যুযুধান পক্ষগুলি সংঘর্ষের বিরতি ঘটায়। এক নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে শান্তিরক্ষী বাহিনী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের তদারকি করে। তা কোনো শান্তি চুক্তির বাস্তব প্রয়োগে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য সরকার গঠনও হতে পারে। সাধারণভাবে কোনো একটি পক্ষের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ নয় কিন্তু কখনো কখনো শান্তিরক্ষী বাহিনী আক্রান্ত হতে পারে।

প্রথাগত শান্তি রক্ষার সঙ্গে এখন শান্তি সৃজন ও শান্তি নির্মাণের ধারণাগুলি জড়িয়ে গিয়েছে। ফলে শান্তি রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের বৃদ্ধি ঘটেছে। মধ্যস্থতা, ত্রাণকার্য অথবা শাসন পরিচালনা— অঞ্চল বিশেষে এখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থিক সংকট, যত্রতত্র মানবিক কারণে হস্তক্ষেপ করার ব্যবহারিক অসুবিধা, বৃহৎ শক্তিগুলির নীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অবিশ্বাস ও সন্দেহ, শান্তি রক্ষার প্রয়াসে অন্তরায় হতে পারে। কিন্তু তবুও বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংঘর্ষের নিরসন ঘটিয়ে শান্তি বজায় রাখতে জাতিপুঞ্জ অনেকাংশেই সফল হয়েছে এবং অনুমান করা যায় যে নানান বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আসন্ন ভবিষ্যতেও জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার ভূমিকা বিশ্ব রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে।

৩.৭ অনুশীলনী

১। **বাক্যগুলির সত্যতা নির্ধারণ করুন ঃ—**

(ক) বিগত দশকে জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার প্রয়াস আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। হ্যাঁ/না

(খ) বিপন্ন মানুষের ত্রাণকার্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ/না

(গ) প্রধানত উন্নত দেশগুলি থেকে সেনা সংগ্রহ করে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। হ্যাঁ/না

(ঘ) গৃহযুদ্ধে বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী বাহিনীর শান্তি রক্ষার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। হ্যাঁ/না

২। **শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—**

(ক) জাতিপুঞ্জের শান্তি রক্ষার প্রয়াস নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় _____ সালে।

(খ) শান্তি রক্ষা (Peace keeping) এবং শান্তি সৃজন (Peace making) ধারণা দু'টির সঙ্গে জড়িত তৃতীয় ধারণাটি হ'ল _____।

(গ) শান্তি রক্ষা বাহিনী _____ নামে সমধিক পরিচিত।

(ঘ) বর্তমানে (২০০০ সালে) শান্তিরক্ষী বাহিনীর সর্বাধিক সেনা সংগ্রহ হয় _____ থেকে।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ—

(ক) প্রথাগত শান্তিরক্ষার ধারণাটি কি?

(খ) মানবিকতার কারণে হস্তক্ষেপ কাকে বলে?

(গ) শান্তিরক্ষা ও শান্তি নির্মাণের মধ্যে তফাত কোথায়?

(ঘ) শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরিত হয়েছে এমন পাঁচটি দেশের নাম করুন।

৪। শান্তিরক্ষার প্রয়াসে সাফল্যের পথে কি কি অন্তরায় হতে পারে?

৫। সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত ধারণাগুলি যা শান্তি রক্ষার প্রয়াসে জড়িয়ে গিয়েছে তার পরিচয় দিন।

৬। শান্তিরক্ষী বাহিনী কি ধরনের কাজ করে? কার্যাবলির ব্যাপকতার পরিচয় দিন।

৭। শান্তি রক্ষা প্রয়াসের সাফল্যের শর্ত কি কি?

৩.৮ উত্তর সংকেত

১। (ক) না; (খ) হ্যাঁ; (গ) না; (ঘ) না।

২। (খ) ১৯৮৮; (খ) শান্তি নির্মাণ (peace building); (ঘ) ব্লু হেলমেট; (ঘ) ভারত।

৩। (ক) উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৩.২ দেখুন।

(খ) উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৫.২ দেখুন। সংঘর্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিপন্ন সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার্থে অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করতে জাতিপুঞ্জ সেনাপ্রেরণ করলে তাকে মানবিকতার কারণে হস্তক্ষেপ বলে।

(গ) উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৩.২ এবং অনুচ্ছেদ ৩.৫.১ দেখুন।

(ঘ) লেবানন, কঙ্গো, নামিবিয়া, কম্বোডিয়া, সাইপ্রাস।

৪। উত্তর সংকেত ঃ শান্তি রক্ষার প্রয়াস, সাম্প্রতিক ভূমিকা ও মূল্যায়ন পড়ুন এবং নিজের মতো করে উত্তর তৈরি করুন।

৫। উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৫.১ দেখুন।

৬। উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৪.১ থেকে অনুচ্ছেদ ৩.৪.২ দেখুন।

৭। উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৪.২ দেখুন।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Paul S. Diehl—The international peace keeping Johnskin University Press, 1993.
2. Jasjit Singh—The United Nation peace keeping operation the challenge of charge, Pf. S. Ranjan edited United Nation at fifty & beyond.
3. World armament & disarmament—Sipri year book, Annual publication.

একক ৪ □ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও নিরস্ত্রীকরণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩.১ অস্ত্র প্রতিযোগিতা কি ও তার মূল কারণ

৪.৩.২ অস্ত্র প্রতিযোগিতার অন্যান্য কারণ

৪.৪.১ নিরস্ত্রীকরণ

৪.৪.২ নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্র-সংবরণের স্বপক্ষে যুক্তি

৪.৪.৩ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পূর্বে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস

৪.৫.১ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈধ ভূমিকা

৪.৫.২ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও নিরস্ত্রীকরণ ঃ প্রাথমিক প্রয়াস

৪.৫.৩ ১৯৬০-এর দশক

৪.৫.৪ ১৯৭০-এর দশক

৪.৫.৪ ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দুই দশক

৪.৫.৬ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ উত্তর সংকেত

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

বিশ্বজুড়ে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দেশের মধ্যে হয়ে চলেছে তার একটা পরোক্ষ প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে, বিশ্বশান্তি ও বিকাশের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার জন্মলগ্ন থেকেই নিরস্ত্রীকরণের নানা প্রয়াস নিয়ে চলেছে। এই প্রয়াসগুলি সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্যই এককটি লিখিত হয়েছে। এই এককটি থেকে আপনি।

- অস্ত্র প্রতিযোগিতার স্বরূপ তার কারণগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।
- নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসে বিতর্কগুলির পরিচয় লাভ করবেন।

- বিভিন্ন দশকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতির একটি দিক সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে মতপ্রকাশ করতে পারবেন।
- অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন আলোচনার পরিবর্তে আপনার ধারণায় ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হবে এবং অনেকের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা দূর করতে সক্ষম হবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা (আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখা)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা যেমন একদিকে জাতিসংঘের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করেছিল তেমনই আর একটি যোগ্যতর আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত করেছিল। যুদ্ধ চলাকালীন মৈত্রী শক্তির রাষ্ট্রনায়কেরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, এই সংগঠনের প্রধান কাজ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা। একথা সবাই বুঝেছিলেন যে অস্ত্রশস্ত্রগুলির প্রয়োগের ওপর কোনো বাধা-নিষেধ না থাকলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা তো যাবেই না, বরং মানব-সভ্যতাই বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়ে পড়বে। সুতরাং জন্মলগ্ন থেকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এই এককে বিভিন্ন দশকে জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসগুলির পরিচয় দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে অস্ত্র প্রতিযোগিতার স্বরূপ, কারণ এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক আলোচনা করে নেব।

৪.৩.১ অস্ত্র প্রতিযোগিতা (Arms Race) কি ও তার মূল কারণ

শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের জনসাধারণ ও সম্পদ রক্ষা করা রাষ্ট্রের এক অন্যতম প্রধান দায়িত্ব; সুতরাং জাতীয় স্বার্থে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে যে কোন রাষ্ট্রই উপযুক্ত সৈন্য বাহিনী এবং সামরিক অস্ত্র সম্ভার মজুত রাখে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, ক্ষমতার লড়াই এবং সর্বোপরি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতিতে কূটনীতি সফল না হলে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। যখন দু'টি বা তার বেশি দেশ, এক সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ক্রমান্বয়ে নিজ নিজ অস্ত্র-সম্ভারের গুণগত উৎসর্ষ সাধন বা সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলে, তখন তাদের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

বিরোধে লিপ্ত দু'টি দেশের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হতে পারে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে শক্তির সমতা আনার জন্য সেই দেশটি তার অস্ত্র-শস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিপক্ষ দেশটি তখন মনে করতে পারে, যে এবারে সে দুর্বল হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, সেও তার অস্ত্র-শস্ত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাবে। এইভাবে একটি দেশের সামরিক প্রস্তুতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিযোগী দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের অস্ত্র সম্ভার বাড়িয়ে যেতে থাকে।

৪.৩.২ অস্ত্র প্রতিযোগিতার অন্যান্য কারণ

সাধারণত, কোন দেশের সৈন্যবাহিনীতে স্থলসেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনা—এই তিনটি প্রধান বিভাগ প্রায় সব সময়ই বর্তমান। দেশের প্রতিরক্ষার ভার এদের ওপর মিলিতভাবে ন্যস্ত হলেও, এই বিভাগগুলির মধ্যে একটা

সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার সম্পর্ক থাকে। নিজেদের বিভাগটিকে উন্নত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য এই বিভাগগুলি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। তাদের রেষারেষিতে সামগ্রিকভাবে দেশের অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধি পায়।

যে সমস্ত সংস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত; অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগাতে তাদেরও একটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উৎপাদিত অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করার জন্য তারা বিভিন্ন দেশের কাছে সেইসব অস্ত্র-ক্রয়ের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে, প্রতিপক্ষ দেশগুলির ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কোন দেশের জনমানসে ভীতির সঞ্চার করে, কখনও বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অর্থ ঘুষ দিয়ে বা অন্য কোন রকম সুবিধা দিয়ে প্রলুব্ধ করে। যে ভাবেই হোক, কোন একটি দেশ যদি এই ধরনের সংস্থাগুলির প্রভাবে এসে অস্ত্র-শস্ত্র খরিদ করে, তবে তা বিরোধী দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি শুধুমাত্র মানুষের উপকারই সাধন করে না; প্রতিনিয়ত উন্নততর মারণাস্ত্রেরও জন্ম দেয়। পুরনো অস্ত্রগুলির পরিবর্তে এই নতুন উন্নত অস্ত্রের ব্যবহারও অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে জিইয়ে রাখে। অস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মারণাস্ত্রগুলিকে আরও কার্যকরী, ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ করে তোলাই এক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য।

৪.৪.১ নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধি পেলেই যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে সেকথা নিশ্চয় করে বলা যায় না, কিন্তু এটা ঠিক যে অস্ত্র-শস্ত্রগুলির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষেত্রে, তাতে হঠাৎ যুদ্ধ বেধে গেলে এবং ছড়িয়ে পড়লে দেশনির্বিশেষে মানুষ সমাজ এবং সভ্যতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সব অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত অস্ত্র-শস্ত্র যাতে মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ না হয়ে ওঠে তার জন্য এইসব অস্ত্র-প্রয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। কিন্তু তা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। তাই অস্ত্র হ্রাস এবং নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে।

সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় সমস্ত দেশের সবরকম অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। অনেকে মনে করেন অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিযোগী দেশগুলির মধ্যে আশঙ্কা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা থেকেই যুদ্ধ বাধে, সুতরাং অস্ত্র-শস্ত্রই যুদ্ধের মূল কারণ। যেহেতু অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অস্ত্র-শস্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাতে পারলেই যুদ্ধের সম্ভাবনা আর থাকবে না, বিশ্বশান্তি বজায় থাকবে, কোন দেশের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে না।

একটু তলিয়ে ভাবলেই অবশ্য একথা পরিষ্কার হবে যে যতক্ষণ না প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে পারছে, তারা কিছুতেই তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের সর্বাত্মক বিলুপ্তি ঘটাতে চাইবে না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা এতই ক্ষীণ যে একে শান্তি বাদীদের কষ্ট-কল্পনা বা নিছক স্বপ্ন বলে অনেক সময়ই উড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রধানত নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় অসাফল্য এবং তার দরুন হতাশা থেকেই ১৯৫০-এর দশকে আমেরিকান রণপণ্ডিতদের চিন্তা-ভাবনায় অস্ত্র সংবরণ (Arms control) ধারণার জন্ম। নিরস্ত্রীকরণের মূল লক্ষ্য হল অস্ত্র হ্রাস ও অস্ত্রের বিলুপ্তি। অস্ত্র সংবরণ বলতে বোঝায় বিশেষ বিশেষ অস্ত্র এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতি, প্রয়োগ-স্থল বা পরীক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, কোন বিশেষ অস্ত্রের সংখ্যার উচ্চসীমা নির্ধারণ, অথবা আংশিক অস্ত্র হ্রাস। এমন কি অস্ত্র

সংবরণে যারা বিশ্বাসী, পরিবেশকে সুস্থির করতে ও নিশ্চিত করতে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন অস্ত্রের উন্নতি সাধন বা সংখ্যাবৃদ্ধি মেনে নিতে রাজি। এঁদের বক্তব্য হল, দু'টি বিরোধী দেশের মধ্যে ক্ষমতা বা শক্তির একটা মোটামুটি সমতা বজায় রাখতে প্রয়োজনে অস্ত্র-হ্রাস বা অস্ত্র বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এমন অবস্থায় কোন দেশই প্রতিপক্ষের তুলনায় বিশেষ সামরিক সুবিধা উপভোগ করতে পারবে না। যুদ্ধ করে জয়লাভের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে কোন পক্ষই যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহী হবে না। পরস্পরের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে তখন আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে যে কোন অস্ত্রগুলি অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ যেগুলি না থাকলেও পরস্পরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না বা শক্তির সমতায় পরিবর্তন আসবে না। তখন সেই অস্ত্রগুলির বিলুপ্তি সাধন বা সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হবে। অথবা অস্ত্র-সংখ্যা বা উৎকর্ষ এবং ক্ষমতার সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না। অস্ত্র সংবরণকে অনেকে ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে নিরস্ত্রীকরণ বলে মনে করেছেন।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র সংবরণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও, নিরস্ত্রীকরণ শব্দটি ব্যবহার হয় ব্যাপক অর্থে। সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ বলতে শুধু আক্ষরিক অর্থে অস্ত্রের বিলুপ্তি সাধনই বোঝায় না, অস্ত্র সংবরণ প্রয়াসগুলিকেও বোঝায়। সুতরাং যদিও আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস আলোচনা করার সময় অস্ত্র সংবরণ প্রচেষ্টাগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত করব, তবুও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র সংবরণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয়ে অবহিত থাকা ভালো। নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্র সংবরণ দ্বিপাক্ষিক অর্থাৎ দু'টি বিরোধী দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে হতে পারে অথবা বহুপাক্ষিক হতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রয়াস মূলত বহুপাক্ষিক নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস।

৪.৪.২ নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্র সংবরণ-এর স্বপক্ষে যুক্ত

কোন কোন রাষ্ট্র এক আগ্রাসী নীতির বশবর্তী হয়ে অস্ত্র সম্ভারের সংখ্যা বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় শান্তি ও সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলিও নিরাপত্তার খাতিরে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুস্থিরতা দেখা দেবে যা একদিকে বিনাশের সম্ভাবনা দূরীভূত করবে অন্যদিকে বিশ্বশান্তির সহায়ক হবে।

অনেকেই মনে করেন যে নিরস্ত্রীকরণের ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যাবে যা অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দরুন খরচা হয়ে যায়। এই অর্থ তখন বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কাজে ব্যবহৃত হবে। বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলি তাদের প্রগতির জন্য অথবা জনকল্যাণে আরও বেশি অর্থব্যয় করতে পারবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতার পিছনে দেশগুলি যে টাকা ঢালে, নিরস্ত্রীকরণ হলেই যে তার সবটুকু জনকল্যাণকর খাতে ব্যবহার করা যাবে, তা কিন্তু ঠিক নয়। বর্তমান অস্ত্র-শস্ত্রগুলিকে বিলুপ্ত বা নষ্ট করতে বিভিন্ন দেশের ওপর নজর রাখতে এবং প্রয়োজনে অনুসন্ধানও পরিদর্শনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ খরচ হবে। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে নতুন নতুন অস্ত্র কিনতে বা উৎপাদন করতে না হলে, প্রচুর অর্থ বেঁচে যাবে এবং তা দেশের উন্নতি কল্পে সহায়তা করবে। তাছাড়াও, যে সব মেধাবী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত, তাদের কার্যোপযগিতার সঠিক ব্যবহার হবে যদি তাদের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করা যায়।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও নিরস্ত্রীকরণ সমর্থনযোগ্য। যুদ্ধ-বিনাশ-ধ্বংস-হত্যা ইত্যাদি নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করা যায় না। তাছাড়াও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে অস্ত্র-শস্ত্রে ভারাক্রান্ত, তেজস্ক্রিয় পদার্থে দূষিত, বিনাশের সম্মুখীন পৃথিবী উত্তরাধিকারসূত্রে উপহার দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই।

এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা বিভিন্ন সময়ে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে উৎসাহ যুগিয়েছে।

৪.৪.৩ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পূর্বে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস

নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা নতুন কিছু নয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সাথে তা শুরু হয়েছে এমনও নয়। যুদ্ধ চিরকালই ব্যয়সাধ্য ও ধ্বংসাত্মক। ইতিহাসের পাতায় দেখা যাবে যে যুদ্ধ শেষে শান্তি চুক্তিগুলি হামেশাই অস্ত্র হ্রাসের জন্য অথবা কোন অস্ত্র-প্রয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে সচেষ্ট হতে বলেছে। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ অব্দে চীনের হোন্যান প্রদেশে বিরোধ লিপ্ত রাজ্যগুলির মধ্যে অস্ত্র সংবরণ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে, মধ্যযুগে ইউরোপে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তিগুলি মোটামুটি তখনই অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব করেছে, যখন তারা অন্যান্য শক্তির তুলনায় নিজেকে দুর্বল মনে করেছে। ১৮৫৯ সালে ব্রিটেন ফ্রান্সকে অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব দেয়, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু দশ বছর পরে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে এবং প্রাশিয়ার উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে তিনি নিজেই অস্ত্র-হ্রাসের প্রস্তাব দেন। প্রাশিয়ার কর্ণধার বিসমার্ক এবার সে প্রস্তাবে রাজি হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিরস্ত্রীকরণের আর এক চেষ্টা চলে। রাশিয়ার উদ্যোগে ১৮৯৯ সালে হেগ শান্তি অধিবেশন বসে, ১৯০৭ সালে আর একটি হেগ সম্মেলন হয়। যদিও যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু নীতি প্রণয়নে এই দু'টি সম্মেলন কার্যকরী হয়েছিল, নিরস্ত্রীকরণ কোন প্রয়াসই বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতি সংঘ (League of Nations) স্থাপিত হয়েছিল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সফল রূপায়ণে নিরস্ত্রীকরণের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তবে জাতি সংঘের অবদান খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৩২ সালে জেনেভাতে এক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র মতভেদের কারণে এই অধিবেশন প্রায়ই মুলতুবি থাকত। ১৯৩৪ সালের জুন মাসের পর আর অধিবেশন বসেনি, জাতি সংঘের তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায়নি।

জাতি সংঘের ব্যর্থতা জাতি সংঘের বাইরে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে দেশগুলিকে সচেষ্ট করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত জেনেভা প্রোটোকল, যাতে ১৪৬টি দেশ যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে সম্মত হয়েছে। ১৯২৮ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রমুখ কিছু দেশ প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসেবে যুদ্ধ গ্রহণীয় নয় বলে স্বীকার করে নেয় যদিও আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করবার অধিকার তারা ত্যাগ করেনি।

১৯২২ সালে নৌশক্তির প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে তৎকালীন পাঁচটি প্রধান নৌশক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালী—এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তিতে বিভিন্ন দেশের জাহাজের বহনক্ষমতা (tonnage) বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হতে থাকলে এই চুক্তির কার্যকরী মূল্য কিছু থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি সব ক'টি শক্তিই তাদের নৌ-বাহিনীর প্রসার ঘটায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়, পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আহ্বান ওঠে। এই সময়ই ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা চালনার বিশেষ দায়িত্ব জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ওপর বর্তায়।

৪.৫.১ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈধ ভূমিকা

সনদের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপালনের জন্য এবং অস্ত্র সজ্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যদের কাছে পেশ করবে। এই বিশেষ কমিটি পরিচিত মিলিটারী স্টাফ কমিটি নামে, সনদের ৪৭নং ধারায় এই কমিটি সম্পর্কে বিশদভাবে বলা আছে। এই কমিটির কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য যে কোন সামরিক প্রয়োজনে, অস্ত্র সজ্জা নিয়ন্ত্রণে এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তা দান।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সহযোগিতার নানা নীতি আলোচনা করতে পারে। সনদের ১১ নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ সভা আলোচিত নীতিগুলি সুপারিশের আকারে সভ্যদের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করতে পারে।

সনদের রচয়িতারা বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে তুলে দিলেও, নানান কারণে পরবর্তীকালে সাধারণ সভার দূরত্ব বেড়ে যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসেও তার প্রতিফলন হতে দেখি। বাস্তবে মিলিটারী স্টাফ কমিটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। বরং সাধারণ সভা এক সক্রিয় এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে।

৪.৫.২ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও নিরস্ত্রীকরণ ঃ প্রাথমিক প্রয়াস

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মলগ্নে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের ভীতি জনমানসে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলস্বরূপ ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রস্তাব অনুসারে একটি পরমাণু শক্তি কমিশন (Atomic Energy Commission) গঠন করা হয়। জুন মাসে এই কমিশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র-প্রসার রোধ ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য মার্কিন প্রতিনিধি বার্নার্ড বারুখ (Bernard Baruch) একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে পরমাণুশক্তি উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল থেকে শুরু করে, জনহিতকর কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহারের জন্য গবেষণা ও কর্মসূচী, পারমাণবিক অস্ত্রের বিলোপ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে এই সংস্থা (International Atomic Development Authority) স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখবে।

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো (Andrey Gromyko) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাল্টা প্রস্তাব আনেন। গ্রোমিকো প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদন ও প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা এবং মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তির উপর জোর দেওয়া হয়। আমেরিকা এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ার ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস সফল হয় না। ১৯৪৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়, তখন আমেরিকাও পরমাণু শক্তির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং বারুখ পরিকল্পনা কার্যত পরিত্যক্ত হয়।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের সাথে সাথে সাধারণ প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাসের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আর একটি কমিশন (Conventional Armaments Commission) গঠন করে। বিভিন্ন দেশের সৈন্য বাহিনী, সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করার জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উঠলেও মতৈক্যের অভাবে এই সব প্রস্তাব কার্যকরী করা যায়নি। ১৯৫১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পারমাণবিক এবং প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাসের জন্য পৃথক পৃথক কমিশনের

পরিবর্তে, দু' ধরনের নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টাই জোরদার করার জন্য মিলিতভাবে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (Disarmament Commission) গঠন করে। এই কমিশনের বিভিন্ন প্রয়াস পরবর্তীকালে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১৯৫৫ সালে জাতিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় জেনেভায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে একটি সংস্থার কথা ভাবা হয় যার কাজ হবে পৃথিবী জুড়ে জনকল্যাণ ও শান্তিমূলক কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহারের প্রয়াস এবং যতদূর সম্ভব পরমাণু শক্তির সামরিক অপব্যবহার রোধ করা। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) নামে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর্থনে ও রক্ষণাবেক্ষণে এই সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে।

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসগুলি আলোচনা হয় এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা যে সব সময় ফলপ্রসূ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধিতেও বিশেষ লাভ হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ১৯৫৮ সালে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে তিন সদস্যের এক বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে। ১৯৫৯-এ তা বেড়ে হয় দশ সভ্যের কমিটি। ১৯৬১ সালে তৃতীয় বিশ্বের চাপে আঠেরো সদস্যের নিরস্ত্রীকরণ কমিটি গঠিত হয় (Eighteen Nation Disarmament Committee)। ১৯৬৯-এ তা পাল্টে গিয়ে হয় নিরস্ত্রীকরণ কমিটির সম্মেলন (Conference of the Committee on Disarmament)। সদস্য সংখ্যা হয় ২৬। ১৯৭৯ সালে সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৪০-এ দাঁড়ায়, নাম হয় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Conference of Disarmament)। বিভিন্ন সময়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে চেষ্টা চললেও, সম্পূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্র লোপের সম্ভাবনা ENDC, CCD অথবা CD'র কার্যকলাপের পরও এখনও সুদূর পরাহত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাফল্য অর্জন করেছে।

৪.৫.৩ ১৯৬০-এর দশক

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসে মতভেদ থাকলেও একথা প্রায় অধিকাংশ দেশই স্বীকার করে যে যেসব অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র নেই বা পৌঁছয়নি, সেই অঞ্চলগুলিকে চিরতরে পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন করে রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বেশ কয়েকটি অস্ত্র সংবরণ চুক্তি এই নীতির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন অঞ্চলগুলির একটি হল আন্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল। প্রধানত বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহে ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। বারোটি দেশের প্রতিনিধিরা পরের বছর একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলকে অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। দক্ষিণ মেরুতে কোনরকম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষণ বা পারমাণবিক বর্জ্য স্থাপন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে ২৩শে জুন আন্টার্কটিকা চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশেরও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

একইভাবে মহাশূন্য অঞ্চলকেও (Outer Space) শুধুমাত্র শান্তিমূলক কাজেই ব্যবহার করা হবে বলে স্থির করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ১৯৬৩ সালের ১৭ই অক্টোবর সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালে একটি চুক্তি (Outer Space Treaty) স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বলা হয় যে মহাশূন্য বা মহাজাগতিক কোন গ্রহে উপগ্রহে (যেমন, চাঁদে) কোন পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন করা যাবে না বা কোনরকম অস্ত্র পরীক্ষণ করা যাবে না। মহাশূন্যে বা গ্রহে-উপগ্রহে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করাও নিষেধ।

১৯৬০-এর দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস হল আংশিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ প্রতিনিষেধ চুক্তি (Partial Test Ban Treaty PTBT)। পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ জলে স্থলে, বায়ুমণ্ডলে ও ভূগর্ভে করা সম্ভব। ১৯৫০-এর দশকেই এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। কিন্তু সর্বপ্রকার

পরীক্ষণমূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা একরকম অসম্ভব ছিল কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ করে ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করতে তৈরি ছিল না। শেষ পর্যন্ত জলে, স্থলে এবং বায়ুমণ্ডলেই পরীক্ষণমূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে ১৯৬৩ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

একই সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার জন্য পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন দেশগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ছাড়া অন্য কোন দেশ যাতে এই শক্তি অর্জন করতে না পারে, সে বিষয়ে তাদের স্বার্থ অবশ্যই ছিল। পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠবে এবং সাধারণভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তাই আরো বিপন্ন হয়ে পড়বে। পারমাণবিক অস্ত্র-প্রসার নিরোধ চুক্তি বা Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) নিয়ে বিশ্বের পাঁচটি প্রধান পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হয় নি। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই চুক্তি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছিল।

NPT চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলি এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে তারা কোনভাবেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা অস্ত্র তৈরির কৌশল, ফর্মুলা বা প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি অর্জন করবে না এবং পারমাণবিক শক্তিগুলিও এই ধরনের কোন সহায়তাই অন্যান্য দেশগুলিকে দেবে না যা প্রযুক্তির হস্তান্তর করবে না। পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলির পরমাণুশক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই চুক্তিকে সমর্থন করার ফলে চুক্তিটি এক সফল অস্ত্র সংবরণ চুক্তি হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে NPT চুক্তি কার্যকরী হয়েছিল এবং তা পঁচিশ বছরের জন্য বলবৎ ছিল। ১৯৯৫ সালে পুনর্বিবেচনার পর চুক্তিটির কার্যকাল অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ভারত শুরু থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করে এসেছে। তার মতে, এই চুক্তি বৈষম্যমূলক। একদিকে অধিকাংশ দেশের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন নিষিদ্ধ করে জাতীয় নিরাপত্তার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তিগুলির নিজস্ব অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের উপর কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। ১৯৭৪ সালে প্রথমবার এবং ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় দফায় পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত নিজেকে পারমাণবিক অস্ত্রধর রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

৪.৫.৪ ১৯৭০-এর দশক

বস্তুত, ১৯৬০-এর দশকে নিরস্ত্রীকরণ (সঠিকভাবে বলতে গেলে অস্ত্র সংবরণের) প্রয়াসগুলি অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭০-এর দশকটিকে 'নিরস্ত্রীকরণের দশক' বলে ঘোষণা করে। যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে NPT চুক্তিটি কার্যকরী হয়।

যেমনভাবে এর আগের দশকে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল এবং মহাশূন্য অঞ্চল পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন করা হয়েছিল, তেমনভাবে ১৯৭১ সালে সমুদ্রতলের জমিতেও পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন বা পরীক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় (Seabed Treaty)। নিজ দেশের সার্বভৌম এলাকা পার করে সমুদ্রতলের ভূমিতে কোনো দেশই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো অস্ত্র রাখার অধিকারী নয়।

প্রসঙ্গত বলা চলে বিভিন্ন দেশও পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল হিসেবে নিজেদের নির্দিষ্ট করতে পারে। ১৯৬৭ সালে স্বাক্ষরিত ল্যাটেললকো (llatellco) চুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল আখ্যা দেয়। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল বলে ঐ অঞ্চলের দেশগুলি স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকা মহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল স্থাপনের প্রয়াস হয়েছে। তবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকৃত পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে। ১৯৭০-এর দশকেই তাদের মধ্যে অস্ত্র সংবরণ প্রয়াসে বিশেষ সাফল্য আসে। এ প্রসঙ্গে স্ট্রাটেজিক অস্ত্র শস্ত্রের সীমিতকরণ চুক্তি দু'টি Strategic Arms Limitation Treaty, সংক্ষেপে SALT-II বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূপৃষ্ঠে বা সাবমেরিনে স্থাপিত অন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং দূরপাল্লার বোমারু বিমান পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত করে যে অস্ত্র সম্ভার গঠন করা হয় তাকে স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সম্ভার বলে। যদিও এই চুক্তিগুলি দ্বিপাক্ষিক, কিন্তু সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের তরফে বিশ্বের দুই প্রধান শক্তির ওপর অস্ত্র সংবরণের জন্য একটা চাপ সতত ক্রিয়াশীল ছিল। বাস্তবিক, NPT চুক্তির একটা শর্তই ছিল যে পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলি তাদের অস্ত্র সম্ভার হ্রাস করতে সচেষ্ট হবে।

১৯৭২ সালে জৈব (Biological) অস্ত্রের ব্যবহার রোধে একটি চুক্তি হয়। এর মাধ্যমে রোগের বীজ ছড়ানো হানিকারক জৈব অস্ত্রের প্রস্তুতি, উৎপাদন এবং মজুত বন্ধ করা হয় এবং যুদ্ধে জৈব অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত হয় আর একটি চুক্তি যা এন-মড কনভেনশন (Environment Modification Convention) নামে পরিচিত। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে (যেমন, ইচ্ছানুসারে আবহাওয়া পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অদল বদল ইত্যাদি) সে সব প্রযুক্তি যুদ্ধের জন্য বা সামরিক সুবিধার্থে ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪.৫.৫ ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দুই দশক

১৯৮০'র দশকে প্রথম সাফল্য আসে অমানবিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করতে। যে সব অস্ত্র প্রয়োগ অনর্থক সাধারণ মানুষের কষ্টকর মৃত্যু ডেকে আনে (যেমন, মাইন অথবা বুবি ট্যাপ), তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে ১৯৮১ সালে একটি চুক্তি হয় (Inhuman Weapons Convention)। এই সময়ে নতুন করে ঠাণ্ডা লড়াই তীব্র হয়ে ওঠায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস বিশেষ সফল হয়নি। তবে ১৯৯০-এর দশকে কয়েকটি সাফল্য আসে, বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রায় আমূল পরিবর্তন এই সময়ে ঘটে।

১৯৯১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অনুসারে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত সাধারণ অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদন, সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখার জন্য একটি নথি (Register) চালু করা হয়। জাতিপুঞ্জের সভ্যবৃন্দ তাদের দেশের অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদন, সঞ্চয়, ব্যবহার, প্রয়োগ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে বিভিন্ন দেশ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে এই চুক্তিটি কার্যকর হয়।

১৯৯০-এর দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সর্বাত্মক পারমাণবিক বিস্ফোরণ জনিত পরীক্ষণ নিষিদ্ধ করার চুক্তিটি (Comprehensive Test Ban Treaty; CTBT)। এর মাধ্যমে ভূগর্ভেও পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন অবশ্য পাঁচটি প্রধান শক্তি কম্পিউটার টেস্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নতি সাধন করতে পারে। এই পরিস্থিতির বিরোধিতা করে ভারত। ১৯৯৬ সালে জাতিপুঞ্জে চুক্তিটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হলেও বিপক্ষে যে তিনটি দেশ ভোট দিয়েছিল, ভারত তার মধ্যে একটি। ১৯৯৮ সালে ভারত পোখরানের ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পারমাণবিক উৎপাদন ও তার সঞ্চয় সীমিত করতে একটি চুক্তির কথা ভাবা হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তির (Fissile Material Cut-off Treaty) বিভিন্ন ধারা ও শর্তাবলি এখনও আলোচনা সাপেক্ষ এবং দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনাধীন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৮০'র দশকের শেষদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত

ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকলে দ্বিপাক্ষিক কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। INF চুক্তি (Intermediate range Nuclear Forces Treaty) স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালে। এর মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে অন্তর্বর্তী দূরত্ব বা মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি দু'টি দেশই সরিয়ে নেয়। ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে সম্পাদিত START-I এবং START-II চুক্তি দুটিতে দ্বিপাক্ষিক স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র হ্রাসের কথা বলা হয়েছে।

৪.৫.৬ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন

যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে নিরাপত্তা পরিষদকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সাধারণ সভা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কখনো বিশেষ অধিবেশন ডেকে, কখনো সাধারণভাবে বিভিন্ন সময়ে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বা সুপারিশ পেশ করেছে। এর সব ক'টি হয়তো চুক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় নি কিন্তু অস্ত্র সংবরণ প্রয়াসে একটা দিগ্‌নির্দেশ করতে পেরেছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির ক্ষেত্রেও সাধারণ সভার পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চুক্তিগুলি সাধারণভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের এবং বিশেষ করে পাঁচটি প্রধান শক্তির সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এই পাঁচটি শক্তি তাদের পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভার বজায় রাখার পক্ষপাতী। তাদের সঙ্গে এখন ভারত ও পাকিস্তানও যুক্ত হয়েছে। এই দেশগুলি যতক্ষণ না সহমত হতে পারছে, সর্বাত্মক পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়।

বিভিন্ন দেশ এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠী অস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে। অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়, যন্ত্রাংশ এবং প্রযুক্তির আদান-প্রদান, মারণাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ রোধ করা আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব। এই পরিস্থিতির মধ্যেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যতটা সাফল্য অর্জন করেছে তা ছোটো করে দেখা উচিত হবে না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র উৎপাদন বা প্রয়োগের সুযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সীমিত করে এনেছে। এই সাফল্যের হার চমকপ্রদ না হলেও সমর্থনযোগ্য এবং প্রশংসনীয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। বিশ্বের দুই প্রধান শক্তির মধ্যে সম্পর্কের ওঠা-পড়া জাতিপুঞ্জকে প্রভাবিত করে এসেছে। জাতিপুঞ্জ স্বাধীন, সার্বভৌম দেশগুলির প্রতিষ্ঠান। খুব কম ক্ষেত্রেই কোনো অনিচ্ছুক দেশকে জাতিপুঞ্জের বিধান মেনে নিতে বাধ্য করা যায়। যেমন, NPT বা CTBT'র ক্ষেত্রে ভারত একটি প্রতিবাদী দেশ। তা সত্ত্বেও, ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিয়ে মোটের ওপর জাতিপুঞ্জ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসে অনেকটাই সফল এবং বর্তমান দুনিয়ায় নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪.৬ সারাংশ

যুদ্ধের সম্ভাবনা, শত্রুর আক্রমণের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদন এবং মজুত করে আর এইভাবেই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। অস্ত্র বিক্রেতা গোষ্ঠীগুলি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগায়।

সব দেশের সবরকম অস্ত্র শস্ত্রের বিলুপ্তি বা সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব না হলেও অস্ত্র সংবরণের নানান প্রয়াস বহুকাল থেকেই চলে আসছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যা সমর্থনযোগ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব রাজনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও জাতিপুঞ্জ অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্র সংবরণ প্রয়াসে সফল হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল স্থাপনে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধে অথবা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ জনিত পরীক্ষণ রোধ করতে জাতিপুঞ্জ অনেকটা সফল।

একইভাবে জৈব এবং রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, সঞ্চয় ও প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিছু অমানবিক অস্ত্রের ব্যবহার, অথবা সামরিক কারণে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম কিছু বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। যা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, যদিও প্রশংসনীয়। আগামী দিনগুলিতেও এই প্রচেষ্টাগুলি চালু থাকবে বলে আশা করা যায় এবং তাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকার গুরুত্ব বজায় থাকবে।

৪.৭ অনুশীলনী

১। **বাক্যগুলির সত্যতা নির্ধারণ করুন ঃ—**

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগায়। হ্যাঁ/না

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে অস্ত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি অস্ত্র সংবরণে বিশ্বাসীরা সমর্থন করেন। হ্যাঁ/না

(গ) জাতিপুঞ্জে সনদে নিরস্ত্রীকরণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের চেয়েও সাধারণ সভাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ/না

(ঘ) আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা জাতিপুঞ্জের সমর্থনপুষ্ট। হ্যাঁ/না

২। **শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—**

(ক) প্রাথমিকভাবে NPT বলবৎ ছিল _____ বছরের জন্য।

(খ) জৈব অস্ত্রের ব্যবহার রোধে চুক্তি হয় _____ সালে।

(গ) যে সব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেই সব প্রযুক্তির সামরিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে _____ কনভেনশন।

(ঘ) CTBT চুক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ সভায় ভোট দেয় _____ দেশ।

৩। **সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ—**

(ক) অস্ত্র সংবরণের প্রয়াসের একটি প্রাচীন উদাহরণ দিন।

(খ) সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায়?

(গ) ভারত NPT চুক্তির বিরোধী কেন?

(ঘ) কোন অঞ্চলের দেশগুলি প্রথম নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে?

৪। নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সংবরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

৫। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বলতে কি বোঝায়? তার কারণগুলি নির্দেশ করুন।

৬। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে জাতিপুঞ্জের প্রয়াসগুলি উল্লেখ করুন।

৭। ১৯৭০-এর দশকে জাতিপুঞ্জের উল্লেখযোগ্য সফল নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস কি কি?

৪.৮ উত্তর সংকেত

১। (ক) হ্যাঁ; (খ) হ্যাঁ; (গ) না; (ঘ) হ্যাঁ।

২। (ক) পঁচিশ; (খ) ১৯৭২; (গ) এন মড্; (ঘ) তিনটি।

৩। (ক) খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ অব্দে চীনের হোন্যান প্রদেশে বিরোধলিপ্ত রাজ্যগুলির মধ্যে অস্ত্র সংবরণের প্রয়াস হয়েছিল।

(খ) সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় সমস্ত দেশের সবরকম অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।

(গ) ভারতের মতে এই চুক্তি বৈষম্যমূলক। এই চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তিগুলির নিজস্ব অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের উপর কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(ঘ) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলি প্রথম নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে।

৪। উত্তর সংকেত ঃ 'নিরস্ত্রীকরণ' অনুচ্ছেদ (৪.৪.১) দেখুন।

৫। উত্তর সংকেত ঃ 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা কি ও তার মূল কারণ' অনুচ্ছেদ (৪.৩.১) এবং 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার অন্যান্য কারণ' অনুচ্ছেদ (৪.৩.২) দেখুন।

৬। উত্তর সংকেত ঃ বিভিন্ন দশকে গৃহীত পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাগুলি পৃথক করুন এবং নিজের মতো করে উত্তর তৈরি করুন। অনুচ্ছেদ ৪.৫.' থেকে অনুচ্ছেদ ৪.৫.৫ দেখুন।

৭। উত্তর সংকেত ঃ '১৯৭০-এর দশক' অনুচ্ছেদ (৪.৫.৪) দেখুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Paul S. Diehl—The international peace keeping Johnskin University Press, 1993.
2. Jasjit Singh—The United Nation peace keeping operation the challenge of charge, M. S. Ranjan edited United Nation at fifty & beyond.
3. World armament & disarmament—Sipri year book, Annual publication.
4. H. Nicholas, The United Nations as a political institution, London, OUP. 1975.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাধু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Pulished by Netaji Subhas Open University, 1, Woodburn Park, Kolkata-700 020 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.